সূর্যোদয়ের দেশে



৩৬এ, লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৭

প্রকাশক :
প্রণব কুমার বিশ্বাস
আপনজন
৩৬এ লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
প্রসেনজিৎ সেন

মুদ্রাকর :
সুনীল কুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯



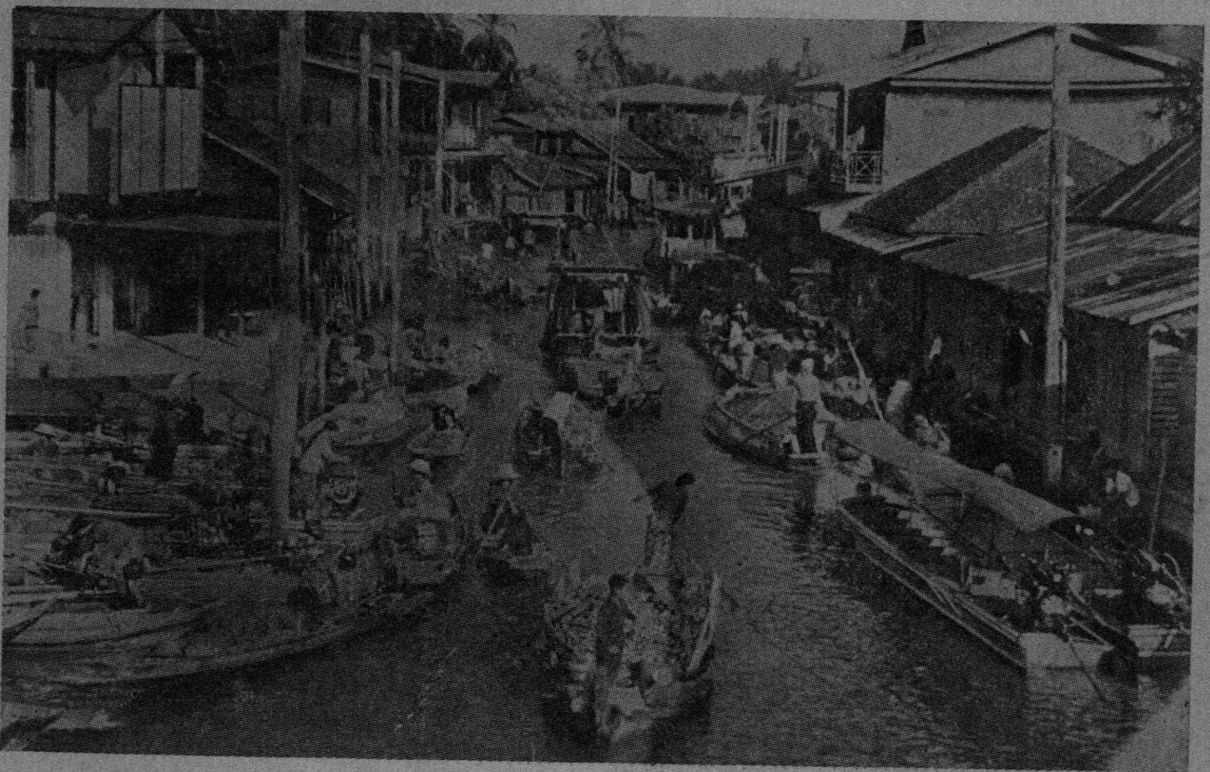
নৃত্যরতা থাই তরুণী



ছেদি
থাইল্যাণ্ড



ওয়াট্
অরুণ
ব্যাঙ্কক



ভাসমান
বাজার
ব্যাঙ্কক

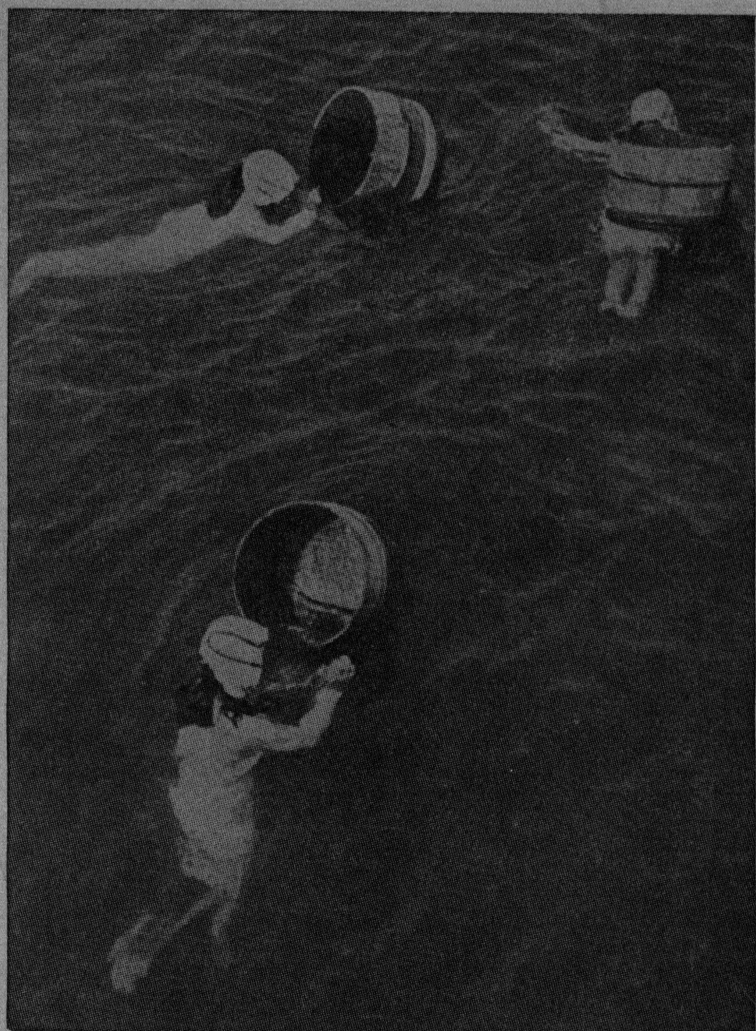


পুষ্পসজ্জায় সজ্জিতা জাপানী তরুণী

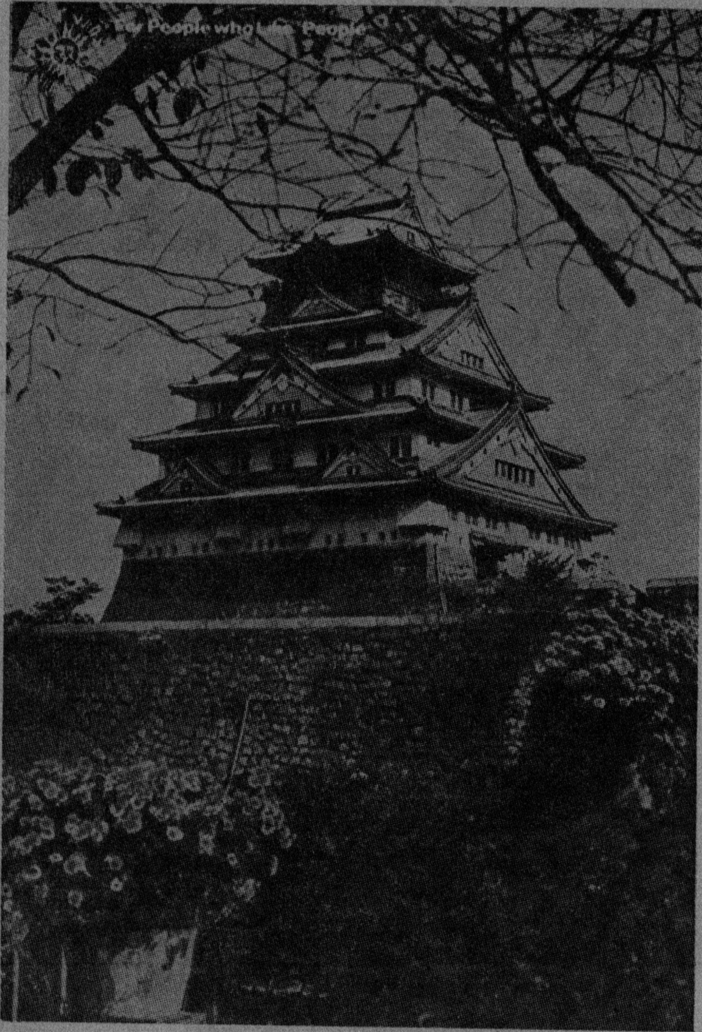


কিন্‌কাকুজী মন্দির (স্বর্ণমণ্ডপ)

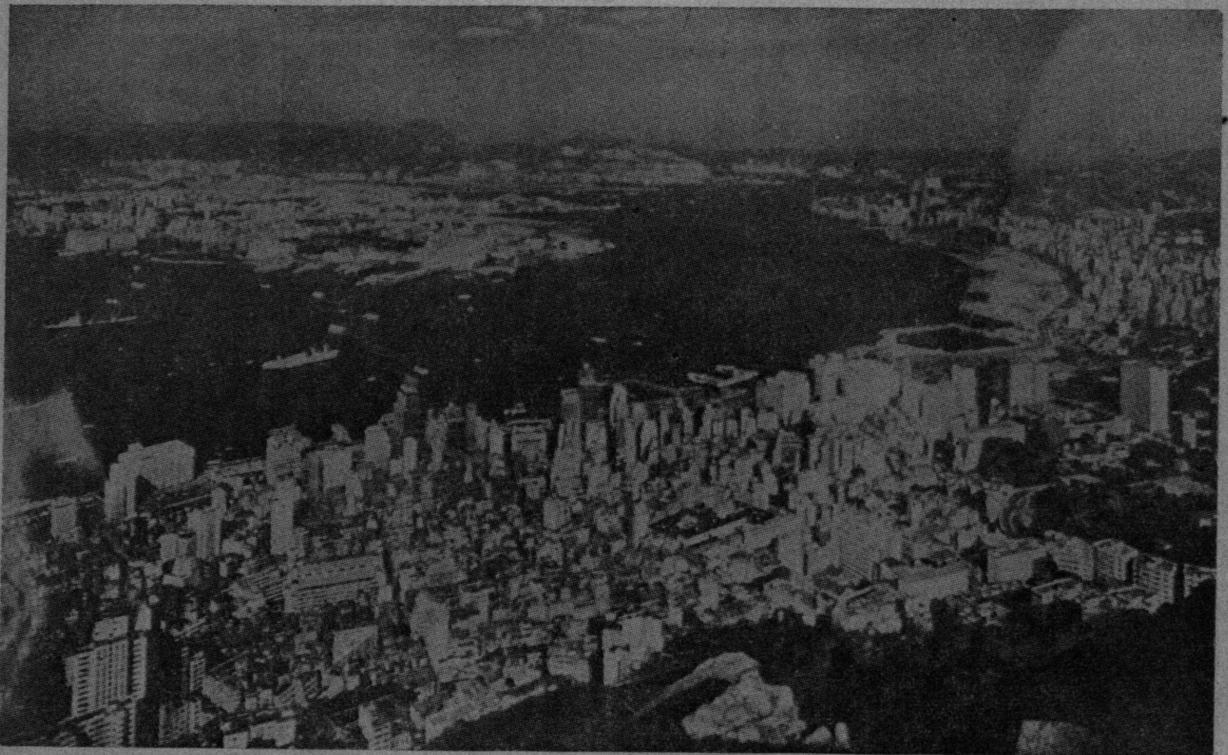
কিয়াতো — জাপান



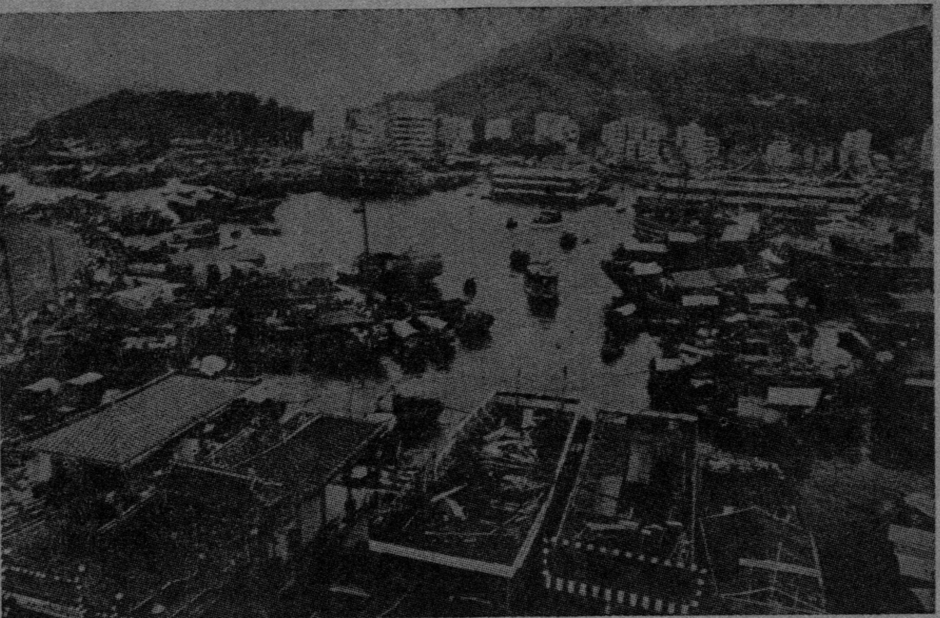
শুক্তি উত্তোলনকারী মহিলা ডুবুরী
মিকিমোতো দ্বীপ — জাপান



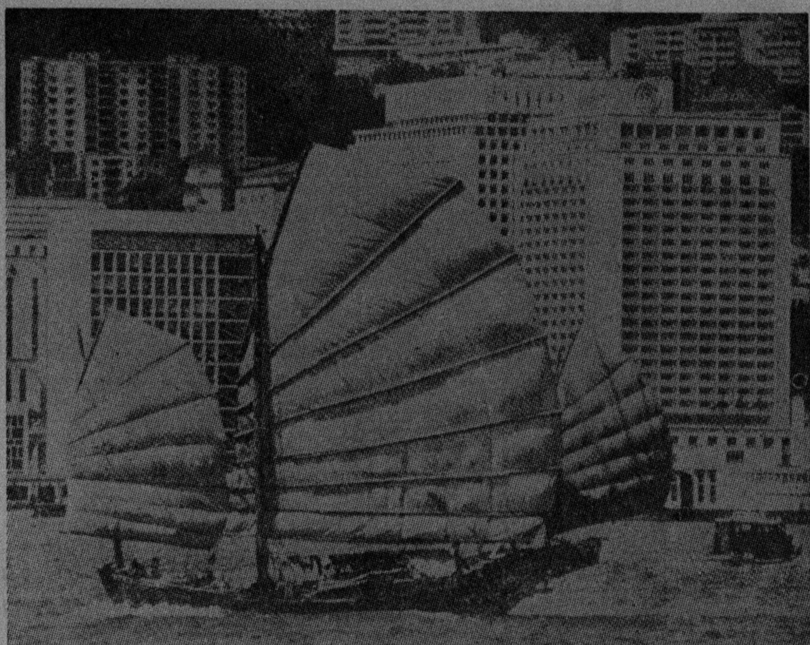
ওসাকা কাস্‌ল্‌ — জাপান



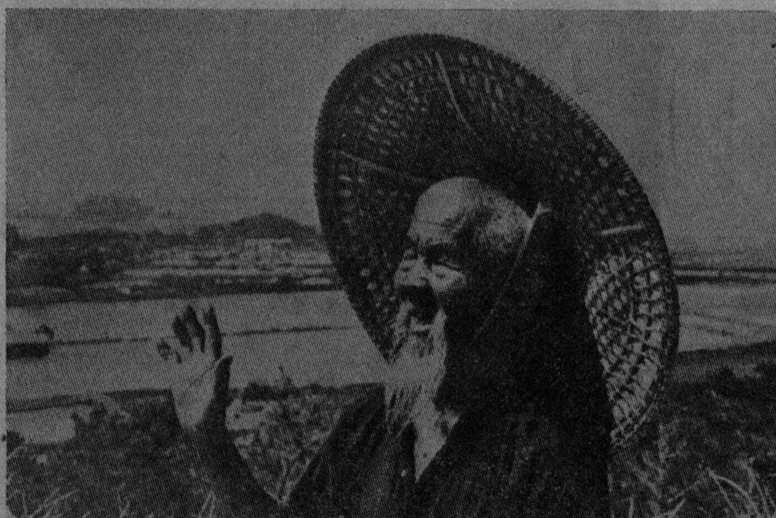
হংকং দ্বীপ



অ্যাবার্ডিনে
ভাসমান
রেস্তোরাঁ।
জাপান



জাঙ্ক — হংকং



শতায়ু এক হাক্কা কৃষাণ — নিউ টেরিটরি — হংকং

যাত্রা হল শুরু

আজ বুধবার, ইংরেজী ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, বাংলার ৭ই আশ্বিন ১৩৮২, আমার জীবনের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসে হাজির হল। আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীরাসবিহারী ঘোষ ওরফে গোপাল ভোর পাঁচটায় দুখানা রিক্সা নিয়ে এলো। গত রাত্রে দুশ্চিন্তায় ভাল ঘুম হয়নি, তাই আমি প্রস্তুতই ছিলাম। গোপাল ডাকতেই বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে চলল আমার ভাইপো শ্রীমান আশীষ। ভোর সওয়া পাঁচটায় পৌঁছলাম কুণ্ডু স্পেশ্যালের অফিসে। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল দেবী, মুস্তাফী এবং বাসুদেব। মুস্তাফীর গাড়ি করে আমরা সকলে বেরিয়ে পড়লাম দমদম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। গাড়ি ছুটে চলেছে ভি. আই. পি. রোড ধরে। ভোরের বিশুদ্ধ শীতল বায়ু জুড়িয়ে দিচ্ছে দেহ ও মনকে। সকাল সাড়ে ছ'টায় পৌঁছলাম দমদম এয়ারপোর্টে। আমাদের ফ্লাইট নম্বর এ. আই-৩০২। প্লেন ছাড়বে সকাল ৭-৩৫ মিনিটে।

এখানে পরিচয় হল টি. সি. আই-এর দুজন কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁরা এসেছেন আমাদের প্লেনে তুলে দিতে। পরিচিত হলাম মিস্টার ও মিসেস্ রাওয়ের সঙ্গে। ডাঃ সাহা এবং মিস্টার মুখার্জীর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল কুণ্ডুদের অফিসে। আমরা সাতজন যাত্রী একত্রিত হলে মুস্তাফী, দেবী এবং টি. সি আই-এর কর্মচারীরা আমাদের সুটকেসগুলি নিয়ে গেল এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টারে। সেখানে আমাদের প্লেনের টিকেট দেখিয়ে সুটকেস্‌গুলি ওজন করিয়ে এবং এয়ার ইণ্ডিয়ার ট্যাগ লাগিয়ে জমা দেওয়া হল ওদের কাউণ্টারে। তারপর দেবী আমাদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে এক্সচেঞ্জ কাউণ্টার থেকে বদল করে আমাদের প্রত্যেককে এনে দিল নগদ সাতটি করে মার্কিন ডলার। এইটেই হচ্ছে আমাদের পাথেয়।

এর আগে আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের নামে যে একশো ডলারের ট্র্যাভেলার্স চেক দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্লেনে উঠে দিয়ে দিতে হবে আমাদের গ্রুপ লীডারকে। ঐ একশো ডলারের চেকগুলির ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই। আমাদের সম্বল মাত্র সাত ডলার করে। তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে যদি কেউ কিছু নিয়ে থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র।

যথাসময়ে বন্ধু গোপাল, ভাইপো আশীষ এবং ভাইঝি জামাই অচ্যুতের শুভেচ্ছা নিয়ে, কাঁধে কিডব্যাগ ঝুলিয়ে ঢুকলাম সিকিউরিটি রুমে। কাস্টমস্ অফিসার প্রথমে দেখলেন আমার পাস্‌পোর্ট এবং হেল্‌থ্ সার্টিফিকেট তারপর কিডব্যাগ খুলতেই দেখতে পেলেন আমার দামী রোলি-ফ্লেক্স ক্যামেরা, ওমেগা ঘড়ি এবং সোনার আংটি ও বোতাম। এইগুলি তিনি আমার পাস্‌পোর্টের ওপর নোট করে দিলেন, যাতে ফিরে এলে এগুলি নিয়ে কোন ঝামেলা না বাধে।

কাস্টম্‌সের ছাড়পত্র পেয়ে গেছি। আর বাইরে যাওয়া বা বাইরের কারো সঙ্গে দেখা করাও চলবে না। সাহাদা বললেন, চলুন, দোতলার লাউঞ্জে গিয়ে বসা যাক।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত বিরাট হল্‌ঘর। চারিদিকে পাতা রয়েছে সোফা, কৌচ, ডিভান, সেণ্টার টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি। টেবিলগুলির ওপরে সাজানো রয়েছে নানান্ দেশের নানান্ পত্র পত্রিকা। চারটি দেওয়ালই ফ্রেসকোতে ভরা, তার মধ্যে রয়েছে বিরাট একটা এভিয়েশান্ ম্যাপ।

মুখার্জীদা আমার আর সাহাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সামনের বার-এর দিকে। সেখানে লেখা রয়েছে– ফ্রী ড্রিঙ্কস্। হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, বীয়ার ছাড়াও রয়েছে চা, কফি, নানা রকমের ফলের রস, অরেঞ্জ, কোকাকোলা ইত্যাদি। চা ও কফিতে আমি বিশেষ অভ্যস্ত নই আর ওয়াইন তো নয়ই, সুতরাং ঠাণ্ডা বীয়ার পান করাই শ্রেয়। এতে তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি দুই দূর হবে। ইতিমধ্যে মাইকে ঘোষণা করা হল যে আমাদের প্লেন শীঘ্রই আসছে।

ঠিক সাড়ে সাতটায় আমাদের প্লেন ঈগল পাখির মত নেমে এলো মাটিতে। ওয়েটার তিনটে বিল এনে আমাকে, সাহাদাকে আর মুখার্জীদাকে দিল। মুখার্জীদা ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন 'ফ্রী ড্রিঙ্কস্' লেখাটার ওপরে। ওয়েটার হেসে জবাব দিল, হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি এবং বীয়ার ছাড়া আর সব পানীয়ই বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

বিপদে পড়লাম। মাত্র সাত ডলার সম্বল, এর মধ্যে এক ডলার চলে যাবে বীয়ারের দাম হিসাবে! নির্লজ্জের মত তাই বলে ফেললাম, ভাই, আমরা জানতাম না যে এসবের দাম লাগবে। আর তাছাড়া আমাদের কারো কাছেই পয়সা নেই। ওয়েটার কটাক্ষ হেনে চলে গেল এবং এ কথা জানাল তার মালিককে। মালিক একটু বক্র দৃষ্টিতে আমাদের দেখে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ইতিমধ্যে এয়ার ইণ্ডিয়ার কর্মচারীরা আমাদের বোর্ডিং কার্ড দিয়ে গেছেন। আটটার সময় মাইকে সুরেলা কণ্ঠে ঘোষণা করা হল—এ. আই. ফ্লাইট্ নং ৩০২ যাত্রার জন্য প্রস্তুত, যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন প্লেনে গিয়ে উঠে বসেন। আমরা সকলেই চললাম করিডরের দিকে।

করিডরে ঢোকবার মুখে রয়েছে ৫/৬টা চেকপোস্ট। প্রত্যেক চেকপোস্টে রয়েছে দুজন বন্দুকধারী পুলিস এবং একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সিকিউরিটি অফিসার। যাত্রীরা একে একে চেকপোস্টে ঢুকে প্রথমে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন মহিলাটির সামনে। মহিলাটি প্রত্যেক যাত্রীকে দু'বাহু তুলে দাঁড়াতে বলে তাঁর ডিটেক্টর যন্ত্রটি আরতির ভঙ্গীতে প্রত্যেক যাত্রীর সর্বাঙ্গে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুসন্ধান করছেন তাঁর দেহের কোথাও কোন অস্ত্র লুকানো আছে কি না। মহিলাটির পরীক্ষা করা শেষ হলে পুরুষটির পালা। তিনি প্রত্যেকের দেহ পরীক্ষা করছেন হাত দিয়ে।

সাহাদা, মুখার্জীদা এবং আমি, তিনজনেই গৌর-নিতাই হয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম চেকপোস্টের মহিলাটির সামনে। আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহিলাটি বললেন, দাদু, আপনাদের পরীক্ষা করে আর সময়ের অপব্যয় করব না। আপনারা যেতে পারেন।

আমি রসিকতা করে বললাম, দিদিভাই, আমরা কি হাইজ্যাক্ করতে পারি না?

দিদিভাই মুচকি হেসে আঙুল দিয়ে আমাদের মাথার চুলগুলি দেখিয়ে বললেন, দাদু, এই হল আপনাদের উত্তর।

সত্যিই তো, আমাদের তিনজনেরই তো পক্ক কেশ এবং মাথায় টাক। সামনের মাসে আমি ৬৫ বছর বয়সে পা বাড়াব, আর সাহাদা এবং মুখার্জীদা আমার চেয়েও অন্ততপক্ষে ৩/৪ বছরের বড়। হাল্কা মনটা ভারাক্রান্ত হল। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অকর্মণ্য হয়ে পড়ছি। ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি মরণের পথে।

মানুষের জীবনের চারটি স্তর। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য। শৈশবে: অম্লান, উজ্জ্বল, উচ্ছল। কৈশোরে: দুরন্ত, চপল, চঞ্চল। যৌবনে: উদ্দাম, উত্তাল ও উচ্ছৃঙ্খল। আর বার্ধক্যে: ধীর, স্থির, গম্ভীর, অবিচল, অচঞ্চল এবং অচল। ভোগের লালসা আছে, নেই উপভোগের ক্ষমতা। মন কাঁদছে, আবার ফিরে যেতে চাইছে সেই ফেলে আসা দায়িত্বহীন অতীত স্তরগুলিতে।

করিডর দিয়ে নেমে চলেছি সামনের ময়দানের দিকে। করিডরের দু'পাশ কাঁচ দিয়ে ঘেরা। সামনের ময়দানে দেখতে পাচ্ছি দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঈগল পাখি। বাঁদিকে হ্যাঙ্গার-এর ভেতরেও দেখছি অনেকগুলি প্লেন রয়েছে, আর ডানদিকে টারমিন্যাল ভবন। ভবনটির ছাদে এবং বারান্দায় বেশ ভিড়। দেখতে পাচ্ছি বারান্দার রেলিং ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে গোপাল, অচ্যুত, আশীষ, দেবী ও মুস্তাফী। ওরা রুমাল নেড়ে আমাদের যাত্রার শুভ কামনা করছে।

এয়ার ইণ্ডিয়ার বাসে চড়ে আমরা প্লেনের কাছে গেলাম। তারপর প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাত নেড়ে এবং রুমাল নেড়ে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। প্লেনের দরজায় করজোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন তন্বী সুন্দরী তরুণী। তারা 'নমস্তে' বলে আমাদের অভ্যর্থনা করল এবং দেখতে চাইল আমাদের বোর্ডিং কার্ড। বোর্ডিং কার্ড দেখাতে তারা আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল নির্দিষ্ট আসনে।

ঈগল পাখি আমাদের উদরস্থ করে ধীর পদক্ষেপে চলতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে থামল এবং আরম্ভ করল বিকট গর্জন। কিছুক্ষণ গর্জন করে শরীরটাকে তাতিয়ে নিয়ে দিল ছুট্। তারপর ছুটতে ছুটতে ঈগল পাখি এক ফাঁকে আমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে চলল আকাশ পথে। এতক্ষণে আমি উদ্বেগমুক্ত হলাম। এবার তাহলে সত্যিই আমি জাপানে যাচ্ছি।

অনেকে আছেন যাঁদের বাইরেটা অত্যন্ত রূঢ় এবং রুক্ষ, কিন্তু অন্তরটা কোমল এবং স্নেহপ্রবণ। এই জেট্ প্লেনগুলি তাই—বাইরের কান ফাটা বিকট শব্দে অতিষ্ঠ হতে হয়, কিন্তু এর ভেতরের নিস্তব্ধতায় মনে হবে যেন কোন নিঝুম পুরীতে বিরাজ করছি।

আমাদের ঈগল পাখির শীতাতপনিয়ন্ত্রিত উদরটি এবং মোটা গদি আঁটা পুশ-ব্যাক্ সীটগুলি ভারী আরামদায়ক। আরাম করতে হলে পিঠের দিকটা

একটু হেলিয়ে দিয়ে তার ওপরে মাথা রেখে দিব্যি সুখনিদ্রা দেওয়া যায়।

সুবেশা বিমান সেবিকারা ট্রেতে করে ও-ডি-কোলনের জলে ভেজানো গরম তোয়ালে দিয়ে গেল। গরম তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে ভারী আরাম পেলাম। এরপর ট্রেতে করে এলো ২।৩ রকমের ঠাণ্ডা ফলের রস। আমি দু' গেলাস কমলা লেবুর রস খেলাম। শরীরটা ঠাণ্ডা হল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা উড়ে চলেছি সুন্দরবনের ওপর দিয়ে। নীচে দেখতে পাচ্ছি যেন এক বিরাট সবুজ কার্পেট বিছানো রয়েছে, তাতে অসংখ্য হিজিবিজি সাদা সাদা দাগ কাটা। একজন বিমান সেবিকা জানালেন—ঐ সাদা সাদা দাগগুলি হচ্ছে সুন্দরবনের নদী, নালা, খাল, বিল ইত্যাদি।

তখন সকাল ন'টা। আমরা চলেছি বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা করা হল—আপনারা ঘড়ির কাঁটা দেড় ঘণ্টা এগিয়ে দিয়ে ব্যাংকক সময় করে নিন। আমরা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে ভারতীয় সময় ন'টার পরিবর্তে করে নিলাম ব্যাংককের সময় সকাল সাড়ে দশটা।

আমার জাপান ভ্রমণের প্রথম উদ্যোক্তা প্রশান্তবাবুর কথা চিন্তা করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি এমন সময় বিমান সেবিকার কণ্ঠ শুনলাম, প্রাতঃরাশ এনেছি, আপনার সামনের টেবিলটা খুলুন।

তা প্রাতঃরাশ বেশ ভালই দিল—ব্রেড-রোল, মাখন, চীজ, মার্মালেড, জ্যাম, চিকেন স্যাণ্ডুইচ, মাটন-রসোলি, আপেল এবং চা বা কফি। আমি চীজ আর আপেলটা পকেটস্থ করলাম।

আবার মাইক বেজে উঠল। ঘোষণা করল—কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা উড়ে যাব আকিয়াবের ওপর দিয়ে। সেখানকার আবহাওয়া খুবই দুর্যোগপূর্ণ, যাত্রীরা যেন নিজ নিজ কোমরে সীট-বেল্ট বেঁধে নেন।

আমাদের প্লেন যাচ্ছিল ৩০০০০ ফিট ওপর দিয়ে, ঘণ্টায় প্রায় ৫০০/৫৫০ মাইল বেগে, হঠাৎ এক লাফে উঠে পড়ল ৪০০০০ ফিট ওপরে। যদিও নীচেটা ঘোর অন্ধকারে ঢাকা তবুও তার ফাঁকে ফাঁকে অতি ক্ষুদ্রাকারে দেখা যাচ্ছে সেখানকার গাছপালাগুলো। ওখানে যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল ঐ গাছপালাগুলির দুলুনি দেখে। আকিয়াবের পর কখন যে আমরা আরাকান পেরিয়েছি ঘন অন্ধকারের জন্য কিছুই টের পাইনি।

আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমরাও খুলে ফেলেছি আমাদের সীট-

বেল্টগুলি। এখন চলেছি বর্মার ওপর দিয়ে। নীচের নদ-নদী, পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, প্যাগোডা সব দেখাচ্ছে খেলনার মত। আমাদের প্লেন উড়ে চলেছে ঘণ্টায় প্রায় ৬০০ মাইল বেগে। মাইক বেজে উঠল। সকলকে অনুরোধ জানানো হল কোমর-বন্ধ পরার জন্য। আরো জানানো হল যে আমরা ব্যাংককের ডংমুয়াং বিমান বন্দরে অবতরণ করছি।

ব্যাংককের সময় দুপুর বারোটায় আমাদের ঈগল পাখি ধীরে ধীরে স্পর্শ করল থাইল্যাণ্ডের মাটি। তারপর তার উদরের কপাট গেল খুলে। কপাটের কাছে সেই দুই বিমান সেবিকা করজোড়ে নমস্তে বলে আমাদের বিদায় জানাল। আমরাও বিমান থেকে নেমে পড়লাম থাইল্যাণ্ডের মাটিতে। কলকাতা থেকে ব্যাংকক ১৬৩৫ কি. মি. বা ১০১৬ মাইল। এই পথ আসতে আমাদের সময় লাগল ২ ঘণ্টা।

ব্যাংকক

সিকিউরিটি রুমের চেক্‌পোস্টে জমা দিলাম আমাদের ডিস্‌এম্বার্কেশন ফর্ম, তারপর পাসপোর্ট, হেল্‌থ সার্টিফিকেট্‌ ও ভিসা দেখিয়ে ছাড়পত্র নিয়ে আমরা এসে মিলিত হলাম লাউঞ্জে। এখানে আমাদের গ্রুপ লীডার শ্রীমতী হিল্লা লালকাকা, ইনি একজন পার্শী মহিলা, আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর ঘুরন্ত চাকি থেকে যে যার স্যুটকেস তুলে নিয়ে স্থানীয় গাইডের সঙ্গে মিনিবাসে করে চললাম হোটেলের দিকে।

আমাদের গাড়ি চলেছে বেশ প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে। গাইড আমাদের শোনাচ্ছেন পথের বিবরণ। পথের দু'পাশে সব গগনচুম্বী বাড়ি—কোনটা অফিস, কোনটা ব্যাঙ্ক, কোনটা কাছারি, কোনটা পোস্টাফিস্‌ আবার কোনটা বা দোকান-ঘর। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তা প্রশস্ত হলে হবে কি, এখানেও দেখি সেই কলকাতার মত গাড়িতে রাস্তা জ্যাম। আমাদের গাড়িও জ্যামে আটকা পড়ল। ইত্যবসরে গাইড আমাদের শোনালেন ব্যাংককের ইতিকথা :—থাইল্যাণ্ডের বর্তমান রাজধানী ব্যাংকক। বস্তুতঃ চাও-ক্র্যায়া নদীর পুবদিকে ব্যাংকক এবং পশ্চিম দিকে থন্‌বুরি—এই দুটি শহর নিয়ে গড়ে উঠেছে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী।

থাইল্যাণ্ডের পূর্ব নাম ছিল সাইঅ্যাম্‌ বা শ্যাম্‌। থাইল্যাণ্ডের অবস্থিতি বিষুবরেখার প্রায় ৯০০ মাইল উত্তরে। এর পুবদিকে বয়ে চলেছে মেকং আর

পশ্চিম দিকে শ্যালুয়ান নদী। মূল শহর থেকে শ্যাম উপসাগরের দূরত্ব ২২ মাইল। থাইল্যাণ্ডকে বলা হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাভিস্থল বা কেন্দ্রস্থল। এর উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিমে রয়েছে—ভিয়েৎনাম, ক্যাম্বোডিয়া, লাওস্ ও ব্রহ্ম-দেশ বা বর্মা আর দক্ষিণে শ্যাম উপসাগর, আরও দক্ষিণে রয়েছে—মালয়েশিয়া, আন্দামান সাগর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। থাইল্যাণ্ডের অর্থ হল স্বাধীন দেশ (Land of the free)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র থাইল্যাণ্ডই আজ পর্যন্ত কোন পাশ্চাত্য দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়নি।

আমাদের বাস এসে দাঁড়াল তিন তারাযুক্ত পেনিন্‌সুলা হোটেলের সামনে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক হাঁটু জল ভেঙে এসে দাঁড়ালাম হোটেলের বিরাট কাঁচের দরজার সামনে। কাঁচের দরজা বন্ধ। তার বাইরে এবং ভেতরে দুটি পাপোস পাতা। পাপোসের ওপরে উঠে দাঁড়াতেই কাঁচ দুটি আপনা থেকে দু'দিকে সরে গিয়ে ভেতরে যাবার পথ করে দিল। আবার ভেতরে ঢুকে পাপোস থেকে নেমে দাঁড়াতেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁচ দুটি সরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। এক হাঁটু জল ভেঙে হোটেলের ভেতরে ঢুকতেই একটা গানের কয়েকটা কলি আমার মনে পড়ে গেল :—

'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না,
পথের শুকনো ধুলা যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো,
অনাহুতের মত।'

এ যেন অম্বরদেব আমাদের পথের কষ্ট লাঘব করার জন্য অশ্রু বর্ষণ করে ভিজিয়ে দিলেন পথের যত শুকনো ধুলা।

হোটেল বাড়িটা বারোতলা। এর ভেতরে আছে বার রেস্তোরাঁ সুইমিং-পুল পোস্টাফিস্ ও গ্যারেজ। আমার ঘর মিলেছে আটতলায়। এই ঘরে আছি আমি ও রাজস্থানের প্রাক্তন এম. এল. এ. ব্যারিস্টার ঠাকুর মান্ধাতা সিং। বাথরুম সংযুক্ত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর। ঘরে রয়েছে টেলিফোন রেডিও টেলিভিসন্ ও চিঠি লেখার সাজ-সরঞ্জাম। এক কথায় বলা যায় সুসজ্জিত।

খানিক পরে ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। 'কাম ইন' বলতেই ঘরে এসে ঢুকল হোটেলের তকমা আঁটা ২০।২২ বছর বয়সের এক বেয়ারা। সে আমাদের একটা ক্যাটালগ দেখতে দিল। তাতে লেখা রয়েছে হামাম্-বাথ এত ডলার, টার্কিশ বাথ এত ডলার, ম্যাসাজ এত ডলার। সেই রকম

ব্লু-ফিল্ম অর্থাৎ অশ্লীল চলচ্চিত্র দর্শন এত, বেড পার্টনার অর্থাৎ শয্যাসঙ্গিনী এত ··ইত্যাদি।

বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, বেড পার্টনার এই ঘরে আসবে তো? উত্তরে সে জানালো আসতে পারে, তবে তার জন্য খরচা অনেক বেশি লাগবে। সিং ও আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওকে বিকেলে আসতে বলে বিদায় করলাম।

স্নান সেরে পোশাক বদলে সকলে একতলায় মিলিত হলাম। তারপর একহাঁটু জল ভেঙে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গাইডের সঙ্গে চললাম বাইরের কোন চাইনিজ রেস্তোরাঁতে মধ্যাহ্নভোজ সারতে। কারণ এখানে মধ্যাহ্ন ভোজে যে খরচ পড়বে সেই খরচেই অনেক ভাল খাবার পাওয়া যাবে রেস্তোরাঁতে।

তা মধ্যাহ্নভোজ মন্দ হল না—টমাটো-স্যুপ, পাঁউরুটি, মাখন, আলু ও কুচোচিংড়ি ভাজা, ভেজিটেবল-স্যালাড, মোটা চালের ভাত, চিকেন কারি, আনারসের বেশ একটা বড় চাকলা এবং চা কিংবা কফি। এ রকম সুস্বাদু আনারস এর আগে আমি কখনও খাইনি।

মধ্যাহ্নভোজ সেরে স্বয়ংচালিত লিফ্‌টে আটতলায় উঠে এসে ঘরে ঢুকতে যাব দেখি ঘরের সামনে কাউন্টারে বসে বই পড়ছে ২৪/২৫ বছরের এক সুশ্রী তরুণী। শুনলাম ইনি আমাদের আটতলার রিসেপশনিস্ট, নাম চই লাই।

মেয়েটি বেঁটে হলে হবে কি, বেশ আঁটসাঁট দেহ, পীতবর্ণ গায়ের রং, মুখটা গোল, তবে নাকটা চ্যাপটা। তাহলেও তাকে সুন্দরী না বললে তার প্রতি অবিচার করা হবে। সবে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করেছি, এমন সময়ে মিসেস্ লালকাকার ডাক কানে এলো—আপনারা দশ মিনিটের ভেতরে প্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে আসুন, বাস এসে গেছে। কি আর করা যায় নীচে নেমে এলাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশও পরিস্কার হয়েছে। গাইডের সঙ্গে মিনিবাসে করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি শহর এবং কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখতে। রাস্তা বেশ চওড়া, তবে খুব একটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। রাস্তার দু'পাশে ফুটপাথ। সকলেই যাতায়াত করছে ফুটপাথের ওপর দিয়ে। দু'পাশে দশতলা, বিশতলা গগনচুম্বী বাড়ি। দু-একটি ছাড়া অধিকাংশ রাস্তারই জল নেমে গেছে। মিছিল বেরিয়েছে। চলেছে রাস্তার একপাশ ঘেঁষে। আমাদের কলকাতার মত ট্রাম বাস বন্ধ করে রাস্তার মাঝখানে দিয়ে নয়।

গাইড বলল, তিনটি থাই শব্দের অর্থ আপনারা মনে করে রাখুন যাতে বোঝবার কোন অসুবিধা না হয়। ওয়াট্ (Wat)—এটি ঠিক মন্দির

নয়, উপাসনা ও ধর্মচর্চার মন্দির-ভবন। এখানে দেবতার মূর্তি থাকতেও পারে আবার না-ও পারে। যেমন ইংরেজদের চ্যাপেল বা বৌদ্ধদের মঠ বা উভয়ের সংমিশ্রণ। বট্ (Bot)—অর্থাৎ মন্দির। এই মন্দিরে বুদ্ধ বা অন্যান্য দেবতাদের মূর্তি থাকে। এখানে নিয়মিত পূজা পার্বণাদি হয়। ভিহারণ (Viharn) —এটি একটি মন্দিরের মত। এখানে ধর্মীয় বা পবিত্র সব জিনিসপত্র সংরক্ষিত হয়। পূজা বা উপাসনা হয় না।

ওয়াট্-ট্রাইমিট্ (Wat Traimit—ইংরেজী নাম—Monastery of the Golden Buddha) : আমাদের বাস এসে দাঁড়াল ট্রাইমিট্ মন্দির-ভবনের সামনে। আমরা ঢুকলাম অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত বিরাট এক হল্‌ঘরে। এই হল্‌ঘরে রয়েছে যোগাসনে বসা, হাতে অভয় মুদ্রা খাঁটি সোনার বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তিটির উচ্চতা তিন মিটার। ওজন সাড়ে পাঁচ টন। গাইডের কাছে জানতে পারলাম মূর্তিটি সম্ভবত সুখোথাই (Sukhothai)-এর সময়কার, অর্থাৎ ১২৩৮ থেকে ১৩৭৮ সালের মধ্যে। ঐ সময়ে ব্যাংকক বন্দরকে আরো বড় করার প্রয়োজনে সরকার ব্যাংককের নীচের দিকের একটা শহর দখল নেন। সেই সময় সেখানে ছিল ওয়াট্-ফ্রায়া-ক্রাই (Wat Phraya Krai) নামে ভগ্নদশায় পরিত্যক্ত বিরাট এক মন্দির-ভবন। বন্দর সম্প্রসারণের কাজে মন্দির-ভবনটি ভাঙতে গিয়ে দেখা গেল তার ভিতরে রয়েছে প্লাস্টারের তৈরি দুটি বিরাট বুদ্ধের মূর্তি। একটি পাঠিয়ে দেওয়া হল গ্রামাঞ্চলে এবং অপরটিকে এই ওয়াট্-ট্রাইমিটে নিয়ে এসে চত্বরের এক কোণে একটি অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করে রাখা হল।

১৯৫৩ সালের ২৫শে মে অক্ষত অবস্থায় মূর্তিটি সরাবার জন্য আনা হল বড় একটা ক্রেন্। সেই ক্রেনের হুক দিয়ে মূর্তিটিকে চেপে ধরতেই কড়কড়্ শব্দে মূর্তিটি চিড় খেয়ে ধরাশায়ী হল। আর সেই রাত্রে সারা ব্যাংকক শহরে চলল বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা। মূর্তিটি ঢেকে গেল ধুলা, বালি, কাদায়। ঝড়বৃষ্টি থামতে ওয়াট্-ট্রাইমিটের প্রধান কর্তা মূর্তিটির ধুলা, বালি, কাদা, মাটি পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখতে পেলেন মূর্তিটির একটি বড় ফাটলের ভিতরে কি যেন চক্‌চক্ করছে। তিনি মঠের সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ডাকলেন তারপর সকলে মিলে খুলে ফেললেন মূর্তির প্লাস্টারের আবরণ। বেরিয়ে এলো এই অপূর্ব স্বর্ণমূর্তিটি।

ওয়াট্‌-বেঞ্চামা-বোফিত (Wat Bechama Bophit—ইংরেজী নাম—The Marble Monastery): এটি থাইবাসীদের সর্বাধুনিক স্থাপত্যকলার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৮৯৯ সালে রাজা চুলালংকর্ণ বা পঞ্চম রামার অনুরোধে একজন ইতালীয় শিল্পী এই মন্দির-ভবনটি ইতালীয় শ্বেত পাথর দিয়ে থাই স্থাপত্য শিল্প অনুযায়ী নির্মাণ করেন। চীনামাটি দিয়ে তৈরি কারুকার্যময় সোনালী রঙের টালির ছাদ। ছাদটা দু'দিকে ঢালু। ঢালের ওপরে টালিগুলির খাঁজে খাঁজে পিতলের তৈরি ছোট ছোট নৌকার মত কি সব জিনিস হাওয়ায় দুলছে এবং সূর্যকিরণে ঝক্‌মক্‌ করছে। আর ঢালের নীচের দিকের টালির খাঁজগুলিতে ঝোলানো পিতলের তৈরি ছোট ছোট সব ঘণ্টা। ঘণ্টাগুলি মৃদু মৃদু ঠুং ঠাং শব্দ করতে করতে হাওয়ায় দুলছে।

সোনালী গিল্‌টি করা ফ্রেমে রঙিন কাঁচ লাগানো ঘরের জানালাগুলি এবং বিভিন্ন জানালায় বিভিন্ন রঙের কাঁচ। প্রত্যেক জানালার নীচে রয়েছে একটি করে গজদন্তধারী দানবের মূর্তি। প্রতিটি দানব তাদের গজদন্ত দুটি দিয়ে ধরে রয়েছে প্রতিটি জানালা। এই জানালাগুলির ওপরের খিলানগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক মূর্তি। পূবদিকের খিলানে রয়েছে ভারতীয় হিন্দুদের বিষ্ণু মূর্তি। উত্তরদিকে রয়েছে এরোয়ান (Erawan) বা তিন মাথাযুক্ত শ্বেতহস্তীর মূর্তি। থাইল্যাণ্ড এবং বর্মাতে কদাচ দু-একটি সাদা হাতী দেখা যায়। তবে তার তিনটি মাথা নয়, একটিই মাথা। থাই, বর্মী এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা শ্বেতহস্তীর পূজা করে। কারণ গৌতম বুদ্ধর জন্মাবার পূর্বে তাঁর মা স্বপ্ন দেখেন যে বিরাট এক শ্বেতহস্তী তাঁর গর্ভে প্রবেশ করল। তিনি গর্ভবতী হলেন এবং সেই গর্ভে জন্ম হল গৌতম বুদ্ধের। আর দক্ষিণদিকের খিলানে রয়েছে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত একটি চিহ্ন। থাইয়েরা এই চিহ্নকে বলে উনালম্‌ (Unalom) অর্থাৎ বৌদ্ধ আইনের চক্র।

মন্দির-ভবনের সিংহদ্বার আগলে বসে আছে শ্বেত পাথরের বিরাট দুট সিংহ মূর্তি। উঠানের দেওয়ালগুলিতে রয়েছে নানান্‌ ভঙ্গিমায় ব্রোঞ্জের অসংখ্য বুদ্ধ মূর্তি। বিরাট একটি হল্‌ঘরের একধারে রয়েছে ধ্যানমগ্ন এক বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তির তিনদিক কারুকার্যমণ্ডিত সবুজ পর্দায় ঢাকা। আর মাথার ওপরে খাটানো রয়েছে লাল ভেল্‌ভেটের ওপর জরির কাজ করা চাঁদোয়া। ঘরের চারটি দেওয়ালেই আঁকা রয়েছে বুদ্ধের নানান্‌ ভঙ্গিমার ছবি। মন্দির সংলগ্ন সন্ন্যাসীদের থাকার মঠগুলিও এই একই ধাঁচে তৈরি। এরপরে মন্দির

প্রাঙ্গণে একটি বিরাট বোধিবৃক্ষ দেখিয়ে গাইড বললেন—১৯০০ সালে পঞ্চম রামা বা রাজা চুলালংকর্ণের আদেশে ভারতের বুদ্ধগয়া থেকে বোধিবৃক্ষের একটি চারা এনে এখানে রোপণ করা হয়েছিল, সেই চারাগাছটিই আজ এই বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও জানালেন—রাজা চুলালংকর্ণের রাজত্বকাল ১৮৬৮ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত।

এবার আমরা চলেছি রাজপ্রাসাদের দিকে। রাস্তার দু'পাশের ফুট্‌পাথের ওপর দিয়ে অনেক লোকজন যাতায়াত করছে। বিচিত্র তাদের সাজ-পোশাক। পথের দু'ধারে টকটকে লাল ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছের মত বড় বড় কি সব গাছ রয়েছে। পড়ন্ত রোদে গাছের ফুলগুলি অগ্নিশিখার মত জ্বলছে। গাইড জানালেন এই গাছগুলির নাম রয়্যাল্ পয়ন্‌সিয়্যানা বা ফ্লেম্ ট্রি।

ওয়াট্-ফ্রা-কেও (Wot-Phra Kaeo—ইংরেজী নাম—The Emeratd Buddha Chapel)—আমরা এসেছি রাজপ্রাসাদের চত্বরের ভিতরে। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল বিচিত্র ধরণের কতকগুলি স্থাপত্যশিল্পের প্রতি। গাইড জানালেন যে থাইবাসীরা এগুলিকে বলে ছেদি (Chedi)। খ্রীশ্চানদের ধর্মীয় প্রতীক যেমন ক্রশ, সেই রকম বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী থাইবাসীদের ধর্মীয় প্রতীক হচ্ছে এই ছেদি। আমাদের পূজার সময়ে পুরোহিতেরা যে রকম হাত-ঘণ্টা ব্যবহার করেন এগুলি দেখতে অনেকটা সেই রকম। নীচের দিকটা গোল এবং ওপর দিকটা ক্রমশঃ সরু হতে হতে চোঙ্গার মত হয়ে গেছে। গাইড বললেন এগুলি বৌদ্ধ স্তূপ এবং প্যাগোডার সংমিশ্রণে গঠিত। অর্থাৎ নীচের দিকটা স্তূপের মত এবং ওপর দিকটা প্যাগোডার মত। এগুলির এক একটির উচ্চতা প্রায় ২৫/৩০ ফিট্ এবং গোলাকারের ব্যাস প্রায় ৮/১০ ফিট্। এগুলি এক একজন রাজা তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে এক একটি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। ছেদিগুলির সারা অঙ্গ রঙ্গিন প্লাস্টারে আবৃত এবং বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত।

এবার আমরা দেখতে এসেছি এমারাল্ড বুদ্ধ বা পান্না পাথরে নির্মিত বুদ্ধদেবকে। মন্দির-ভবনটি খুব সুন্দর। এর ছাদটা কিন্তু মন্যাস্ট্রি অফ দ্যা গোল্ডেন্ বুদ্ধ এবং মার্বেল মন্যাস্ট্রির মত ঢালু নয়। এখানেও দেখছি মন্দির-ভবনের সিংহদ্বার পাহারা দিচ্ছে পাথরের দুই সিংহ মূর্তি। মন্দিরের গায়ের রং সোনালী এবং তার ওপরে বিচিত্র রঙের নক্‌শা আঁকা। মন্দির বলতে বিরাট একটি হল্‌ঘর। হল্‌ঘরে প্রবেশদ্বারের কপাট দুটি আবলুস কাঠের,

এবং কপাট দুটিকে অলংকৃত করা হয়েছে মাদার অফ পার্ল খচিত করে। মুস্কিল হল মন্দিরে প্রবেশ করা নিয়ে। এখানকার নিয়ম পুরুষরা টাই এবং কোট না পরলে ভেতরে যেতে পারবে না। আর মহিলারা স্ল্যাক্‌স্‌ বা সর্টস পরে থাকলে ঢুকতে পারবেন না। আমাদের হিন্দু মন্দিরের মত এখানেও ঢুকতে গেলে জুতো, মোজা খুলে খালি পায়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। আমার গলাবন্ধ প্রিন্স কোটই আমাকে নিষ্কৃতি দিল টাইয়ের বন্ধন থেকে। আমাদের মধ্যে কেবল বাসুদেবই বুদ্ধ দর্শনে বঞ্চিত হল। কারণ তার পরণে ছিল ধুতি ও পাঞ্জাবী।

হল্‌ঘরের চারটি দেওয়ালই সোনালী রং করা। তার ওপর রয়েছে বহু বর্ণে আঁকা নানান্‌ রকমের নক্‌শা এবং ফ্রেস্কো বা দেওয়াল-চিত্র। ঘরের কড়ি-বর্গাগুলিও সোনালী এবং লাল রং করা। ঘরের দেওয়াল আর সীলিং সবই পালিশ করা। তাই তীব্র আলোতে সমস্ত ঘরটাই ঝল্‌মল্‌ করেছে। ঘরের একপাশে সোনালী গিল্‌টি করা একটি বেদির ওপরে বসানো রয়েছে সবুজ পাথরের তৈরি একটি বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তিটি দেখিয়ে গাইড জানালেন—এর উচ্চতা হচ্ছে দু'ফিট। এবং আসলে এটি কিন্তু আদৌ বহুমূল্য পান্নার মূর্তি নয়। এটি তৈরি হয়েছে একখণ্ড জ্যাস্‌পার পাথর কেটে। জ্যাস্‌পার হচ্ছে সবুজ রঙের মসৃণ এক রকম মূল্যবান পাথর। ঘরের তীব্র আলোতে মূর্তি দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে। মূর্তির মাথার ওপরে ঝুলছে জরির কাজ করা দামী ভেলভেটের চাঁদোয়া। মূর্তির গায়ে রয়েছে রত্নখচিত মূল্যবান ঢিলা পোশাক। গাইড আবার বলতে শুরু করলেন—এটি হচ্ছে রাজ পরিবারের নিজস্ব মন্দির। এই বিগ্রহের বেশ পরিবর্তন করা হয় বছরে তিনবার—গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকালে। রাজা নিজেই এই বেশ পরিবর্তন করান। সেই সময়ে এই মন্দির প্রাঙ্গনে বিরাট উৎসব হয়।

এরপর গাইড আমাদের শোনালেন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ১৪৩৬ সালে উত্তর থাইল্যাণ্ডের চিয়াং মাই নামক স্থানে পরিত্যক্ত ভাঙা বিরাট এক প্লাস্টারের বুদ্ধ মূর্তির ভেতর থেকে আবিষ্কৃত হয় জ্যাসপারের এই ছোট বিগ্রহটি। এটি অনেক হাত ফেরত হয়। সব শেষে রাজা তাক্‌ সিন্‌ বা প্রথম রামার রাজত্ব কালে বিগ্রহটি ফিরিয়ে আনা হয় থাইল্যাণ্ডে এবং ১৭৮৪ সালে রাজপ্রাসাদের চত্বরের ভেতরে একটি নতুন মন্দির তৈরি করে সেখানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবার গাইড আমাদের নিয়ে চললেন রাজপ্রাসাদের ভেতরে দুটি কক্ষ দেখাতে। একটি দরবার হল এবং অপরটি রাজ্যাভিষেক কক্ষ।

দ্যা চক্রি থ্রোন্ হল্ (**The Chakri Throne Hall**) **:** এটিকে দরবার হল্ বলে। এখানে বিভিন্ন প্রকার সরকারী ক্রিয়াকলাপ, যেমন : রাজার কাছে বিদেশী রাষ্ট্রদূতের পরিচয়-পত্র পেশ, দেশী বা বিদেশী সরকারী অতিথিকে আপ্যায়ণ কিম্বা কোন সরকারী কর্মচারীকে পদমর্যাদা বিতরণ ইত্যাদি সবই হয় এই কক্ষে।

দাসিত মহাপ্রসাদ হল (**Dusit Maha Prasad Hall**) **:** এই কক্ষে হয় রাজ্যাভিষেকের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ। দুটি কক্ষই বেশ সুসজ্জিত এবং জাঁকজমক পূর্ণ। এই কক্ষটিও নির্মাণ করেছেন জনৈক ইতালীয় স্থপতি। এরপর গাইড আমাদের নিয়ে এলেন আর একটি কক্ষে। কক্ষের চারিটি দেওয়ালে বহু বর্ণে সম্পূর্ণ রামায়ণ চিত্রিত করা আছে।

এ ছাড়া রাজপরিবারের সমাধি-গৃহ (Royal Pantheon) এবং মন্ডপ্ (Mondhop) বা বৌদ্ধ গ্রন্থের লাইব্রেরি দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম।

ওয়াট্-ফো (**Wat-Pho—ইংরেজী নাম Monastery of the Reclining Buddha**) **:** মন্দির প্রাঙ্গণে দেখি তখনও জল জমে রয়েছে। আমরা জুতো মোজা খুলে প্যান্ট গুটিয়ে আর মেয়েরা শাড়ি গুটিয়ে বাস থেকে নেমে ঢুকলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। এখানেও দেখি সেই বিচিত্র রঙের চারটি বড় এবং একটি ছোট ছেদি (Chedi)। এগুলি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন চক্রি বংশের প্রথম পাঁচজন রাজা। আমরা চললাম মূল মন্দিরের দিকে।

মূল মন্দিরের চতুর্দিক নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে আটটি ছোট প্রবেশ-পথ আছে। প্রত্যেক দরজা পাহারা দিচ্ছে দুটি করে ব্রোঞ্জের সিংহ মূর্তি এবং দেওয়ালের ওপরে রয়েছে তাঁবুর মত দেখতে আটটি সীমানা নির্দেশক চূড়া। চূড়াগুলির মাথায় বুদ্ধের আট রকমের প্রতীক চিহ্ন। পাঁচিল পেরিয়ে আমরা এলাম মন্দিরের কাছাকাছি। মন্দিরটি প্রাঙ্গন বেষ্টিত। প্রাঙ্গনের দু'পাশে রয়েছে দু'সারি গ্যালারি। গ্যালারিগুলির ওপরে সারিবদ্ধ ভাবে বসানো রয়েছে নানান্ ভঙ্গিমার বুদ্ধ মূর্তি। সমর গুনে বলল, সংখ্যায় ৩৯৪টা।

মূল মন্দিরটি দেখতে ঠিক তিনতলা প্যাগোডার মত। দু'তলায় এবং তিনতলায় কোন ঘর নেই। ছাদ তৈরি করা হয়েছে চারকোণা থামের ওপরে টালি সাজিয়ে। দু'তলার ছাদের টালিগুলির রং লাল আর তিনতলার ছাদের টালিগুলি হলুদ। মন্দিরের একতলায় হল্‌ঘরের প্রবেশ-দ্বারটি বর্মার

সেগুন কাঠে তৈরি। দরজার কপাট দুটিতে মাদার অফ্ পার্ল খচিত নানা রকমের নক্শা।

শ্বেত পাথরের প্যানেল বা কপাটের খোপগুলিতে খোদাই করা রয়েছে রামায়ণের নানান্ দৃশ্য। চারটি দেওয়াল বুদ্ধের জীবনী-চিত্রে পূর্ণ। সীলিং-এর কড়ি বর্গাগুলি সোনালী ও লাল রঙে ঝল্মল্ করছে। ঘরের এক পাশে একটি উঁচু বেদির ওপরে বসানো রয়েছে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের গিল্‌টি করা ব্রোঞ্জের মূর্তি। এই মূর্তিটি এখানে আনা হয়েছে থন্‌বুরির প্রাচীন এক মন্দির থেকে।

মন্দিরটিকে চারপাশ থেকে আগলে রেখেছে চারটি ভিহারণ (Viharn)। পূর্বদিকের ভিহারণে রয়েছে বুদ্ধের একটি দণ্ডায়মান মূর্তি। এটি আনা হয়েছে অযুথ্যায়া থেকে। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভিহারণে রয়েছে নানান্ রকম ভঙ্গিমায় বুদ্ধের অসংখ্য ছোট ছোট মূর্তি। এগুলি আনা হয়েছে সুখোথাই মন্দির থেকে। আর উত্তর ভিহারণে রয়েছে পাশ্চত্য কায়দায় উপবিষ্ট একটি বুদ্ধ মূর্তি।

এরপর আমরা এসেছি মন্দির প্রাঙ্গনের আরও পশ্চিমে একটি বড় ভিহারণে। এর ইংরেজী নাম হচ্ছে The Viharn of the Great reclining Buddha. একটি বড় হল্‌ঘরের ভিতরে একটি বেদির ওপরে পাশ ফিরে শায়িত অবস্থায় রয়েছে বিরাট এক মহানির্বাণ মূর্তি। মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ৪৬ মিটার এবং উচ্চতা ১৫ মিটার। এই মূর্তিটি ইট, চুন, বালি ও সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি। কিন্তু সমস্ত মূর্তিটি সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মূর্তির পায়ের পাতা দুটি মাদার অফ্ পার্ল দিয়ে তৈরি এবং পায়ের পাতায় রয়েছে ১০৮টি পবিত্র রেখা, যা গৌতম বুদ্ধের পদতলে ছিল। ভিহারণের বাইরের এবং ভেতরের মেঝে, দেওয়াল এবং সীলিং সব কারুকার্য মণ্ডিত এবং রত্নখচিত। আসলে এগুলি রত্ন নয়, এগুলি হচ্ছে সাধারণ কাঁচ এবং চীনামাটির।

দ্যা গ্রেট সুয়িং স্কোয়্যার ঃ মিউনিসিপ্যালিটির সদর কার্যালয়ের কাছে সুন্দর সুসজ্জিত বিরাট একটি পার্ক। এর মাঝখানে রয়েছে কদাকার দৈত্যের মত বিরাট লম্বা টকটকে লাল রঙের একটি দোলনা। দেখতে অনেকটা জাপানী টোরী (Torii) বা তোরণের মত। এর লম্বা পিলার দুটি এবং ওপরের বাঁকানো ক্রসবার বার্মার সেগুন কাঠে তৈরি। ক্রস্‌বারে খোদাই করা কারুকার্য দেখবার মত। আগে প্রতি বছরে এখানে বেশ জাঁকজমক পূর্ণ দোলন উৎসব হত। আজকাল আর উৎসব হয় না।

ওয়াট্ সুথাট্ (Wat Suthat): অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে আমরা উঠে এলাম উঁচু একটা সমতল ভূমিতে। এই সমতল ভূমির মাঝখানে রয়েছে একটি মন্দির। মন্দিরটির মুখ পূর্বদিকে। মন্দিরের দু'পাশে রয়েছে উত্তরমুখী দুটি ভিহারণ। মন্দির এবং ভিহারণ ভবনের চারপাশে রয়েছে আচ্ছাদিত উঠান। উঠানের গ্যালারিগুলিতে থাকে থাকে বসানো রয়েছে বুদ্ধের নানান্ ভঙ্গিমার গিল্‌টি করা মূর্তি। মন্দির প্রাঙ্গনের চারটি প্রবেশ-পথ। প্রত্যেক প্রবেশ-পথে রয়েছে দুটি করে দরজা। দরজার প্যানেলগুলিতে আঁকা রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের বহু স্বর্গীয় ছবি। গাইড জানালেন 'সুথাট্' এর অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রের স্বর্গীয় বাসস্থান। মন্দিরের ভেতরে দেখলাম দণ্ডায়মান অবস্থায় বিরাট এক বুদ্ধ মূর্তি। আর ভিহারণ দুটির ভেতরে আছে নানান্ ভঙ্গিমার অসংখ্য বুদ্ধ মূর্তি।

গাইডের কাছে জানতে পারলাম রাজা প্রথম রামা (১৭৮২-১৮০৯) শুরু করান এই ওয়াট্ সুথাটের নির্মাণ কার্য। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় রামা চালিয়ে গেলেন এর নির্মাণ কার্য, কিন্তু তিনিও শেষ করতে পারলেন না। শেষ করলেন রাজা তৃতীয় রামা (১৮২৪-১৮৫১)। তারপর রাজা চুলালংকরণ বা পঞ্চম রামা এই ওয়াট্ ভবনের কিছু অদল-বদল করিয়ে দাঁড় করিয়েছেন এর বর্তমান রূপ।

এখন চলেছি ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম দেখতে।

কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ সমর পুবদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, কল্যাণদা, ঐ দেখুন, ঐ দূরের পাহাড়ের ওপর একটা সোনার ছেদি (chedi) কেমন জ্বলজ্বল করছে। সত্যিই তো পড়ন্ত রোদে পাহাড় এবং ছেদি দুটিই কেমন জ্বলজ্বল করছে। গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা ওটা দেখতে যাব কি না? গাইড জানাল ওটা এখান থেকে অনেক দূরে। ওখানে যেতে গেলে রাত হয়ে যাবে। গাইডকে অনুরোধ করলাম ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে। গাইড বলতে শুরু করলেন—

ওয়াট্ স্যাকেত (Wat Saket—ইংরেজী নাম The golden Mount):

ঐ স্থানটি হচ্ছে বর্তমান ব্যাংকক শহরের সীমারেখা। পূর্বে ঐ স্থানটি ছিল আদি ব্যাংকক শহরের বাইরে পুরোনো সীমানা-প্রাচীরের পূর্বদিকে। বর্তমানে ব্যাংকক শহরের সীমারেখা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐটি হচ্ছে সারা ব্যাংকক শহরের সর্বোচ্চ ছেদি। ঐ স্থানটি বহুদিন যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। রাজা প্রথম রামা মন্দিরটি পুনরুদ্ধার করেন।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ওয়াট্ স্যাকেত্। প্রথম ও দ্বিতীয় রামার রাজত্বকাল শেষ হয়েছে। রাজা হয়েছেন তৃতীয় রামা। তাঁর ইচ্ছা হল যে পুরোনো রাজধানী অযুথ্যায়ার গোল্ডেন মাউন্ট বা সোনালী পাহাড়ের মত তিনিও ঐখানে একটি সোনালী পাহাড় নির্মাণ করিয়ে তার ওপরে স্থাপন করবেন ওয়াট্ স্যাকেত ও একটি সোনালী রঙের ছেদি। কিন্তু ব্যাংকক শহরটি তো সমতল ভূমির ওপর। সুতরাং তিনি আদেশ দিলেন ঐ সোনালী পাহাড়ের অনুকরণে একটি ঢিপি নির্মাণ করার। তাঁর সব চেষ্টা বিফল হল—একদিন হঠাৎ আপনা থেকেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ঢিপির সমস্ত কাঠামোটা। কৃতকার্য হলেন তাঁর উত্তরাধিকারী রাজা মঙ্কুট্—তাঁরই প্রচেষ্টায় টুকরো টুকরো আলগা পাথর (Rubble) দিয়ে নির্মিত হল সোনালী রঙের ছোট একটা পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে নির্মিত হল একটি মন্দির-ভবন এবং সোনালী রঙের বিরাট একটা ছেদি। সূর্যকিরণে এগুলি সোনার মত জ্বলজ্বল করে। নবনির্মিত ওয়াট্ স্যাকেতটি আসল নয়, ওটি হচ্ছে আদি ওয়াট্ স্যাকেতের একটি অংশ মাত্র।

ধর্মপ্রাণ থাইবাসীদের এটি একটি অতি পবিত্র স্থান। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে ওখানে উৎসব হয়। সেই সময়ে বিরাট মেলা বসে ঐ পাহাড়ের ওপরে। বহু দূর দূর দেশ থেকে পুণ্যার্থীরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠেন এবং পূজা দেন ও বুদ্ধের প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ ছেদিমূলে দীপ জ্বেলে দেন। সমস্ত ব্যাংকক শহর থেকেই দেখা যায় ঐ ছেদিটিকে।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম মিউজিয়ামের ভেতরে। সময় খুব অল্প। ফলে সমস্ত ঘর ঘুরে দেখা সম্ভব হল না—গাইড দেখালেন কয়েকটি মাত্র ঘর।

প্রথমে যে ঘরে ঢুকলাম সেখানে একটি বেদির ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন সৌম্যমূর্তি ভগবান গৌতম বুদ্ধ। তাঁর দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা। মূর্তিটি এমনই প্রাণবন্ত যে তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। দ্বিতীয় ঘরে রয়েছে অতীতের অস্ত্রশস্ত্র এবং তৃতীয় ঘরে অতীতের যোদ্ধাদের রণসাজ। চতুর্থ ঘরে রয়েছে গৌরবময় অতীতের স্মৃতি বিজড়িত নানা রকম প্রতিরূপ বা মডেল। পঞ্চম ঘরটি হচ্ছে বিচিত্র বর্ণের প্রাচীন এবং আধুনিক সাজপোশাক পরিহিত মডেলের ঘর। ষষ্ঠ ঘরে দেখলাম শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি ও শিল্প

উন্নয়নের নানা রকম প্রদর্শনী এবং সপ্তম ঘরে দেখলাম কাঠ, চীনামাটি, হাতির দাঁত, ভেড়ার সিং ও হাড়ের হস্তশিল্পের নিদর্শন—যার প্রত্যেকটিই লোভনীয়।

সূর্যিমামা পাটে বসেছেন, সুতরাং আমাদেরও আজকের মত দ্রষ্টব্য স্থান দেখা এইখানেই শেষ।

*　　*　　*

হোটেলের রিসেপশন রুমে যখন ঢুকলাম তখন দেওয়াল ঘড়িটার কোকিল দুটো কুক্-কুক্ করে আটবার ডেকে জানিয়ে দিল যে এখন রাত আটটা। আমাদের বড়-হাজরির বা নৈশভোজের সময় হয়েছে। সকলেই খুব ক্লান্ত, তাই মিসেস্ লালকাকা আমাদের নৈশভোজের আয়োজন করলেন আমাদের হোটেলেরই ডাইনিং হলে এবং সকলকে জানিয়ে দিলেন যে ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা সকলে এসে যেন মিলিত হই একতলার ডাইনিং হলে।

শাওয়ার-এর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করে বেশ তাজা হলাম। তারপর পোশাক বদলে যথাসময়ে সিং এবং আমি ডাইনিং হলে গিয়ে মিলিত হলাম আর সকলের সঙ্গে। আমাদের মধ্যে অনেকে নিরামিষভোজী, তাই আমরা টেবিলে খেতে বসলাম দু'ভাগে। একদিকে আমিষভোজী এবং অপরদিকে নিরামিষভোজী। নিরামিষভোজীরা কি খেলেন তা জানি না, তবে আমরা আমিষভোজীরা খেলাম চিকেন্-অ্যাসপারাগাস স্যুপ, ব্রেড রোল, শ্রিম্প্ বিরিয়ানী অর্থাৎ কুচো চিংড়ি মিশ্রিত বিরিয়ানী, চিকেন্ গ্রীল্, ক্যারামেল্ কাস্টার্ড ফ্রুট স্যালাড এবং কফি।

বেশ গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া মোটামুটি এক রকম হল। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর সকলেই ফেটে পড়ল মিসেস লালকাকার একটা বক্তব্যে। তিনি জানালেন আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই হাত-খরচের জন্য যে সাত ডলার করে আছে তার থেকে পাঁচ ডলার দিতে হবে আপনাদের টারমিন্যাল ট্যাক্সের জন্য। দু' ডলার ব্যাংকক থেকে টোকিও যাবার সময় ব্যাংকক বিমান বন্দরে লাগবে। আর দেশে ফেরার সময় হংকং বিমান বন্দরে তিন ডলার লাগবে। অনেক অনুনয় বিনয় করা হল মিসেস্ লালকাকাকে ঐ টাকাটা কোম্পানির তহবিল থেকে দেবার জন্য। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ভেবে দেখুন একবার, মাত্র দু' ডলার সম্বল করে জাপানে চলেছি!

খেয়ে-দেয়ে সিং চলে গেছে তার এক বন্ধুর সন্ধানে। আমি ঘরে একা বসে বিষণ্ণ মনে বাড়িতে চিঠি লিখলাম।

বাড়ির চিঠি লেখা শেষ করে রোজনামচাটা লিখছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। 'ভেতরে এসো' বলতেই হাসি মুখে চাই-লাই ঘরে ঢুকে বলল, আপনাকে বিরক্ত করলাম, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী ?

চাই লাই বলল, আজকের মত আমার কাজ শেষ হল, এখন আমার ছুটি। যাবার আগে সব ঘরগুলি চেক্‌আপ করে আমার পরবর্তিনীকে সব বুঝিয়ে দিলে তবেই আমার ছুটি মিলবে। এই বলে সে প্রথমে গেল বাথরুমে। সেখানে দেখল টুথ-পেস্ট, টুথ ব্রাশ, সাবান, তোয়ালে সব ঠিক আছে কি না। বেসিন, বাথ-টব, কমোড সব পরিস্কার আছে কি না। শোবার ঘরে ঢুকে পরীক্ষা করে দেখল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটি ঠিক মত চলছে কিনা। তারপর বিছানা দুটো ভাল করে গুছিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। টেবিলের ওপর রাখা ছিল প্লেন থেকে পকেটস্থ করা সিং ও আমার দুটো আপেল। আপেল দুটো দেখিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কি এখান থেকে কিনেছ ?

উত্তরে জানালাম, না, এ দুটো ভারত থেকে এনেছি।

আপেল দুটি হাতে নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ও বলল, কি সুন্দর লাল টক্‌টকে আপেল দুটো।

রসিকতার লোভ সামলাতে পারলাম না, বললাম, ঠিক তোমার দুটো গালের মত।

ও মুচকি হাসল। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আপেল দুটো নেবে ?

ও জানতে চাইল—কত দাম দিতে হবে ?

উত্তরে জানালাম, কিছুই দিতে হবে না।

কিন্তু বিনামূল্যে ও নিতে নারাজ। বললাম, বেশ, কিছু না দিয়ে যখন তুমি কিছু নেবে না, তখন তোমার ঐ গোলাপের পাপড়ির মত অধর পল্লব দুটি একবার আমাকে স্পর্শ করতে দাও।

মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। তারপর কি হল বলার দরকার নেই, তবে বুঝলাম এটাই ও চাইছিল।

আমার একটা বদ অভ্যাস আছে, ঘন ঘন নস্যি নেওয়া। চাই-লাই জিজ্ঞাসা করল, বারবার নাকের ভেতরে ওটা কি পুরছ ?

জানালাম, নস্যি।

ও জানতে চাইল, নস্যি নিলে কি হয় ?

উত্তরে বললাম, মাথা ধরা সেরে যায় এবং মাথা পরিষ্কার হয়।

চাই জানাল যে তার মাথাটা অনেকক্ষণ হল ধরে রয়েছে, সুতরাং তাকে খানিকটা নস্যি দিতে হবে।

এবার আমার সাহস বেড়ে গেছে। তাই আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বেশ খানিকটা নস্যি পুরে দিলাম ওর নাকের ভেতরে। চাই রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে হাঁচতে হাঁচতে আমাকে জড়িয়ে ধরে লুটোপুটি খেতে লাগল বিছানার ওপরে। কি কাণ্ড! কিছুতেই উঠতেই চায় না। যদি সিং এখনি ফিরে এসে সব দেখে ফেলে! তাহলে সে কি ভাববে! তাই জোর করে ওকে বিছানা থেকে তুলে দিলাম।

ও চলে গেল। ভাবলাম, যাক আপদ গেল। ও মা, খানিক বাদেই চাই আর একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে পরিচয় করিয়ে দিল—তার বান্ধবী, নাম লীং পোয়ে। এ তার পরবর্তিনী। আজ সারা রাত এর ডিউটি। তারপর আমাকে ইশারা করল, ওর নাকে খানিকটা নস্যি দেবার জন্য। আমি কোন রকম সংকোচ না করে ওকেও জড়িয়ে ধরে ওর নাকেও পুরে দিলাম খানিকটা নস্যি। ও কোন রকম বাধা দিল না বা রাগ করল না। বরং হাসতে হাসতে এবং হাঁচতে হাঁচতে ঘর ছেড়ে চলে গেল তার কাজে।

লীং পোয়ে চলে যাবার পর চাই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল আমি বেটার-হাফ অর্থাৎ অর্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গে না নিয়ে একা এসেছি কেন?

বললাম, 'পতির পুণ্যে, সতীর পুণ্য, নইলে খরচ বাড়ে'।

ও এর অর্থ জানতে চাইল। ওকে অর্থ বুঝিয়ে দিলাম। ও বিশ্বাস করল না। প্রশ্ন করল, বিদেশে এসে কি একা ঘরে শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনবে?

উত্তরে জানালাম, কেন, ঘরে তো আমার বন্ধুও শোবে।

চাই বিদ্রুপ করে বলল, বোকা, হাঁদা, গঙ্গারাম, বন্ধুকে নিয়ে কি রাত কাটানো যায়! বন্ধুকে নিয়ে চলে গল্পগুজব করা। রাত কাটাতে বা সুখ নিদ্রা দিতে হলে চাই শয্যাসঙ্গিনী।

ওকে বললাম, এখানে শয্যাসঙ্গিনী কোথায় পাব?

উত্তরে ও বলল, ঐ কথা বলে তুমি আমাদের দেশকে অপমান করতে পারে না। প্রয়োজন হলে আমি বা আমার বান্ধবী লীং পোয়ে তো আছি।

হায় রে! ও তো জানে না যে আমার পকেট শূন্য, আমি নিঃসম্বল।

আমাকে নিরুত্তর দেখে চাই অন্য কথা পাড়ল। জানতে চাইল আমাদের আগামী কালের কী প্রোগ্রাম।

আমি জানালাম—ফ্রী-ডে, অর্থাৎ কিনা নিজ নিজ খরচায় যার যেখানে খুশি যেতে পারে।

চাই বলল, ভালই হল। আগামী কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমায় ছুটি। সুতরাং তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সারাদিন আমি তোমাকে নদী পথে সব ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। আমি যেতে রাজী হলাম।

অনেক রাত হয়েছে—বলে চাই উঠে দাঁড়াল এবং বলল, তুমি প্রস্তুত থেকো, আগামী কাল সকাল আটটা-সাড়ে আটটায় আমরা ঘুরতে বেরুব। তারপর বিশৃঙ্খল বিছানাটার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে—'উয়িশ ইউ এ স্লীপ্‌লেস্ নাইট্' অর্থাৎ কামনা করি তোমার রজনী নিদ্রাহীন হোক বলে হাত নেড়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

চাই চলে যাবার পর ডায়েরি লেখা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—পকেটে তো ইঁদুরে ডন্ মারছে এখন কি করা যায়?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার প্রিয় বন্ধু ডাক্তার অজিত ব্যানার্জীর কথা। হাইজিন ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর হিসেবে কিছু দিন আগে ও ব্যাংকক এবং হংকং-এ এসেছিল ওয়ার্লড্ হেল্থ অর্গ্যানিজেশনের (W. H. O.) দুটি কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার জন্য। তারপর কলকাতায় ফিরেছে। তার কাছে ছিল কিছু উদ্বৃত্ত থাই বাট্ (Baht) এবং হংকং ডলার। এখানে আসবার আগে সেগুলি ও আমাকে দিয়ে বলেছিল, কল্যাণদা এগুলি নিয়ে যান, ওখানে কাজে লাগবে। মাভৈঃ। সব সমস্যার সমাধান হল, তাই মনে মনে অজিতকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। এমন সময়ে দরজায় আবার টোকা পড়ল। দরজা খুলে দিতে হাসি মুখে সিং ঘরে ঢুকে জানাল যে সে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং প্রয়োজন হলে আমাকেও কিছু ধার দেবে। মনটা বেশ হাল্কা হল, রাতও অনেক হয়েছে, নিদ্রাদেবী আর চোখ খুলে রাখতে দিচ্ছেন না। পরস্পর পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

* * *

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সিং-এর প্রাতঃকৃত্য সারা হয়ে গেছে, সে পূজায় বসেছে। আমিও প্রাতঃকৃত্য সেরে নিলাম। তারপর ঠিক আটটায় হোটেলের ডাইনিং হলে ছোট-হাজরি সারলাম। যথা—

এক গেলাস আনারসের রস, টোস্ট, মাখন এবং চীজের পাশাপাশি জ্যাম, মার্মালেড, ডিম এবং কফি।

প্রাতরাশ খেয়ে লাউঞ্জে এসে দেখি একটি সোফায় বসে চাই-লাই অপেক্ষা করছে আমার জন্য। একটুও দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে।

আমাদের কলকাতা শহরের মত এখানেও দেখি রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথের ওপরে বসেছে নানান্ রকম জিনিসপত্রের দোকান। ফুল-ফল থেকে শুরু করে তরি-তরকারি, মাছ-মাংস, ডিম-জামা-কাপড়, লাঠি-ছাতা, খেলনা, খাবারের দোকান কি নেই। ফুটপাথের ওপরে বসে থাই এবং চীনা মেয়েরা ফ্রায়িং প্যান-এ করে পাকা কলা এবং পানিফল ভাজছে। দেখি আবালবৃদ্ধবনিতা তাই কিনছে এবং বেশ তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। কয়েক মিনিট হাঁটার পর আমরা এলাম ওরিয়েণ্টাল হোটেলের বারান্দার তলায়।

দু' জায়গা থেকে লঞ্চ ছাড়ে। এখান থেকে এবং ফ্রা-খ্যানোং (Phra-Khanong) ব্রিজের কাছ থেকে। প্রথম স্থানটা আমাদের হোটেলের খুব কাছে, তাই আমরা এখানেই এসেছি।

নদীর ধারে জেটির পাশে খানিকটা খোলা ময়দানের ওপরে রয়েছে টিনের চাল দেওয়া একটা বেশ বড় কাফিখানা। সেখানে বেঞ্চে বসে নিম্নশ্রেণীর লোক খানাপিনা করছে। রুটি, পরটা, ভাত, তরকারি, ডিম, মাছ, মাংস, চা, কফি, বিয়ার ও মদ সবই পাওয়া যায় ওখানে। কাফিখানার শো-কেসের তাকগুলিতে সাজানো রয়েছে ডিম, কাঁকড়া এবং নানান্ জাতীয় পানীয় আর ওয়ার্ডরোবের মত করে তারে ঝোলানো রয়েছে নানান্ জাতীয় মাছ ও মাংস।

কোন্‌টা কিসের মাংস জানতে চাইলাম আমি। চাই-লাই আঙুল দিয়ে একটা একটা করে দেখিয়ে আমাকে চিনিয়ে দিল—শুয়ার, গরু, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, সাপ, ব্যাং, ইঁদুর, বাদুড়, হাঙর প্রভৃতি। বড় বড় গলদা চিংড়ি দেখে নোলায় জল এলো।

জেটির গা ঘেঁষে যেমন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত বিলাসবহুল লঞ্চ, তেমনি সাধারণ লঞ্চের সংখ্যাও নেহাত নগণ্য নয়। চাই একটা বিলাসবহুল লঞ্চে উঠতে যাচ্ছিল, আমি তার হাত ধরে টেনে ওঠালাম একটা সাধারণ লঞ্চে। কারণ পকেটের অবস্থাটা তো বুঝতে হবে। দুজনে বসলাম গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পাশাপাশি। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা। তারই দুটো লাইন প্যারডি করে শোনাচ্ছি—

সকাল বেলার রোদে ভরা আজকে আশ্বিন মাস,
তোমার চোখে দেখলাম আমি, আমার সর্বনাশ।

চাই জানালো আমরা যাচ্ছি চাও ক্র্যায়া নদীর ওপর দিয়ে। বেশ চওড়া এবং গভীর নদী। তবে আমাদের কলকাতার গঙ্গানদীর মত চওড়া বা গভীর নয়। আবার কখনও বা চলেছি সরু সরু নালা বা খালের ভেতর দিয়ে। নদী, নালা এবং খালগুলি দিয়ে চলেছে অসংখ্য যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী জলযান। বড় বড় লঞ্চগুলি চলেছে মূল নদী দিয়ে। বড় লঞ্চের দু'পাশে দুটি গাধাবোট বাঁধা রয়েছে। তাতে বহন করা হচ্ছে ধান, চাল, গম, কাঠ, কয়লা, পাথর, সিমেন্ট, লোহা এবং নানা রকম ভারী যন্ত্রপাতি। আর ছোট ছোট লঞ্চ এবং নৌকায় বহন করা হচ্ছে হাল্কা ধরণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। লোকজনও যাতায়াত করছে এই সব জলযান করে।

নদীর দু'পাড়ে বেশ চওড়া রাস্তা। সেখান দিয়ে চলাচল করছে নানা রকমের যানবাহন। রাস্তার ধারে আধুনিক ধরণের গগনচুম্বী বাড়ি, কল-কারখানা। চাই বলল- ওগুলি সব নতুন তৈরি হয়েছে আমেরিকার পয়সায়। দু-একটা গির্জা এবং মসজিদও চোখে পড়ল।

আর নালা এবং খালের দু'ধারে রয়েছে আমবাগান, কলাবাগান, আনারসের বাগান, সবজিবাগান বা অন্যান্য ক্ষেত-খামার। কোথাও কোথাও বা দেখা যাচ্ছে প্যাগোডা ধরণের সাবেকী দোতলা, তিনতলা কাঠের বাড়ি। বাড়িগুলি উঠেছে একেবারে জলের কিনারা থেকে। প্রত্যেক বাড়ির সামনে বাঁধা রয়েছে একটি ছোট ডিঙ্গি, এপার ওপার বা অন্যত্র কোথাও যাতায়াত করার জন্য। দূর আকাশে মেঘের গায়ে পিরামিডের মত কতকগুলি চূড়ার ছায়া দেখা যাচ্ছে। চাই ঐ চূড়াগুলির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল যে এবার আমরা ওয়াট্ অরুণের কাছাকাছি এসে গেছি।

ওয়াট্ অরুণ (Wat Arun) ইংরেজী নাম—The Monastery of the dawn :—আমরা এসেছি চাও ক্র্যায়া নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত পূর্বতন বা যমজ রাজধানী থন্‌বুরিতে। আজ চাই লাই হয়েছে আমার গাইড। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি ঊষা মন্দির, ওয়াট্ অরুণ বা ওয়াট্ চেঙ্-এর সামনে। এটি একটি স্মৃতিমন্দির, তাই এর ভিতরে কোন দেবতার মূর্তি নেই। মন্দিরটির পাঁচটি বুরুজ বা টাওয়ার আছে। এরা টাওয়ারকে বলে প্র্যাঙ। এগুলিকে বুরুজ না বলে মিনার বলাই ভাল। মন্দিরটি এবং মিনারগুলি সূর্যকিরণে

ঝল্‌মল্‌ করছে। ওগুলির গা থেকে ছিটকে পড়ছে রামধনুর সপ্ত রং। চাই জানালো মন্দিরটি এবং মিনারগুলি নির্মিত হয়েছে ইট, চুন ও বালি দিয়ে। আর মোজেক-এর মত প্লাস্টার করা বাইরের আবরণগুলি হচ্ছে রঙবেরঙের পোর্সিলেন বা চীনামাটির টুকরো।

অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে আমরা মন্দিরের কাছে এলাম। এই মন্দিরের চারপাশে চারটি এবং মাঝখানে একটি সর্বসমেত পাঁচটি মিনার আছে। এই মিনারগুলির মাঝে মাঝে বারান্দার মত চাতাল আছে। এই চাতালগুলি মাথায় করে ধরে আছে কোথাও বা বীভৎস মূর্তির দানবরা আবার কোথাও বা সুন্দরী অপ্সরীরা। চারপাশের মিনার চারটি মাঝখানের মিনারের উচ্চতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। ছোট মিনার চারটির কুলঙ্গিগুলিতে রয়েছে শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে বসা চাঁদামামার নানান্‌ ভঙ্গিমায় মূর্তি।

এবারে উঠছি মাঝখানের বড় মিনারটার ওপরে। কি সরু সরু আর খাড়াই সিঁড়ি। হাঁপিয়ে উঠছি। চাই আমার হাত ধরে আমাকে টেনে তুলছে। এখানকার কুলঙ্গিগুলিতে রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্রের অসংখ্য সবুজ রঙের মূর্তি। তিনি বসে আছেন তিন মাথা বিশিষ্ট হাতী বা এরয়্যানের (Erwan) পিঠের ওপরে। এই মূর্তিগুলি সবই চীনামাটির। প্রত্যেক মিনারের চূড়ায় রয়েছে বাবা ভোলানাথের একটি করে ত্রিশূল। এই সব দেব-দেবীদের মূর্তি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শন দেখে মনে হয় যে এক সময়ে ভারতের সঙ্গে এদের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্ট করে অবশেষে আমরা উঠে এলাম মিনারের শেষ চাতালে। বারান্দার মত চওড়া বেশ সুন্দর চাতাল। হু হু করে হাওয়া বইছে, মনে হচ্ছে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি নদীর পুবপারে অবস্থিত ব্যাংকক শহরটাকে। এর উচ্চতা ২৫০ ফিট্‌ অর্থাৎ আমাদের কলকাতার শহীদ মিনার (১৫২ ফিট), হাইকোর্ট (১৮০ ফিট) এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের (১৮২ ফিট) চূড়াগুলির চেয়ে উঁচু। তবে দিল্লীর কুতব মিনারের উচ্চতা বেশী, অর্থাৎ ২৮৮ ফিট। অবশ্য এর চেয়েও উঁচু চূড়ায় আমি উঠেছি, যেমন, প্যারিসের এফিল টাওয়ারে (৯৮৪½ ফিট্‌) এবং পশ্চিম জার্মানির মিউনিক অলিম্পিক টাওয়ারে (৯৪২½ ফিট্‌)। তবে এ দুটিতে উঠেছি লিফ্‌টে করে। মিনার থেকে নামতে নামতে চাই শোনাল ওয়াট্‌ অরুণের ইতিহাস—

বার্মিজরা অযুথ্যায়া (Ayuthaya) জয় করার পর ১৭৬৭ সালে রাজা তাক্‌সিন্‌ তাঁর রাজধানী সরিয়ে আনেন এই থন্‌বুরিতে। এখানে তিনি আবিষ্কার করেন পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন মন্দির। তিনি মন্দিরটি পুনরুদ্ধার করে নবরূপ দান করেন এবং এর নাম রাখেন ওয়াট্‌ অরুণ। তিনি রাজত্ব করেন ১৭৮২ সাল পর্যন্ত। তারপর রাজা হন প্রথম রামা। তিনি এর কোন রকম সংস্কার করেননি। রাজা দ্বিতীয় রামা (১৮০৯-১৮২৪) এটি পুনঃ সংস্কার করালেন এবং শুরু করলেন এই পাঁচটি মিনার নির্মাণের কাজ। কিন্তু তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করিয়ে যেতে পারলেন না। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করলেন রাজা তৃতীয় রামা (১৮২৪—১৮৫১)।

প্রতি বছর বিরাট বর্ণাঢ্য এক উৎসব হয় এখানে, নাম থা রয়্যাল ক্যাথিন্‌। বহু দূর দূর গ্রাম এবং অন্যান্য শহর থেকে দলে দলে ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী ও বুড়ো-বুড়ীরা বিচিত্র রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসে ঐ উৎসবে। সেই সময়ে এখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা একমাস যাবৎ অনশন পালন করেন। তাঁদের অনশন ভঙ্গের দিন রাজা সপরিবারে তাঁর নিজস্ব সুসজ্জিত বিরাট বজরায় রাজপ্রাসাদ থেকে নদী পথে এখানে আসেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নতুন গেরুয়া রঙের আলখাল্লা বিতরণ করেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য সুসজ্জিত বজরায় করে আসেন তাঁর পারিষদবর্গ।

চাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার সবাই কি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ?

উত্তরে চাই জানাল, না, ৯০ শতাংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আর বাকী ১০ শতাংশ খ্রীষ্ট এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

চাই বলল, এই নদী পথ দিয়ে রাজা-রাজড়ারা যাতায়াত করেন বলে আমরা একে বলি 'মীন্যাম চাও ফ্র্যায়া' (Maenam Chao Phraya) অর্থাৎ রাজা-রাজড়াদের নদী।

ফ্লোটিং মার্কেট ঃ—একটি ছোট ডিঙ্গিতে করে আমরা এলাম ভাসমান বাজারে। ভোর না হতেই ব্যাপারীরা তাদের ডিঙ্গি নৌকায় মালপত্র ভর্তি করে এসে হাজির হয় নদী, নালা এবং খালগুলিতে। বড় বড় নৌকা যে নেই, তা নয়, বড় নৌকাও আছে। এখন বেলা হয়ে গেছে, তাই বাজার বেশ জম্‌-জমাট্‌। কি নেই এই নৌকাগুলিতে। আছে ফল-ফুল, শাক-সব্জী, তরি-তরকারি, মসলাপাতি, ডিম, মাছ, মাংস, চাল, গম, আঁটি বাঁধা জ্বালানী কাঠ, টুকরি ভরা কয়লা, মণিহারি দ্রব্যাদি, জামা-কাপড় জুতা-মোজা, থাই-সিল্ক,

ছাতা-লাঠি, প্রার্থনা চক্র (Prayer Wheel) ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় একে একটি সুপার মার্কেট্‌ বলা চলে। গণৎকার, মাদুলি, কবচ তাও পাবেন। আর বড় বড় নৌকাগুলিতে রয়েছে ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, ডাক্তারখানা ইত্যাদি।

ভাবছেন বার বা রেস্তোরাঁ নেই। না, তাও আছে। ওগুলি আছে বড় বড় নৌকাগুলিতে। খাবার জিনিস, চা, কফি, ঠাণ্ডা-ফলের রস, ঠাণ্ডা-পানীয়, মদ, বীয়ার সবই পাবেন। এমন কী নাচ-গানেরও ব্যবস্থা আছে ওতে। ঐ নৌকাগুলি বেশ সুসজ্জিত। ঐগুলিতে বসবার জন্য গদি আঁটা আরামদায়ক চেয়ারও আছে। কাশ্মীরীদের মত এরাও ডিঙ্গি নিয়ে বাড়ি বাড়ি জিনিসপত্র ফেরি করে বেড়ায়। এখানকার ক্রেতা এবং বিক্রেতার অধিকাংশই মহিলা।

স্নেক্‌ ফার্ম এবং পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট ঃ—এসেছি বিরাট এক ময়দান প্রান্তরে। চারিদিকে ছোট বড় গাছ-পালা, লতা-পাতা, গুল্মের ঝোপ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ের মত ঢিবি। তা বলে জঙ্গল নয় মোটেই। বেশ মনোরম পরিবেশ।

সামনে মস্ত এক অজগর সাপ। পাহাড়ের ঢিবির ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে আরাম করছে। ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটি মেয়ে আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির চারপাশে কিলবিল করে চলে বেড়াচ্ছে কালকেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় প্রভৃতি নানা রকমের বিষধর সাপ। ভাবছেন তাহলে কি করে দাঁড়িয়ে আছি আমরা এবং সাপেরা আমাদের তেড়ে আসছে না কেন ? এর কারণ, সমস্ত ময়দান প্রান্তরটি তারের জাল দিয়ে ঘেরা।

বেড়ার ফটকের কাছ থেকে চাই লী, লী বলে মেয়েটির নাম ধরে ডাকল। লী মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো।

লীর মাথায় শঙ্খচূড় ফণা বিস্তার করে রয়েছে। গলায় চন্দ্রবোড়ার মালা। দুই বাহুতে গোখরোর বাজু। তারা লিক্‌লিকে জিভ দিয়ে লীর গালের রসাস্বাদন করছে। আর কোমরে ময়াল সাপের কটিবন্ধনী। অনুমান করলাম, মেয়েটির বয়স ২৫।২৬-এর বেশি হবে না। সে চীনা না থাই তা বুঝতে পারলাম না। তবে মেয়েটি যে সুন্দরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চাই আমার পরিচয় দিল ভিজিটর বলে। লী করমর্দনের জন্য তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, আমি সভয়ে পিছিয়ে গেলাম। লী অভয় দিল যে এরা কামড়াবে না।

লী দরজা খুলে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। আমরা ভয়ে ভয়ে তার পিছু পিছু চললাম এবং মনে মনে ভাবলাম এ কি নাগকন্যা না শিবানী অর্থাৎ শিবের গৃহিণী। না হলে এ রকম সর্পালঙ্কার পরে আছে কেন? লীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখানে কি কর?

উত্তরে সে জানাল, সে এদের সেবা করে এবং এদের স্বভাব চরিত্র নিয়ে গবেষণা করে।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি ভয়-ডর কিছুই নেই?

ও জানতে চাইল, কিসের ভয়?

বললাম, এদের একটা ছোবলে তো তোমার ইহলীলা সাঙ্গ হবে।

হাসতে হাসতে লী জবাব দিল, যদি ছোবল দেয়, তাহালে একটু ব্যথা পাব, কিন্তু মরব না। গতকাল এদের বিষ বের করে নেওয়া হয়েছে।

তারপর লী জানালো—সাপ দেখলে মানুষ ভয় পায় এবং ওদের সম্বন্ধে মানুষের একটা ভুল ধারণা আছে যে মানুষ দেখলেই সাপ তেড়ে ছোবল মারতে আসে। ওরা অত্যন্ত হিংস্র জীব। আসলে ওরা কিন্তু অতি নিরীহ। তবে দু-এক জাতের সাপের স্বভাব স্বতন্ত্র। অধিকাংশ সাপই মানুষকে ভয় করে। ওরা মানুষ দেখলে লজ্জা পায়। তাই মানুষকে তেড়ে আসা দূরের কথা, ওরা আড়ালে সরে যাবার পথ খোঁজে। মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবার আশঙ্কাতে দিনমানে ওরা জনারণ্যে আসে না। কোন বাড়িতে ইঁদুরের গর্ত না থাকলে পারতপক্ষে সেখানে ওরা ঢোকে না। তাই মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে দিন কাটায়। তবে ওদের আঘাত করলে বা আচম্‌কা ল্যাজে পা পড়লে আর রক্ষে নেই। কেউটে সাপের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। তারা মানুষের ছায়া দেখলে ছোবল মারে। সব দিক দিয়ে সাপের স্বভাব-চরিত্র বিচার করলে ওদের লজ্জাবতী লতা বলা উচিত। মনে মনে ভাবলাম তাই বোধ হয় আমাদের দেশ-পাড়াগাঁয়ের লোকেরা বিশেষণটা বাদ দিয়ে সাপকে খালি লতা বলে।

লী বলল, চলুন, এবার একটা ঢিবির কাছে যাই। ভয়ে ভয়ে ওর পিছু পিছু একটা ঢিবির কাছে গিয়ে দেখি সেখানে রয়েছে বেশ বড়-সড় একটা গহ্বর। গহ্বরের মধ্যে ইট, পাথর, গাছপালা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ছোট একটি পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্ত। গর্তের ভেতর কিল্‌বিল্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিষধর সাপ। লী জানালো যে এই রকম পিট বা গহ্বর অনেকগুলি আছে এবং বিভিন্ন পিটে রয়েছে বিভিন্ন জাতের সাপ।

লীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কত রকম জাতের সাপ আছে এখানে?

উত্তরে সে জানালো, বিভিন্ন দেশ থেকে আনা প্রায় হাজার রকমের বিষধর সাপ তো হবেই।

লীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কথা কি সত্যি যে সাপের বিষ নিষ্কাশনের আগে সাপকে উপবাসী রাখা হয়?

উত্তরে লী জানালো, সত্যি। সাপকে ৩।৪ দিন অনাহারে রেখে তবে তার বিষ নিষ্কাশন করা হয়।

এরপর লী আমাদের নিয়ে এলো একটি বাড়িতে। তার বারান্দায় সারি সারি কাঁচের খাঁচা। খাঁচাগুলির ভিতরে রয়েছে নানান্ জাতের সাপের বাচ্চা। তারপর তিনটি ঘর দেখাল। একটি ঘর বড় বড় ইঁদুরে ভরা। আর দুটি ঘরে রয়েছে ব্যাঙ এবং মুরগী। এগুলি সাপের খাদ্য। সবশেষে এলাম পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে। এখানে একটি ঘরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তরল বিষকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা হচ্ছে দেশ-বিদেশে রপ্তানি করার জন্য। আর অন্যান্য ঘরে গরল থেকে তৈরি হচ্ছে নানা প্রকার মৃতসঞ্জীবনী ওষুধ।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। লীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। চাইকে বললাম খিদেয় পেট জ্বলছে, এবার এর আহুতির একটা ব্যবস্থা কর।

পকেটের অবস্থার দরুণ খেতে ঢুকলাম সাধারণ একটা রেস্তোঁরাতে। এখানেও দেখি তারে ঝোলানো রয়েছে নানান্ প্রাণীর মাংস। আর শো-কেসে সাজানো রয়েছে নানান্ জাতের মাছ। সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বাদুড় প্রভৃতি দেখে আর মাংস খাবার প্রবৃত্তি হল না। খুঁজলাম কম পয়সার খাবার—খেলাম ভাত, বীট, গাজর ও কড়াইশুঁটির তরকারি, কুচোচিংড়ির টক-মিষ্টি কারি। শো-কেসে মস্তকবিহীন গলদা চিংড়ি দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই তাও একটা নিলাম। আর শেষ পাতে নিলাম একফালি পেঁপে। কফি তো আছেই। এবার খাদ্যগুলির একটু বর্ণনা দিই—ভাত বেশ গায়ে-গতরে। তরকারি অখাদ্য। কুচোচিংড়ির কারি মন্দ নয়। তবে বেশ সুস্বাদু লাগল এই গলদা চিংড়িটি। একটা প্লেটে করে খোলা শুদ্ধ মস্তকবিহীন একটা বড় গলদা চিংড়ি দিয়ে গেল। ছুরি দিয়ে চিংড়ির পেটটা চিরতে বেরিয়ে এলো পেস্তা, বাদাম ও কিসমিস মিশ্রিত মাংসের কিমার পুর। ওতে চিলি সস্ মিশিয়ে খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেলাম। দুজনের খেতে লাগল ১০০ বাট (Baht) বা ৫ মার্কিনী ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় ৪৫ টাকা। কেবলমাত্র চিংড়ি দুটোর

জন্যই নিল ৪০ বাট বা ১৮ টাকা। আহারান্তে আবার লঞ্চে চেপে চললাম গোলাপ বাগান দেখতে।

গোলাপ বাগান ঃ—ব্যাংককের ২০ মাইল দক্ষিণে এই গোলাপ বাগান। সামনেই ট্রাঙ্ক রোড। দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে যাবার প্রধান সড়ক। এই বাগানটাকে বেষ্টন করে রেখেছে ন্যাখোন চাইশ্রী (Nakhon Chaisri) নদী। এই বাগানটা গড়ে উঠেছে ৫২ একর জমির ওপরে। এটা একটা বেসরকারী সম্পত্তি। এই বাগানে প্রায় ২০০০০ গোলাপ চারা আছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত এই চারাগুলি বেশ সুপরিকল্পিত ভাবে বসানো হয়েছে। বিভিন্ন রঙের গোলাপে বাগান আলোকিত এবং সৌরভে ভরপুর। এর মধ্যে দু'রঙা ও মিশ্র রঙেরও অনেক গোলাপ রয়েছে। চাই একটা গোলাপের তোড়া কিনে আমাকে উপহার দিল। আমিও একটা সাদা, একটা হলদে, একটা গোলাপী এবং একটা টকটকে লাল গোলাপ কিনে ওর মাথার চুলে গুঁজে দিয়ে ওকে বললাম, এর অর্থ জানো? চাই উত্তর দিল, না। তখন আমি ওকে এই চারটি রঙের অর্থ ব্যাখ্যা করলাম। জানালাম—সাদা গোলাপ হচ্ছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রতীক, হলদে গোলাপ স্নেহ ও প্রীতির, গোলাপী গোলাপ অনুরাগের এবং লাল গোলাপ হচ্ছে প্রেম ও ভালবাসার প্রতীক। তারপর ওর গালটা আলতো করে টিপে দিয়ে ওকে একটা গান শোনালাম এবং তার ব্যাখ্যাও শোনালাম :—

"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে, তোমার রাঙা কপোলখানি,
ভ্রমরা সম গুনগুনিয়ে, শুনিয়ে যাব প্রেমের বাণী"।

এই বাগানের চত্বরের মধ্যে অনেকগুলি জাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মণ্ডপ আছে। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টায় এবং রাত ন'টায় দুবার করে অনুষ্ঠান হয়। এই মণ্ডপগুলির কোনটাতে অভিনয়, কোনটাতে পাশ্চাত্য ধরনের নাচ-গান, কোনটাতে আধুনিক, কোনটাতে এদের প্রাচীন নাচ-গান হয়। আবার কোনটাতে পল্লী অঞ্চলের নানা রকম উৎসবাদির নাচ-গানও হয়। তাছাড়া তরোয়াল খেলা, কুস্তি এবং মুষ্টিযুদ্ধের মণ্ডপও আছে। এদের মুষ্টিযুদ্ধে হাত এবং পা দুই ব্যবহার করা চলে। একটা মণ্ডপে দেখি মেয়েরা তাঁতে সিল্কের কাপড় বুনছে। আর একটা মণ্ডপে মেয়েরা বাঁশের রঙীন ছাতা তৈরি করছে এবং ছাতার আচ্ছাদনটি রং ও তুলি দিয়ে চিত্রিত করছে। অদূরে আরেকটা মণ্ডপে দেখি বেশ ভিড় জমেছে। গেলাম সেই মণ্ডপে। দেখি মোরগের লড়াই হচ্ছে। দু'পক্ষের মালিকই বাজি রেখেছে। বাজি ধরেছে দর্শকরাও।

মোরগ দুটোর পায়ে বাঁধা দুটো ধারালো ছুরি। প্রথমে মোরগ দুটো গলা ফুলিয়ে রাগে ফুঁসতে লাগল। তারপর একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আর একটার ঘাড়ে। চলল ঠোকরা-ঠুকরি, শেষে একটা অন্যটার পেটে বিঁধিয়ে দিল তার পায়ে বাঁধা সেই ধারালো ছুরিটা। খেল্ খতম।

চাই বলল, এটা আমাদের দেশের একটা জনপ্রিয় জুয়াখেলা।

বাগানের আশপাশ দিয়ে অনেকগুলি খাল বয়ে চলেছে। আমরা নদীর ধার ধরে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কাঠের তৈরি সবুজ রঙের প্যাগোডার মত বিরাট একটা দোতলা মণ্ডপ দেখলাম।

চাই জানাল, এটি পিকিং-এর প্রাচীন একটি মণ্ডপের প্রতিরূপ। এর ভেতরে দেখলাম প্রাচীন চীনের দুষ্প্রাপ্য ললিতকলার বহু নিদর্শন ও বহু প্রাচীন আসবাবপত্র। ওখান থেকে বেরিয়ে চাই বলল, এখন চা পানের সময় হয়েছে। চল একটা রেস্তোঁরাতে চায়ের তৃষ্ণা দূর করে রওনা হব। চাই-এর খরচায় স্যাণ্ডউইচ ও বিস্কুট সহযোগে চা পান করে গেলাম মৃৎশিল্পের জাদুঘরে।

পটারি মিউজিয়ামঃ মৃৎশিল্প বলতে অবশ্য আমি চীনামাটির কথা বলছি। দুখানা ঘর নিয়ে এই যাদুঘর। এই শিল্পে এদের হাতেখড়ি ঘেঙ্গিস খাঁর কাছে। প্রথমে দেখলাম ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, থালা, বাটি, গেলাস, চায়ের কেটলি, কাপ-ডিশ, ফুলদানি ইত্যাদি। তারপর দেখলাম অষ্টাদশ শতাব্দী এবং আধুনিক যুগের হাতী, ঘোড়া, উট, বাঘ, সিংহ, নানারকম সব পাখি, পুতুল এবং আধুনিক যুগের খেলনা। যেমন, ঠেলাগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রেলগাড়ি মোটরগাড়ি প্রভৃতি। সবশেষে দেখলাম ছোট-বড় নানান্ রকমের মূর্তি আর বিখ্যাত লোকদের বড় বড় প্রতিমূর্তি।

ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরছি, চাই জিজ্ঞাসা করল, 'ব্রিজ্ অন্ দ্য রিভার কোয়াই' ছবিটা দেখেছ?

জানালাম, নিশ্চই দেখেছি।

চাই বলল, তাহলে আগামীকাল চল কাঞ্চনবুরিতে যাওয়া যাক। সেখানে গেলে স্বচক্ষে দেখতে পাবে দুর্দান্ত নদীর ওপর সেই কুখ্যাত সেতুটাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাঞ্চনবুরি ব্যাংকক শহর থেকে কত দূর? আর ঐ সেতুটির আগে তুমি 'কুখ্যাত' বিশেষণটি প্রয়োগ করলে কেন?

উত্তরে চাই জানাল, ব্যাংকক্ শহরের ১৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে এই কাঞ্চনবুরি শহর। ট্রেনে করে যেতে সময় লাগে মাত্র আড়াই ঘণ্টা।

আর ওই সেতুটিকে কুখ্যাত বলা হয় তার কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে বার্মার সীমান্ত পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় জাপানীরা। কিন্তু বাদ সাধল দুর্দান্ত কোয়াই নদী। তার ওপরে সেতু নির্মাণ করা অসম্ভব। তবে এই কাঞ্চনবুরির কাছে নদী কিছুটা অপ্রশস্ত এবং শান্ত। তাই তারা কাঞ্চনবুরির কাছেই সেতু নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিল। এই সেতু নির্মাণ এবং রেল লাইন বসানোর কাজ করানো হল ব্রিটিশ এবং মার্কিনী যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে। এতে প্রায় ন-হাজার যুদ্ধবন্দী প্রাণ হারায়। তাই ঐ রেলপথটিকে বলা হয় 'মরণ পথ' আর সেতুটির আগে 'কুখ্যাত' বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়। ওখানে দুটি গোরস্থান আছে। সেখানে ঐ যুদ্ধবন্দীদের মৃতদেহগুলি কবর দেওয়া হয়েছে।

পকেট তো ঢুঁ ঢুঁ করছে। অজিত ডাক্তারের দেওয়া সব 'বাট্ই' তো খরচা হয়ে গেছে। সম্বল মাত্র সাতটি মার্কিনী ডলার আর গোটা পাঁচেক হংকং ডলার। এর মধ্যে পাঁচটা মার্কিনী ডলার দিতে হবে টারমিন্যাল ট্যাক্সের জন্য। নিজস্ব বলতে থাকবে মাত্র দুটো মার্কিনী আর পাঁচটা হংকং ডলার। সে কথা চাইকে জানালাম না, বললাম, আগামীকাল সকালে আমরা চলে যাচ্ছি, তাই অত দূরে যাওয়া ঠিক হবে না।

ওরিয়েন্টাল হোটেলের কাছের জেটিতে যখন আমরা লঞ্চ থেকে নামলাম, তখন দিবাকর চতুর্দিকে তাঁর লাল আভা ছড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছেন। ফুটপাথের দোকানপাটগুলি এখন বেশ জমজমাট। আমরা সাধারণত ঠাট্টার ছলে বন্ধুবান্ধবদের বলি 'কচুপোড়া খাও' বা 'কলাপোড়া খাও'। এরা দেখি মহিলা দোকানীদের ফ্রাই-প্যানের চারিদিকে উবু হয়ে বসে সত্যি সত্যিই বেশ তারিয়ে তারিয়ে কলাভাজা খাচ্ছে। হোটেলে ফিরতে হোটেলের কাকু ঘড়িটার কোকিল দুটো কু কু করে জানিয়ে দিল যে এখন সন্ধ্যা সাতটা।

ঠিক আটটায় আমাদের হোটেলের ডাইনিং হলেই নৈশভোজে বসলাম। খেতে দিল টোম্যাটো স্যুপ, পাঁউরুটি, মাখন, চিকেন-ফ্রায়েড-রাইস, গ্রীন-পীজ, চিকেন্-গ্রীল, কাস্টার্ড-পুডিং এবং কফি। খেতে খেতে সিং আমাকে অনুরোধ করল, খাবার পর তার সঙ্গে কোন নাইট ক্লাবে যাবার জন্য। ওকে পকেট উল্টে দেখিয়ে জানালাম যে আমি কপর্দকহীন। ও বলল, কুছ পরোয়া নেহি, হাম দেঙ্গে। ওর কাছে কিছু ধার চাইলাম। ও ধার দিতে সম্মত হল না, তবে

আমার সব খরচ বহন করতে ও রাজী। ওকে বললাম, এই বয়সে নাইট-ক্লাবে গেলে লোকে বলবে কী। তাছাড়া প্যারিসে এবং জার্মানীতে আমি নাইট ক্লাবে গিয়েছি। তার চেয়ে চল, এখানকার কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে আসি।

সিং রাজী হল, আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা ঢুকলাম কম দামের সাধারণ এক প্রেক্ষাগৃহে। থাই অ্যাণ্ড ভিলা ফ্লোরাতে। মাথাপিছু প্রবেশ মূল্য ৮০ বাট বা ৪ মার্কিনী ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় ৩৬ টাকা। অনুষ্ঠান শুরু হতে তখনও ১০ মিনিট বাকী।

বেশ মনোরম পরিবেশ। লতাপাতা ঝোপঝাড়ে চারিদিক ঘেরা। মনে হচ্ছে যেন কুঞ্জবনে বসে আছি। ঝোপঝাড় এবং লতাপাতায় জ্বলছে লাল, নীল, সবুজ, হলদে, সাদা টুনি বাল্‌ব।

যথা সময়ে অডিটোরিয়ামের আলো নিষ্প্রভ হয়ে উজ্জ্বল হল মঞ্চের আলো। মাইকে থাই ভাষায় কি ঘোষণা করল ঠিক বুঝলাম না। আমার পাশের এক ভদ্রমহিলা আমাকে জানালেন, যে এখুনি নাচ শুরু হবে। মাইকে সেই কথা ঘোষণা করল।

প্রথমেই হল ফিঙ্গার-নেল্‌-ডান্স। মঞ্চে উপস্থিত হল সুন্দরী তন্বী এক তরুণী। তার অঙ্গে গাঢ় নীল রঙের জাতীয় পোশাক। তাতে জরি, চুমকি ও পুঁথির কাজ করা। কোমরে গাঢ় হলদে রঙের কোমর-বন্ধনী। মাথার খোঁপায় ঝুলছে সাদা ফুলের টাসেল, টাসেলের মাঝে মাঝে গোঁজা হয়েছে হলদে গোলাপ, আর টাসেলের নীচে ঝুলছে দুটো লাল গোলাপ। তীব্র আলো এসে পড়ল তরুণীটির হাতের দুটি কবজি এবং মুখের ওপর। ঝিলমিলিয়ে উঠল ওর হাতের নখগুলো। সেগুলো তীরের ফলার মত ছুঁচালো এবং নানান্‌ রঙে রং করা। প্রতিটি নখ প্রায় দু'ইঞ্চির মত হবে। তরুণীটি নাচতে নাচতে হাতের আঙুল ও নখগুলি দিয়ে কি একটা মুদ্রা করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাইকে আবার কি ঘোষণা হল। পাশের ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, এই মুদ্রাটি করে তরুণীটি আমাদের দেশের পক্ষ থেকে সকল দর্শককে জানাচ্ছে আমাদের সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা।

এরপর তরুণীটি নাচতে নাচতে আঙুল এবং নখের নানা রকম মুদ্রা ও ভঙ্গিমা দেখাল। দ্রুততালে নাচের সঙ্গে আঙুল ও নখের দ্রুত কম্পনে যেন ঝড় বইয়ে দিল। মনে হচ্ছে যেন প্রলয় ঘনিয়ে আসছে, ভূমিকম্প

হচ্ছে। তীব্র আলোতে নখগুলি থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি।

এরপর ব্যাম্বু-ড্যান্স অর্থাৎ বাঁশের ওপর ভারসাম্য বজায় রাখার নাচ। এটি উত্তর-পূর্ব থাইল্যাণ্ডের লোকনৃত্য। এই নাচের উৎপত্তি ফিলিপাইনে। মঞ্চের ওপরে এক সারিতে দুটো করে বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে যোগচিহ্নের মত (#) করে পাতা হয়েছে। বাঁশের প্রান্তগুলি রাখা হয়েছে চারটে কাঠের খুরোর ওপরে। এই বাঁশের প্রান্তগুলি খুরোর ওপরে চেপে ধরে বসে আছে চারজন লোক। যুবক যুবতীরা বিচিত্র রঙের সাজ-পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিজেদের ভারসাম্য বজায় রেখে বাঁশের ওপরে নাচতে শুরু করল। কি ছেলে, কি মেয়ে প্রত্যেকের কোমরে রয়েছে বিভিন্ন রঙের সব কোমর-বন্ধ। আর কপালে বাঁধা রয়েছে বিভিন্ন রঙের রেশমী ফিতা। রঙবেরঙের তীব্র আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে তাদের দেহের ওপর দিয়ে। নাচের তালে তালে ওদের রেশমের পোশাকগুলি হাওয়ায় উড়ছে, আর তার ওপরে রঙীন আলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন প্রজাপতিরা পাখনা মেলে উড়ছে। এই রকম কয়েকটা নাচের পর বাঁশের তৈরি যোগচিহ্নটা ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে থেকে দুটো বাঁশ নিয়ে সে দুটোকে বাঁকিয়ে তৈরি করা হল একটা সাঁকো। এই সাঁকোর ওপর দিয়ে ছেলে মেয়েরা নাচতে নাচতে যাতায়াত শুরু করল। মেয়েরা কেউ কলসী মাথায় নিয়ে চলেছে, কেউ বা মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে ফল-ফুল তরি-তরকারির ঝুড়ি, ছেলেরা পণ্য সামগ্রী ভরা বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে। সাইকেলে চেপেও ছেলে মেয়েরা যাতায়াত করছে। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। ছেলে-মেয়েরা সবাই চলল ছাতা মাথায় দিয়ে। এ যেন সার্কাসে ব্যাল্যান্স বা ভারসাম্যের খেলা।

মঞ্চের আলো নিভে গেল। সেখানে টেনে দেওয়া হল একটা কালো পর্দা। জ্বলে উঠল অডিটোরিয়ামের আলোগুলি। কিছুক্ষণের বিরতি। সিং বলল, বেশ নেশা জমেছে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বোস তোমার ? কি করে না বলি, না বললে যে মিথ্যা কথা বলা হয়। ওয়েট্রেস্ ট্রেতে করে ড্রিঙ্কস্ ও স্ন্যাক্স্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিং ওয়েট্রেস্‌কে ডাকল, আমি বাধা দিলাম। ও আমার কথা শুনল না। সিং আর এক পাত্র করে হুয়িস্কি আর সেই সঙ্গে কিছু কাজু বাদাম ও আপেল নিল।

আমার পাশের ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছিলাম, আসলে তিনি তা নন। ক্রমশ তার স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। আমার পায়ের

সঙ্গে পা ঘষাঘষি করছেন। এতক্ষণ তার একটি হাত ছিল আমার উরুর ওপর, আলো জ্বলতে সেটা সরিয়ে নিয়েছেন। হলের আলো নিভে গেল। আবার নাচ শুরু হল। ভদ্রমহিলা হাতটা আবার আমার উরুর ওপর রাখলেন।

এরপর **যোয়ে ডান্স (Yoey Dance) :**—এটা হচ্ছে মধ্য থাইল্যাণ্ডের আধুনিক রাগ-অনুরাগের ছিনালি নৃত্য। ছেলেদের সকলেরই পরণে প্যাণ্ট, তবে গায়ের জামা আলাদা। বুশ শার্ট, টিশার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি। মেয়েদের কারো পরণে স্কার্ট কারো বা লুঙ্গী। এদেরও গায়ের জামা আলাদা। যেমন—ব্লাউজ, কার্ডিগ্যান ইত্যাদি। আবার কেউ বা পরেছে কোমর অবধি লম্বা এক রকম পাঞ্জাবি। ছেলেদের প্রত্যেকের কাঁধে ঝুলছে বিভিন্ন রঙের চাদর। নাচ হচ্ছে যুগলে যুগলে। কখনো জড়াজড়ি, কখনো চুমো খাওয়া-খাওয়ি, আবার কখনো বা হলাহলি, ঢলাঢলি। আবার কখনো বীতরাগ হয়ে একজন আর একজনের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শেষে সকলে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে নাচ শুরু করল। এটা হচ্ছে এদের বিয়ের আগে মন জানাজানির নাচ।

সেরঙ্গ ক্রাতিপ-ডান্স (Serng Kratip Dance) : এটি হচ্ছে উত্তর-পূর্ব থাইল্যাণ্ডের লোককাহিনীর একটা প্রতীক নৃত্য। ধীরে ধীরে মঞ্চের কালো পর্দাটা সরে গেল। দৃশ্য সাজানো হয়েছে—একপাশে চাষীরা ক্ষেতে কাজ করছে, অপর পাশে গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট সব কুঁড়েঘর। মেয়েরা গৃহস্থালি কাজকর্মে ব্যস্ত। হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। মেয়েরা সবাই ব্যস্ত হয়ে বাঁশের ঝুড়িতে খাবার ভরে সেই ঝুড়িগুলি নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে চলল ক্ষেতের দিকে। দূর থেকে মেয়েদের আসতে দেখে মজুররাও কাজ-কর্ম স্থগিত রেখে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল আহার গ্রহণ করতে। আহারান্তে মেয়ে পুরুষ উভয়ে মিলে কিছুক্ষণ নাচ-গান হল। তারপর মেয়েরা চলে গেল গৃহাভিমুখে আর ছেলেরা গেল ক্ষেতের কাজে। দিনান্তে ক্ষেত-খামারের কাজ সেরে পুরুষরা নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ঘরে ফিরতে লাগল। আর মেয়েরাও নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে এগিয়ে এলো তাদের নিজ নিজ প্রিয়জনদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

শেষ অনুষ্ঠান—মুখোশ নৃত্য। এতে শিল্পীরা মুখোশ পরে নাচ-গানের মাধ্যমে দেখাল আমাদের রামায়ণের বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য। যেমন : রামের রাজ্যাভিষেক,

রাম-সীতার বনবাস, সীতাহরণ, বালী বধ, অশোক বনে সীতা, হনুমানের লঙ্কা দহন এবং শেষে সীতা উদ্ধার।

রাত বারোটায় অনুষ্ঠান শেষ হল। রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ জনশূন্য। মাত্র কয়েকজন নিশাচর নিশাচরী পথ চলছে। রাস্তায় বেরিয়ে ফুরফুরে হওয়ায় মনে বেশ পুলক জাগল তবে মাথা এবং পা দুই টলছে। এত রাতে দুটো হুলো বেড়ালকে সঙ্গিনীবিহীন অবস্থায় টলতে টলতে যেতে দেখে জুটল এক দালাল। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন ?

উত্তর দিলাম, হোটেল পেনিনসুলায়।

তখন দালালটি আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল অন্য কোথাও যাবেন না ? বা শয্যাসঙ্গিনীর প্রয়োজন হবে না ?

সিং এক ধমক দিল। দালালটি ধমক খেয়ে পালাল।

ঘরে প্রবেশ করলাম রাত সাড়ে বারোটায়। রিসেপশনিস্ট ঘরের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা চালিয়ে দিয়ে গেছে, তাই ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে পরস্পর পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে শুয়ে পড়লাম। নিদ্রাদেবীর সাধ্য সাধনা করতে হল না, তিনি নিজেই এসে হাজির হলেন।

সূর্যিমামার উদয়ের অনেক আগেই নিদ্রাদেবী বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু শয্যারাণী সকাল সাতটার আগে কিছুতেই বিছানা ছাড়তে দিল না। তড়িঘড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে সিং এবং আমি দুজনে ঠিক আটটায় গিয়ে ঢুকলাম ডাইনিং হলে। আটটার মধ্যে সকলেই সেখানে এসে হাজির। ছোট-হাজরি—সেই যথা পূর্বং তথা পরম্। অর্থাৎ সেই ফলের রস, টোস্ট, মাখন, চীজ, ডিম, জ্যাম, জেলি এবং চা কিংবা কফি।

খাবার টেবিলে সিং জিজ্ঞাসা করল আমাকে, বোস, এদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা জন্মাল ?

বললাম, আমার ধারণা এরা মঙ্গোলিয়ান বংশোদ্ভূত। এদের ধমনীতে মঙ্গোলিয়ান রক্ত প্রবাহিত, তাই এদের শরীর পীতবর্ণ। এরা কর্মঠ, সদালাপী, কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রাণোচ্ছল। এদের সরল শিশুর মত সদাহাস্যময় মধুর মুখ আমাকে অভিভূত করেছে।

সিং বলে উঠল, থাইল্যাণ্ডের আর এক নাম হচ্ছে 'হাসির দেশ' Land of Smiles) তা জানো ?

এবার আমি সিংকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, এখানে দেখলাম চীনারাই তো সব বড় বড় ব্যবসার অংশীদার। তবুও এদের এই স্বচ্ছলতা এবং প্রাণোচ্ছলতা এলো কি করে ?

সিং জানালো, এর অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য এরা নিজেরাই করে, দ্বিতীয়ত, চীনাদের ব্যবসায় এবং সরকারী অফিসে এরাই কাজ করে। এদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। এদেশে চাষবাস বেশ ভালই হয়, আর মাছের কোন অভাব নেই। তাছাড়া আসল কারণটি হচ্ছে এরা কখনও কোন বৃহৎ শক্তির উপনিবেশে পরিণত হয়নি। তাই এদের ভাত-কাপড়ের কোন অভাব নেই। আর সেইজন্যেই এদের এই প্রণোচ্ছলতা।

জিনিসপত্র গোছগাছ করার জন্যে ঘরে ফিরতেই দেখি ঘরের সামনে কাউণ্টারে চাই বসে আছে। ওকে সুপ্রভাত জানালাম। ঘরে বসে সুটকেস গোছাচ্ছি। চাই এসে হাজির হল। আমাকে সরিয়ে দিয়ে সে নিজেই আমার সুটকেস গোছাতে বসল। সুটকেস গোছাতে গোছাতে ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল, দেশে ফিরে আমি ওকে মনে রাখব কি না ?

উত্তর দিলাম, না রাখাটাই তো স্বাভাবিক।

ওর মুখের হাসি নিভে গেল, ও ব্যথিত হল। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে ওর দু'গালে দুটো চুম্বন দিলাম। আর বললাম, মনে রাখব, রাখব, রাখব।

হাসতে হাসতে খুশি মনে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমাদের ফ্লাইট নাম্বার এ, আই (Air India) ৩০৬। প্লেন ছাড়বে দুপুর একটায়। কিন্তু আমাদের হোটেলের চেক আপ সময় হচ্ছে বেলা বারোটায়। তার মধ্যে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তাই বেলা সাড়ে এগারোটায় আমরা হোটেল ছেড়ে মিনিবাসে রওনা হলাম বিমানবন্দরের দিকে। চাই বিষণ্ণ মনে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো। আমিও 'হে বন্ধু বিদায়' বলে হাত নাড়লাম।

আমাদের সুটকেসগুলো ওজন করিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টারে জমা দিয়ে, কাস্টমস্ চেকিং ও দেহ-তল্লাশীর পর আমরা ঈগল পাখির উদরস্থ হলাম। ভীষণ গর্জন করে ঠিক বেলা একটায় ঈগল পাখি আমাদের নিয়ে আকাশে উড়ল।

নিমেষের মধ্যে আমরা উঠে এলাম ৩০।৪০ হাজার ফিট ওপরে। মাইকে ঘোষণা করা হল আমাদের ঘড়ির কাঁটা ব্যাংকক সময়ের চেয়ে আরও দু-ঘণ্টা এগিয়ে দিয়ে হংকং এবং টোকিওর সময় করে নিতে। এখন ভারতীয় সময়ের চেয়ে আমরা সাড়ে তিন ঘণ্টা এগিয়ে রইলাম। অর্থাৎ ভারতীয় সময় যখন বারোটা তখন হংকং বা টোকিও সময় হচ্ছে সাড়ে তিনটে। আবেগে আমার মুখ দিয়ে একটা কবিতা বেরিয়ে গেল—

চাই মোরে বাঁধিল না,
থাই মোরে ছাড়ি দিল পথ
রুধিল না সমুদ্র পর্বত ॥

আমরা উত্তর থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম পার হয়ে এখন উড়ে চলেছি দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর দিয়ে।

আমাদের বড়-হাজরির সময় হয়েছে, তাই মেনু কার্ড হাতে এসে হাজির হল বিমান সেবিকা। তাকে ফরমাস করলাম চিকেন স্যুপ, পাঁউরুটি, চীজ, পীজ (Pease) পোলাও, ফিশ ফ্রাই, গ্রেভি চিকেন, রসমালাই এবং কফি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ট্রেতে করে খাবার এলো। ট্রেতে খাবার ছাড়াও একটা পলিথিনের প্যাকেটে রয়েছে ছুরি, কাঁটা এবং চামচ। আর তিনটে রাংতার মোড়কে রয়েছে নুন, মরিচগুঁড়ো ও চিনি।

হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হল—আমাদের প্লেনের কিঞ্চিৎ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আজ রাতটা আমরা হংকংএ কাটাব এবং আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় আবার প্লেন ছাড়বে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন এয়ারপোর্ট থেকে ট্রানজিট কার্ড নিয়ে, বাইরে অপেক্ষমান আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়ার বাসে গিয়ে বসেন। আমাদের বাস আপনাদের হোটেলে নিয়ে যাবে ও সেখানে আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দেবে। এবং আগামী কাল সকাল ছ'টায় আবার ঐ বাসই আপনাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে আসবে। দয়া করে কেউ যেন ঐ ট্রানজিট কার্ডটা হারাবেন না, তাহলে তাঁকে এয়ারপোর্টের টারমিন্যাল ভবনে ঢুকতে দেবে না এবং প্লেনেও চড়তে দেবে না।

কিছুক্ষণ পরে আবার মাইকে ঘোষণা করা হল আপনারা যে যার কোমরে সিট বেল্ট বেঁধে নিন, শীঘ্রই আমরা হংকং-এর কাই-ট্যাক (Kai-Tak) বিমান বন্দরে অবতরণ করব। ঘোষণার পর পাঁচ-সাত মিনিট যেতে না যেতেই আমাদের ঈগল পাখি ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। নীচের

দিকে তাকিয়ে দেখি খালি জল আর জল। তার মাঝে গিরিমালা বেষ্টিত ছোট একফালি সমতল ভূমি মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ সমতল ভূমিটি হচ্ছে বিমানবন্দর। ভয়ে বুক কাঁপছে, বৈমানিক একটু অসতর্ক হলেই হয় গিরি-চূড়ার সঙ্গে সংঘর্ষ আর না হয় সমুদ্রগর্ভে পতন।

ব্যাংকক থেকে হংকং ১৮৪৪ কিঃ মিঃ। এই পথ আসতে আমাদের সময় লাগল মাত্র আড়াই ঘণ্টা। এখন ব্যাংকক সময় বেলা সাড়ে তিনটে কিন্তু হংকং এবং টোকিওর টাইম বিকাল সাড়ে পাঁচটা।

এখানে কোন কাস্টমস্ চেকিং হল না, কারণ আমাদের স্যুটকেস্গুলি সব বিমানেই রয়ে গেছে। আমরা হাত ব্যাগ আর ট্রান্জিট্ কার্ড নিয়ে বেরিয়ে এসে উঠলাম এয়ার ইণ্ডিয়ার অপেক্ষমান বাসে। আমরা যখন বাস থেকে পাঁচ-তারা-যুক্ত ইণ্টারন্যাশন্যাল হোটেল হলিডে ইনস্-এ নামলাম তখন সন্ধ্যে সাতটা। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

এখানেও আটতলায় সিং এবং আমি এক ঘরে আছি। ঘরটি বেশ বড়, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং আধুনিক আসবাব-পত্রে সজ্জিত। উপরন্তু টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশন্ সেট রয়েছে। ঘরের সংলগ্ন টয়লেট রুম। একটু বিশ্রাম নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে রাত সাড়ে আটটায় আমরা মিলিত হলাম একতলার ডাইনিং হলে।

বেশ সুসজ্জিত বিরাট ডাইনিং হলটি। লোক গিজগিজ করছে। প্রায় ১০০ ১৫০ জন আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছি। হলের আলো স্তিমিত এবং পাশ্চাত্য সুরে বাজনা বাজছে।

একটা টেবিল ঘিরে চারটি করে চেয়ার পাতা। সিং, সাহাদা, মুখার্জীদা এবং আমি—এই চারজনে বসেছি একটা টেবিলে। আমরা তিনজন আমিষভোজী, কিন্তু সিং নিরামিষাশী। আজ থাকা ও খাওয়া সব এয়ার ইণ্ডিয়ার খরচায়। সুতরাং যার যা ইচ্ছা খেয়ে নাও।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়েটার টেবিলের ওপর চারটে গেলাস রেখে জিজ্ঞাসা করল কাকে কি দেবে। ওরা তিনজন নিল হুইস্কি আর আমি নিলাম ব্রাণ্ডি। এবার ওয়েটার খাবারের অর্ডার নিল। আমি ফরমাস করলাম—চিকেন্ এগকর্ণ স্যুপ, পাঁউরুটি, চীজ, গ্রীন্ পীজ, ফিশ ফ্রাই, চিলি চিকেন, চকলেট ও গ্রীন ম্যাঙ্গো আইসক্রীম। কফি আর খেলাম না নেশা ছুটে যাবার ভয়ে।

বিপদ হল শুতে গিয়ে। আমাদের শোবার পোশাক সব স্যুটকেসের ভেতর। তাড়াহুড়োতে কারুরই খেয়াল হয়নি যে শোবার পোশাকটা সঙ্গে নেব। ফলে আমাদের সকলকেই হয় জাঙ্গিয়া অথবা আণ্ডারওয়্যার পরে শুতে হল।

সকাল ছ'টায় বাসের হর্ণে ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, এয়ার ইণ্ডিয়ার বাসে চেপে আটটায় এসে পৌছলাম হংকং-এর কাই-ট্যাক বিমানবন্দরে।

সকালের রোদে ঝল্‌মল্‌ করছে বিমানবন্দরটি। যে দিকে তাকাও কেবল পাহাড় আর জল, আমাদের কোন রকম কাস্টমস্‌ চেকিং হল না বটে, তবে হাইজ্যাকিং-এর ভয়ে দেহ তল্লাসি থেকে কেউ বাদ পড়লাম না।

কম্পিত বক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলাম ঈগল পাখির উদরে। ঠিক সাড়ে আটটায় ভীষণ গর্জন করে ঈগল পাখি আমাদের নিয়ে আকাশে উঠে পড়ল। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল টোকিও। আমরা চলেছি প্রায় ৩০।৪০ হাজার ফিট ওপর দিয়ে। প্লেনের ভেতরে এতটুকু ঝাঁকুনি বা দোলানি নেই। দক্ষিণ চীন সাগর পেরিয়ে এসেছি, এখন চলেছি ফরমোসা প্রণালীর ওপর দিয়ে। নীচে নীল সমুদ্রের বুকে একটা সবুজ বিন্দু দেখা যাচ্ছে। মাইকে ঘোষণা করল যে, ঐ বিন্দুটি হচ্ছে চিয়াং-কাই-সেকের রাজ্য ফরমোসা দ্বীপ।

ওপরে নীল আকাশ, আর নীচে নীল সাগর। দিকৃচক্রবালে আকাশ আর সমুদ্র দুয়ে মিলে অলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে এক হয়ে গেছে। চারিদিকে খালি নীল আর নীল। অনাদি অনন্তের কি বিরাট রূপ। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ হংস বলাকার মত নীলের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিরাটের অপরূপ এই রূপ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছি। চেতনা ফিরল বিমান-সেবিকার ডাকে—আপনার সামনের টেবিলটা খুলে নিন, ব্রেকফাস্ট এনেছি। তা ব্রেকফাস্ট মন্দ দিল না। ব্রেড রোল, মাখন, চীজ, সেদ্ধ ডিম, মাট্‌ন-রসোলি, ফ্রুট ট্রিফায়েল, চা বা কফি।

বহুক্ষণ নীরব থাকার পর মাইক আবার ঘোষণা করল যে আমরা জাপানে প্রবেশ করেছি এবং এখন উড়ে যাচ্ছি যেখান দিয়ে তার নাম হচ্ছে কাগোশিমা। এইখানেই পুর্ব চীন সমুদ্রের শেষ। এবার আমরা যাব প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ধরে। তারপর একে একে বলতে লাগল যে স্থানগুলির ওপর দিয়ে আমরা উড়ে যাচ্ছি, সেই স্থানগুলির নাম। মিয়াজ্যাকি—প্রশান্ত মহাসাগরের শুরু এইখান থেকে। তারপর একে একে এলো কিউশু, শিকোকু, ওকায়ামা, ওসাকা,

শিমুওকা, ইওকোহামা প্রভৃতি। এইবার ঈগল পাখি ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করল। মাইকে অনুরোধ জানানো হল যে আমরা যেন কোমরে সীট বেল্ট বেঁধে নিই। অবশেষে দুপুর বারোটায় আমাদের ঈগল পাখি স্পর্শ করল টোকিওর বিমানবন্দর হ্যানেডা-র মাটি। হংকং থেকে টোকিও ৩০৭৩ কিঃ মিঃ। এই পথ আসতে আমাদের সময় লাগল মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা।

টোকিও (Tokyo)

ইমিগ্রেশন ও সিকিউরিটি বিভাগের কাজ চুকিয়ে বাইরে করিডরে এসে যখন ঘুরন্ত চাকি থেকে যে যার স্যুটকেস নিচ্ছি, তখন বাইরে যাবার গেটের দিকে নজর পড়তে দেখি, গেটের বাইরে বড় বড় ইংরেজি হরফে লেখা বোর্ড হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু নারী ও পুরুষ। বোর্ডের কোনটাতে লেখা রয়েছে ধারকের নাম, কোনটাতে কোন দলের নাম আবার কোনটাতে বা কোন কোম্পানির নাম। পরস্পর পরস্পরকে চিনে নেবার এক সুন্দর পন্থা। ভিড়ের মধ্যে দেখি মাঝবয়সী খর্বাকৃতি এক জাপানী ভদ্রমহিলা টি সি আই লেখা বোর্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দলনেত্রী মিসেস্ লালকাকা এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ভদ্রমহিলা নিজের পরিচয় দিলেন। মিসেস মাশা। তিনিই আমাদের জাপান ভ্রমনের গাইড। মিসেস্ মাশা আমাদের সঙ্গে করমর্দনান্তে জাপানী ভাষায় বললেন, ওহাও গোজাইমাসু। আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে চাইতে তিনি লজ্জিত হয়ে ইংরেজীতে বললেন, আই অ্যাম সরি, গুডমর্নিং। এরপর তিনি কোমরটা সামান্য নুইয়ে হাত দুটি মেলে দিয়ে, 'ওয়েলকাম টু জাপান' বলে আমাদের নিয়ে এলেন এয়ারপোর্টের বাইরে।

আমার দুটি অনুসন্ধিৎসু চোখ এয়ারপোর্টের চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার নাম লেখা ব্যানার নিয়ে কোন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন কিনা। কারণ হয় এখানে নতুবা শিবা পার্ক হোটেলে এক ভদ্রলোকের আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করার কথা আছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—কারও দেখা নেই।

পকেটে মাত্র দুটো মার্কিনী ডলার আর গোটা পাঁচেক হংকং ডলার পড়ে আছে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসে উঠলাম।

আমাদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাস চলেছে তামাগাওয়া (Tamagawa) নদীর ধারের প্রধান সড়ক দিয়ে। মিসেস মাশা জানালেন যে, পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ জনবহুল নগরী হচ্ছে এই টোকিও শহর। নবীন ও প্রাচীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং কঠিন বাস্তব ও মহান অধ্যাত্মবাদের টানা পোড়েনে গড়া এই শহর টো-কিও। টো অর্থে পূর্বদিক, আর কিও মানে রাজধানী। কিয়োতো থেকে রাজধানী পূর্ব দিকে সরে এলো বলে নতুন নাম হল পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী। টোকিওর পূর্ব নাম ছিল এদো (Edo). যার অর্থ নদীর মোহনা।

এইবার মাশা শুরু করল টোকিওর ইতিহাস—১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডোকান ওটা (Dokan Ohta) নামে এক সামন্ত নৃপতি সুমিদা (Sumida) নদীর ধারে যেখানে বর্তমান রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত, সেখানে জলাভূমির ওপরে তাঁর প্রাসাদ-দুর্গ তৈরি করেন। এদো ক্রমশ জাপানের সামন্ত ভূম্যাধিকারীদের বসবাসের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৬০৩ সালে ঈয়েসু তোকুগাওয়া (Yeasu Tokugawa) নিজেকে সমগ্র জাপানের ক্ষমতাশীল শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পর এই এদোতে তাঁর নিজস্ব শোগুনেৎ (Shogunate) বা সামরিক সরকার গঠন করেন। তারপর ১৯৬৮ সালে সম্রাট মেইজি কিয়োতো শহর থেকে সামন্ততন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত এই এদো শহরে রাজধানী স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করেন। ১৮৬৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই যুগকে বলা হয় মেইজিযুগ। তাঁর শাসনকাল বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কারণ পশ্চিমী দেশে কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় যে উন্নতি সম্ভব হয়েছে সম্রাট মেইজির শাসনাধীনে জাপানে মাত্র কয়েক দশকে সেই উন্নতি সম্ভব করে তোলা হল।

প্রথম দর্শনে কিন্তু জাপান দেখে মন ভরল না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' রচনায় পড়েছিলাম 'বন্যরা বনে শোভা পায়, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, তাই আশা করেছিলাম যে জাপানীদের দেখব তাদের নিজস্ব পোশাক পরিচ্ছদে, অর্থাৎ, পুরুষদের পরণে থাকবে যুকাতা (Yukata) আর মেয়েদের থাকবে কিমোনো (Kimono) এবং ওবি (Obi)। ওবি হচ্ছে পুঁটুলির মত একটা জিনিস, যা কিমোনোর পিছনে বাঁধা থাকে। দেখব তাদের নিজস্ব বৈচিত্র্যময় কাঠের ঘর-বাড়ি। কিন্তু এ কী দেখছি! ছেলেমেয়েরা সব পাশ্চাত্য পোশাকে

সজ্জিত, আর বৈচিত্র্যময় কাঠের বাড়ির পরিবর্তে দেখছি মার্কিণী ধাঁচে গগনচুম্বী সব বাড়ি। তবে দু-একটা কাঠের বাড়ি যে চোখে পড়ছে না তা নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এসে পৌছলাম দ্যা নিউ ওতানি হোটেলে। হ্যানেডা বিমানবন্দর থেকে আমাদের হোটেলের দূরত্ব হল ১৯ কিঃ মিঃ।

মিসেস মাশা জানালেন যে টোকিওতে এই হোটেলেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি মিসেস মাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, শিবা পার্ক হোটেলে থাকা হল না কেন? সেখানেই তো আমাদের থাকার কথা ছিল। উত্তরে মাশা জানালেন—শিবা পার্ক হোটেলের চেয়েও এই নিউ ওতানি হোটেলটা অনেক ভাল এবং বড়। এটি পাঁচতারা যুক্ত একটি আন্তর্জাতিক হোটেল।

আমি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম, এখন কি করা যায়? ভদ্রলোককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, হয় হানেডা বিমানবন্দরে নতুবা শিবা পার্ক হোটেলে তিনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। আমার মুখের অবস্থা দেখে মিসেস লালকাকা, সাহাদা এবং মুখার্জীদা আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ওঁদেরকে আড়ালে ডেকে সব বললাম। ওঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন, ঘরের চাবি নিয়ে এখুনি ঘরে চলে যান এবং সেখান থেকে ভদ্রলোকের অফিসে টেলিফোন করুন। অফিসে না পেলে শিবা পার্ক হোটেলে জানিয়ে দিন যে, এই নামের কোন ভদ্রলোক ওদেরহোটেলে আপনাকে খুঁজতে গেলে তাঁকে যেন এই হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রিসেপশন রুম থেকে আমার ঘরের চাবি নিলাম। চাবিতে ঘরের নম্বর লেখা ২০১০১, অর্থাৎ কুড়ি তলার ১০১ নম্বর ঘর। ছুটলাম লিফ্‌টের সন্ধানে।

একটা নাগাত ফোন করলাম ভদ্রলোকের অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে লাইন পেলাম, কিন্তু ফোন ধরেছে বেয়ারা। সে জানাল—আজ শনিবার, বেলা বারোটায় অফিস ছুটি হয়ে গেছে, সাহেব বাড়ি চলে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, সাহেবের বাড়ির ফোন নম্বর জানো? ওপার থেকে উত্তর এলো—সে জানে না। ফোন করলাম শিবা পার্ক হোটেলে। বৃথাই হল ফোন করা; কেউ কারও ভাষা বুঝলাম না। হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

এ কি গোলোকধাঁধা রে বাবা, ঘর খুঁজে পাই না!—বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলেন সাহাদা এবং মুখার্জীদা। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে ওরা বললেন, এ কি বোসদা, আপনি এখনও শুয়ে! শীঘ্রি তৈরি হয়ে নিন্, লাঞ্চ

খেয়েই আমরা বেরুব সাইট সীয়িং-এ। ওঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি কি না? উত্তরে জানালাম —না। তখন উভয়েই আমাকে কিছু কর্জ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্বস্ত করলেন। চলে গেলাম স্নান-ঘরে, স্নান সেরে তৈরি হয়ে নেবার জন্য।

এখানে দ্বি-শয্যার ঘর কারো মেলেনি। কারো মিলেছে তিন শয্যার ঘর, আবার কারো বা কপালে জুটেছে চার শয্যার ঘর। মুখার্জীদা, সাহাদা এবং আমার কপালে জুটেছে তিন শয্যার এই ১০১ নম্বর ঘরটি। আধুনিক সাজে সুসজ্জিত সুন্দর ঘর। করিডর দিয়ে ঢুকে প্রথমেই ছোট একটি ঘর। তার মেঝেতে পাতা রয়েছে তিন ইঞ্চি পুরু বহু বর্ণের কারুকার্য করা খড়ের তৈরি মাদুর। মাদুরটার চারটি প্রান্তই সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়া। এই মাদুরকে ওরা বলে ট্যাটামি। এই ঘরের বাঁদিকে রয়েছে শূ-র‍্যাক। শূ-র‍্যাকে আছে তিন জোড়া চটি জুতো ও তিন জোড়া নাইলনের মোজা। জাপানীদের প্রথা হচ্ছে যে, কেউ বাইরের জুতো পরে খাবার কিম্বা শোবার ঘরে ঢুকবে না। বাইরের জুতো-মোজা এখানে এই শূ-র‍্যাকে খুলে শোবার ঘরে ঢুকতে হবে ঐ চটি ও মোজা পরে। আর এই ঘরের ডানদিকে রয়েছে একটি ওয়ার্ডরোব। তার ভেতরে আছে তিন জোড়া শোবার পোশাক। আপনার অভিরুচি হলে ওদের দেওয়া পোশাক পরে শুতে পারেন। কোট, প্যাণ্ট, জুতো, মোজা খুলে রেখে ওদের দেওয়া শোবার পোশাক পরে ঢুকলাম শোবার ঘরে।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বেশ বড় শোবার ঘর। ঘরের মেঝেতে পুরু এবং দামী কার্পেট পাতা। কার্পেটে পা রাখলে পা বসে যায়। ঘরের তিন কোণে রয়েছে তিনটি খাট, তাতে বকের পালকের মত সাদা ধপধপে বিছানা। বিছানার পায়ের কাছে তিনটি খাটে তিন রঙের কম্বল ভাঁজ করা। আর চতুর্থ কোণে রয়েছে চিঠিপত্র লেখার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামসহ রাইটিং টেবিল। ঘরের একপাশে রয়েছে রেডিও এবং টি-ভি সেট। এই টি-ভিতে রঙীন ছবি দেখানো হয়। আর মাঝখানের সেণ্টার টেবিলের ওপরে রয়েছে টেলিফোন। জানালাগুলিতে ঝুলছে লেসের কাজ করা রঙীন পর্দা। দেওয়ালের গায়ে একটি কুকু ঘড়ি অবিরাম টিক্-টিক্ শব্দ করে চলেছে, আর আধ ঘণ্টা অন্তর কুকু শব্দ করে সময় জানাচ্ছে।

ঘরের সংলগ্ন স্নানাগার এবং পায়খানার মেঝে ও দেওয়াল সব মোজেক করা। স্নানাগারে রয়েছে আয়না লাগানো বেসিন, বেসিনের র‍্যাকে দাড়ি

কামানো এবং দাঁত মাজার যাবতীয় সরঞ্জাম। আর একপাশে রয়েছে শাওয়ার এবং বাথটাব। সেখানে আলনাতে ঝুলছে পরিষ্কার তোয়ালে এবং র‍্যাকে রাখা আছে স্নানের ও অঙ্গরাগের কয়েকটি প্রসাধন দ্রব্য। পায়খানাতেও রেডিও, টি-ভি এবং টেলিফোন আছে। এ ছাড়াও একটা টেবিলের ওপর আছে কিছু দৈনিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা এবং কিছু বইপত্র। এই পায়খানাতে বসেই আপনি টেলিফোনে আপনার জরুরী কাজকর্ম সারতে পারেন। আর যদি আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহলে আপনি হয় রেডিও শুনে, না হয় টি-ভি দেখে বা সংবাদপত্র পড়ে অনায়াসে সময় কাটিয়ে দিতে পারেন।

পনেরো মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে পোশাক বদলে তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য। কি বিরাট করিডর রে বাবা! না না, একটানা খুব একটা লম্বা নয়, অনেক অলিগলিও আছে। করিডরের সমস্ত মেঝেতেই ম্যাটিং পাতা। করিডরের এখানে সেখানে রয়েছে রেফ্রিজারেটর ও শোকেস্। শোকেস্গুলির কোনটাতে আছে নানান্ ধরণের আইস্ক্রীম, কোনটাতে বা ঠাণ্ডা পানীয় আবার কোনটাতে বিভিন্ন ধরণের মদ এবং বীয়ার। শোকেস্গুলোর গায়ে নাম এবং দাম লেখা ভিন্ন ভিন্ন বোতাম লাগানো রয়েছে। আপনার যে জিনিসটি প্রয়োজন তার মূল্য শোকেসের ফোঁকরে ফেলে দিয়ে সেই নামের বোতামটা টিপলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আপনার বাঞ্ছিত জিনিসটি শোকেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে।

যস্মিন্ ভাবনা যস্য—মুখার্জীদা বললেন, বহুৎ আচ্ছা। কষ্ট করে আর বাইরে মাল কিনতে যেতে হবে না। এখানেই পাওয়া যাবে।

সওয়া একটা নাগাদ আমরা সকলে ছয়তলার লবিতে নেমে এসে মিসেস্ মাশার সঙ্গে মিলিত হলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেককে ২০ ডলার হিসাবে দৈনিক খাবার জন্য কতকগুলি করে কুপন দিলেন। অর্থাৎ প্রত্যহ ব্রেকফাস্টের জন্য ৪ ডলার, আর লাঞ্চ এবং ডিনারের জন্য ৮ ডলার+৮ ডলার=১৬ ডলার। বিকেলের চা যে যার নিজ নিজ খরচায়। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে ঢুকলেন এই হোটেলেরই রোজ-রুম নামে একটি কন্টিনেণ্টাল রেস্তোরাঁতে। এখানে যাবতীয় পাশ্চাত্য ও দেশীয় খাদ্য পাওয়া যায়।

বিরাট হলঘর। একসঙ্গে প্রায় একশো দেড়শো লোক বসে খেতে পারে। সমস্ত ঘরের মেঝে জুড়ে পাতা রয়েছে বেশ মোটা কার্পেট। ঘরের চারটি দেওয়াল এবং সীলিং জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফ্রেস্কোতে ভরা। হলঘরটি

গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে জাপানী কায়দায়। ঘরে ঢুকলেই গোলাপের গন্ধে মন বিভোর হয়ে যায়। ঘরের স্তিমিত আলোতে মনে হচ্ছে যেন জ্যোৎস্না রাতে বসে আছি এক গোলাপ বাগানে। প্রত্যেক টেবিলের মাঝখানে একটা করে ফুলদানি। সেগুলিও গোলাপের ডালপালা, লতাপাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো। এমন কি টেবিলের ওপরে জলের খালি গেলাসগুলির ভেতরেও ন্যাপকিন সাজানো রয়েছে গোলাপ ফুলের আকারে।

ওয়েটার আমাদের স্বাগত জানিয়ে আমাদের সংরক্ষিত আসনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। প্রত্যেকের হাতে দিল একটি মেনু কার্ড বা খাদ্যের তালিকা। খাদ্যের দাম দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। ৮ ডলার বা ২৪০০ জাপানী ইয়েন বা আমাদের ৭২ টাকায় এককভাবে এমন কিছুই খাওয়া হবে না। তাই সাহাদা, মুখার্জীদা ও আমি একসঙ্গে খাবারের অর্ডার দিলাম। খাবার এলো তিন প্লেট্ অ্যাস্পারাগাস্ স্যুপ, চাকার মত করে কাটা তিন পীস্ পাঁউরুটি। এর সঙ্গে বিনামূল্যে এক প্লেট চিপ্‌লেট চীজ। তিন প্লেট ভাত, দু' প্লেট গ্রেভি চিকেন, এক প্লেট স্যালাড ও তিন পীস্ ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রি। কেবলমাত্র স্যুপ এবং পাঁউরুটি খেয়েই পেট ভরে গেল। এর জন্য খাওয়ার পরে পস্তাতে হল। কারণ পাঁউরুটিটা আকারে এত বড় হবে জানা থাকলে ভাতের বদলে এক প্লেট করে আইস্‌ক্রীম খাওয়া যেত। সিং, বাসুদেব এবং সমর এরা তিনজনও আমাদের দেখাদেখি যুক্তভাবে নিরামিষ খানার অর্ডার দিল।

মধ্যাহ্নভোজের পর বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে মিসেস মাশা জানালেন বাস এসে গেছে। সুবোধ বালক-বালিকার মত আমরা বাসে উঠে বসলাম।

আমাদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মিনি বাস চলেছে মারুনৌচি শপিং অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল সেণ্টার দিয়ে। এটি হচ্ছে টোকিওর একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। রাস্তার দু'পাশে বিরাট বিরাট গগনচুম্বী বাড়ি। আর বড় বড় সব ডিপার্টমেণ্টাল্ স্টোর্স। আমাদের গাড়ি থামল বহুতলবিশিষ্ট একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স বাড়ির সামনে। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স অর্থে এখানে প্রসাধন, মনিহারী, বিলাসিতা, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ইত্যাদি সবকিছুই পাওয়া যায়। এক এক তলায় এক এক রকম জিনিসের কাউণ্টার। নীচে সাইন বোর্ডে ইংরেজীতে লেখা আছে কোন্ তলায় কি জিনিস পাওয়া যায়। এস্‌ক্যালেটর বা চলন্ত সিঁড়ি কিম্বা এলিভেটরে করে ওপরে উঠে যান যে তলায় আপনার যাওয়া প্রয়োজন।

ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমরা চলেছি রাজ-প্রাসাদ দেখতে। টোকিও যেন আত্মহত্যা করেছে। কোথায় তার সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঠের বাড়ি-ঘর আর সরু সরু গলি পথ! বাপ-ঠাকুরদার-আমলের সাবেকী সেই সব ঘর বাড়ি সাফ করে ফেলে এখন হাল ফ্যাশানের স্কাইস্ক্র্যাপার, হাইওয়ে, ফ্লাইওভার এবং সাবওয়ে দিয়ে চেহারাটা আধুনিক করে ফেলেছে।

এই চলার ফাঁকে মিসেস মাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের ব্রেকফাস্টের কুপন দেওয়া হল কেন? ইউরোপ, আমেরিকায় তো ব্রেকফাস্ট সমেত বেড ভাড়া দেওয়া হয়।

মাশা জানালেন টোকিওর এই সব আন্তর্জাতিক হোটেলে কেবলমাত্র বেডই ভাড়া দেওয়া হয়। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারের জন্য আলাদা খরচ লাগে।

আমি জানতে চাইলাম— আমাদের তিনজনকে যে ঘরটাতে থাকতে দেওয়া হয়েছে তার ভাড়া কত? মাশা জানালেন আপনারা তিনজনে এক ঘরে রয়েছেন বলে ওটির ভাড়া লাগবে প্রতি রাত্রের জন্য ৩০ ডলার অর্থাৎ ৯০০০ ইয়েন বা আমাদের ২৭০ টাকা। আর যদি দুজনে থাকতেন তাহলে প্রতি রাত্রের জন্য ভাড়া লাগত ২৫ ডলার ৭৫০০ ইয়েন বা ২২৫ টাকা।

রাজপ্রাসাদ চত্বর: আমরা এসেছি রাজপ্রাসাদ চত্বরে। পরিখা এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ২৫০ একর জমির ওপর এটি একটি দুর্গপ্রাসাদ। বেশ কয়েক মাইল দীর্ঘ সমগ্র প্রাসাদ চত্বর। পরিখাটি ১০ফিট গভীর এবং ২০০ ফিট চওড়া। এর প্রাচীর ১৫ ফিট পুরু এবং ৫০ ফিট উঁচু। তার পরেই আর একটা ২০০ ফিট ঢালু প্রাচীর। প্রাচীরের ভিতরে বিরাট বাগান, আর এই বাগানের মাঝখানে রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে বাস করেন সম্রাট হিরোহিতো এবং আশপাশের বাড়িগুলিতে বাস করেন সম্রাটের পরিবারবর্গ। পরিখার ধারে ধারে পাইন গাছের সারি। এগুলি স্থানীয় বাসিন্দাদের অবদান। প্রাসাদ চত্বরে যাবার জন্য দু'দিকে দুটি কাঠের সেতু আছে। সেতু পেরিয়ে ওপারে গেলেই সামন্ত যুগের কারুকার্যমণ্ডিত দুটি লৌহ ফটক। এই ফটক দুটি হচ্ছে প্রাসাদ চত্বরের প্রবেশ পথ।

মিসেস মাশা জানালেন বছরে মাত্র দুবার এর ভেতরে জনসাধারণকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথমত ২রা জানুয়ারী, দ্বিতীয়ত সম্রাট হিরোহিতোর জন্মদিন ২৯শে এপ্রিল।

মিসেস মাশা শোনালেন এই দুর্গপ্রাসাদের ইতিকথা—১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গপ্রাসাদটি নির্মাণ করান সামন্ত নৃপতি ডোকান-ওটা (Dokan Ohta)। তখন থেকে ঈয়েসু তোকুগাওয়ার সময় পর্যন্ত এটিকে দুর্গরূপে ব্যবহার করা হত। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে অবসান ঘটল সামন্ততন্ত্রের। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল রাজতন্ত্র। এই যুগকে বলা হয় মেইজি (Meiji) যুগ। সম্রাট মেইজি এই দুর্গপ্রাসাদটি তাঁর নিজের এবং পরিবারবর্গের বাসস্থানে পরিণত করেন।

এই দুর্গপ্রাসাদে অনেকগুলি ওয়াচ টাওয়ার আছে। এর মধ্যে প্রাসাদের সর্বোচ্চ টাওয়ারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণে ভেঙে গেছে। এই প্রাসাদের ভিতরে দুটি হল্‌ঘর আছে। একটি 'সেদেন' বা স্টেট হল্, অপরটি 'মিনামি দামারি'—এটি সরকারী অতিথিদের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের জন্য। এর মধ্যে একটি যাদুঘর আছে। সেখানে রাখা হয়েছে সম্রাট পরিবারের অলংকারাদি।

আমি মাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দৈবাৎ রাজদর্শন হলে কিউযো মালনি (Kyujo Malni) বলে মাথা নত কর কেন?

উত্তরে মাশা একটা গল্প শোনালেন :—

জাপানের প্রথম সম্রাটের নাম জিম্মু। তাঁর জন্ম নাকি সূর্যের অংশ থেকে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন জাপানের ছোট একটি দ্বীপে, যার বর্তমান নাম 'কিয়ুশু' দ্বীপ। জাপান গঠিত হয়েছে হোক্কইডো, হন্‌শু, শিকোকু এবং কিয়ুশু এই চারটি প্রধান দ্বীপ নিয়ে। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক দ্বীপমালা এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের পূর্ব-উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ বক্ররেখায় প্রসারিত ও ৩৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। দেশটির আয়তন ৩,৭৭,৩৮৪ বর্গ কিলোমিটার। জাপানের সমগ্র ভূভাগ ভারতবর্ষের $\frac{1}{9}$ অংশের সমান। পূর্বে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি সব ছিল ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। জিম্মু একে একে সবকটি দ্বীপ জয় করে গড়ে তোলেন এই অখণ্ড জাপান এবং জাপানের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তিনিই হলেন জাপানের প্রথম সম্রাট এবং প্রায় আড়াই হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই একই বংশ জাপানে রাজত্ব করে যাচ্ছেন। বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো হচ্ছেন এই বংশের ১২৪ নম্বর সম্রাট। সূর্যের অংশ থেকে জন্ম বলে আমরা সম্রাটকে দেবতারূপে গণ্য করি।

ন্যাশন্যাল ডায়েট্ বিল্ডিং (National Diet Building)

আমরা এসেছি জাপানের সংসদ্ ভবন দেখতে। প্রাচীরবেষ্টিত বিরাট এক উদ্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিট এবং মার্বেল পাথরে নির্মিত তিন-তলা এই সংসদ্ ভবনটি। উদ্যানটির শোভাবর্ধন করছে চেরি, পাইন, ওক্ এবং নানা রকমের ফুল গাছ। মিসেস মাশা ভবনটি সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন—সংসদ ভবনটির দৈর্ঘ্য ৬৭৮ ফিট বা ২০৭ মিটার এবং ভবনের মাঝখানকার বৃহদায়তন বুরুজটির উচ্চতা ২১৫ ফিট বা ৬৫ মিটার। এটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে ১৮ বছর। এর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয় ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। এর যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে নিজের দেশ থেকেই। বিদেশ থেকে কান জিনিসই আনা হয়নি। দুই কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় ডায়েট ভবনের বাঁ দিকে হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভ্স বা নিম্ন পরিষদ, এবং ডানদিকে হাউস অফ কাউন্সিলরস্ বা উচ্চ পরিষদ।

উদ্যানের গেট বন্ধ। গেট পাহারা দিচ্ছে দুজন সান্ত্রী। আমরা ক্যামেরা দেখিয়ে সান্ত্রীদ্বয়কে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে উদ্যানের ভেতরে গিয়ে আমরা ডায়েট্ ভবনের কয়েকটা ছবি নিতে চাই। কিন্তু ওরা আমার কথা কিছুই বুঝল না, উল্টে বন্দুক উঁচিয়ে ইশারায় আমাদের জানিয়ে দিল যে গেট ছেড়ে সরে যাও। আমিও নাছোড়বান্দা। মাশার মারফৎ ওদের জানালাম যে আমরা ভারতীয় পর্যটক। সুভাষ বসুর দেশের লোক, চন্দ্রবসুর দেশের লোক। কোনটাতেই কাজ হল না। অবশেষে জানালাম রাসবিহারী বসুর দেশের লোক। এবার কাজ হল। ওরা একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে তাতে আমাদের নাম সই করতে বলল। আমরা ইংরেজীতে নাম সই করলাম। মাশা এই নামগুলি জাপানী ভাষায় ওদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। আমার নামের অন্তে বসু শুনে একজন সান্ত্রী জানতে চাইল রাসবিহারী বসু আমার কে হন? কোন রকম দ্বিধা না করে উত্তর দিলাম—আত্মীয়। আমরা যাবার অনুমতি পেলাম, উপরন্তু একজন সান্ত্রীকে পেলাম আমাদের সঙ্গী হিসাবে।

এবার মাশাকে অনুরোধ করলাম জাপানের সংবিধান সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। তিনি বললেন—জাপানের নতুন সংবিধান রচিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪১ সালের ৩রা নভেম্বর এবং তা কার্যকর হয় ১৯৪৭ সালের ৩রা মে থেকে। এই সঙ্গে ১৮৮৯ সালের মেইজি রচিত সংবিধানের সমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই জাপানে। সার্বভৌম

ক্ষমতা এখন জনগণের হাতেই ন্যস্ত। আর সম্রাট হলেন রাষ্ট্রের প্রতীক ও ঐক্যের প্রতীক। সরকারী শাসনকার্যের ব্যাপারে তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য প্রথমে ডায়েট্ কর্তৃক মনোনীত হন এবং প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন মন্ত্রিসভার দ্বারা। মন্ত্রিসভার পরামর্শে এবং অনুমোদনক্রমে সম্রাট জনগণের পক্ষ থেকে আইনের প্রচলন, সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, ডায়েটের অধিবেশন সমূহের উদ্বোধন, মন্ত্রীদের নিয়োগ আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন এবং সম্মানসূচক উপাধি প্রদান প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করেন।

এরপর সরকারী ভবন, ধর্মাধিকরণ, প্রধানমন্ত্রী মিকির ভবন প্রভৃতি দেখে আমরা চলেছি মেইজি শ্রাইন (Shrine) বা মেইজি মন্দির দেখতে। সাহাদা মাশাকে অনুরোধ করলেন এখানকার ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য।

মাশা জানালেন—জাপানে শিন্তো, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্ট এই তিনটি ধর্ম প্রচলিত।

(১) **শিন্তো (Shinto) ধর্ম**ঃ—এটি জাপানের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধর্ম। একে ঠিক ধর্ম না বলে নীতির অনুশাসন বলাই শ্রেয়। শিন্তোবাদ বা কন্‌ফুসিয়ানিজম্ (Confucianism) পারিবারিক পূর্বপুরুষদের কিম্বা রাজবংশীয় পূর্বপুরুষদের অর্চনা করতে বলে। এই মতবাদ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাপানে প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিন্তোবাদকে জাপানের রাজধর্ম বা স্টেট রিলিজিয়ন রূপে অভিহিত করা হয় এবং শাসকবর্গ এই ধর্মপালনে জনগণকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। সেই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহু সরকারী সাহায্যও দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী শিন্তোবাদ আর কোন সরকারী উৎসাহ লাভ করে না।

(২) **বৌদ্ধধর্ম**ঃ—বর্তমান জাপানের প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। তবে শিন্তোবাদের অবস্থানও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি। বহু ক্ষেত্রেই জনসাধারণের নিকট বৌদ্ধধর্ম এবং শিন্তোবাদের মধ্যে পার্থক্য বোধগম্য হয় না। বহু জাপানী বিবাহের সময় শিন্তো মতবাদ অনুসারে অনুষ্ঠান পালন করেন, কিন্তু অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান পালন করেন বৌদ্ধধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষ থেকে চীন ও কোরিয়ার মধ্য দিয়ে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম যে কেবলমাত্র ধর্ম হিসাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা নয়, দেশের শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতিকল্পে এই ধর্মের অবদান অসামান্য।

(৩) **খ্রীষ্টধর্ম ঃ**—১৫৪৩ সালে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি ছোট দ্বীপে প্রথম অবতরণ করেন। এঁরাই জাপানে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন শুরু করেন। এর কয়েক বছর পরে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার-এর নেতৃত্বে একদল জেসুইট মিশনারী এবং কিছু স্পেনবাসীর আবির্ভাব ঘটে জাপানে। ১৫৪৯ সালে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার এবং এই মিশনারীরা জাপানে প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি বণিকদেরও পদার্পণ ঘটে এই জাপানে। দলে দলে ইউরোপীয়দের আগমনে জাপানের জীবনযাত্রায় প্রবল প্রভাব বিস্তার করল। খ্রীষ্টান মিশনারীরা দক্ষিণ জাপানে বহু জাপানীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। তৎকালীন শোগুনেৎ (Shogunate)-এর টনক নড়ল তিনি বুঝতে পারলেন যে একদিন খ্রীষ্টধর্ম, ইউরোপীয়দের আনীত আগ্নেয়াস্ত্রের অন্তর্নিহিত বিস্ফোরক ক্ষমতার মতই শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। ফলে, জাপানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বে-আইনী ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল। এই নিষেধাজ্ঞা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫০ বছর বলবৎ ছিল।

১৯৪৬ সালের সংবিধানের ধারা অনুসারে জাপানের প্রত্যেক নাগরিককে ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী জাপানে শিন্তো ধর্মের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। প্রসার লাভ করছে খ্রীষ্টধর্ম। জাপানে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্যাথলিক অপেক্ষা প্রোটেস্ট্যাণ্টরা সংখ্যায় বেশি।

মেইজি শ্রাইন ঃ আমরা ঢুকলাম ঘন গাছপালায় ঘেরা ছবির মত সুদৃশ্য বিরাট এক বাগানের মধ্যে। মাশা জানালেন—এই বাগানের আয়তন ৭২ হেক্টার বা ১৮০ একর। এই বাগানে নানান্ জাতীয় গাছপালার সংখ্যা লক্ষাধিক। এগুলি সব জাপানী জনসাধারণের অবদান। আমরা মন্দিরের পথে এগিয়ে চলেছি সামন্ততন্ত্র যুগের কারুকার্যমণ্ডিত বিশাল বিশাল তোরণ বা টোরী গেট পেরিয়ে। (Tori Gate—A gateway or portal consisting of two upright wooden posts connected at the top by two horizontal crosspieces) যেতে যেতে পথের দু'পাশে যে সব গাছ দেখতে পাচ্ছি তার পাতা তলোয়ারের মত এবং তাতে ফুটে রয়েছে অজস্র রংবেরঙের ফুল। ঐ ফুলগুলির দিকে মাশার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি জানালেন ঐগুলি আইরিস্ (Iris) ফুল। ৮০ রকমেও বেশী ঐ গাছ এই বাগানে আছে।

আমরা এসে গেছি মন্দিরের সামনে। কাঠের তৈরি সুন্দর মন্দির। মাশা জানালেন, এটি শিন্তো মন্দির। এটি নির্মিত হয়েছে ১৯২০ সালে। আমরা

মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলাম। ঘরটি ধূপধূনার গন্ধে ভরপুর। এখানে দেবতার কোন মূর্তি নেই। দুটি কক্ষ। একটি কক্ষে বেদির ওপরে রয়েছে সম্রাট তাইসো (Taiso) ও তাঁর পত্নীর মূর্তি এবং অপর কক্ষে বেদির ওপরে রয়েছে সম্রাট মেইজি ও তাঁর পত্নীর প্রতিমূর্তি। এঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে সম্রাট হিরোহিতোর পিতামাতা এবং পিতামহ ও পিতামহী। বেদিগুলি ফুলে ভরা এবং সেখানে মোমবাতি জ্বলছে। কক্ষের সীলিং-এ ঝুলছে রঙীন কাগজে তৈরি লণ্ঠন। মন্দিরের একধারে বেশ ভিড় জমেছে। মাশা জানালেন ওখানে জাপানী বিবাহ অনুষ্ঠান হচ্ছে। চল, তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ইওমেইরি (Yomeiri) বা জাপানী বিবাহ :—বর এসেছে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। বরের পরণে সকালবেলাকার পোশাক। তাতে পুচ্ছের মত কি একটা লাগানো রয়েছে। বরের মাথায় আমাদের দেশের টোপরের মত চূড়াওয়ালা টুপি। বরের পুরুষ সঙ্গীদের প্রায় একই পোশাক, তবে তাদের পুচ্ছ নেই, আর টুপিও চূড়ার মত নয়। কনে এলো আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। কনের পরণে সুন্দর সূচিকর্ম করা দামী সিল্কের কিমোনো, তার পিছনে বাঁধা সিল্কের ওবি। চুল বেঁধেছে খাঁটি জাপানী প্রথায়। মাথায় পালক লাগানো গোল টুপি। আর মুখে বেশ ভারী করে মেখেছে প্যানকেক ফেস মেক্-আপ। ধবধবে সাদা, লম্বা, ঢিলা পোশাক পরে এলেন পুরোহিত। তাঁর মাথায় কালো টুপি। পুরোহিতের সঙ্গে এলো উজ্জ্বল লাল পোশাক পরা মন্দিরের কুমারীরা (Shrine Maidens)। মহিলা অতিথিদের মধ্যে বিবাহিতারা পরেছেন চিকনের কাজ করা গাঢ় রঙের কিমোনো, আর কুমারীরা পরেছে হাল্কা রঙের কিমোনো। পুরোহিত সকলকে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। আমাদের হাতে সময় নেই, তাই বিয়ে দেখা আর হল না।

মিসেস মাশা জানালেন জাপানে প্রেম করে বিয়ে এবং যোগাযোগ করে বিয়ে—দু'রকম বিয়ের প্রথাই চালু আছে। প্রেমঘটিত বিবাহকে এরা বলে রেনাই কেক্কোন (Renai Kekkon) এবং যোগাযোগের মাধ্যমে বিবাহকে বলে অমিয়াই (Omiai)। যোগাযোগ করে বিয়ের ব্যবস্থা ছেলে-মেয়েদের বাপ মায়েরা বা অভিভাবকরা হয় নিজেরাই করেন নতুবা কোন ঘটককে দিয়ে করানো হয়। এই ঘটকদের এরা বলে নাকোডো (Nakodo)। এঁরা কিন্তু আমাদের দেশের ঘটকদের মত হেঁজিপেঁজি লোক নন। এঁরা হচ্ছেন পাত্র কিম্বা পাত্রীর পরিবারের বিশ্বাসী বন্ধু বা পরামর্শদাতা।

জাপানে আগেকার দিনে প্রথা ছিল, পাত্র তার মনোনীত পাত্রীর বাড়ির দরজায় এক পাটি জুতো রেখে তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। যদি পাত্রী নিজে বা তার পরিবারের কেউ এই জুতো বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে এই বিয়েতে পাত্রীপক্ষের মত আছে। এরপর পাত্র কিছু উপঢৌকন পাঠাবে পাত্রীর বাড়িতে। তারপর ঘটকের মাধ্যমে একদিন পাত্র-পাত্রীর পবিত্র মিমাই (Mimai) বা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হবে কোন মন্দির বা পার্ক বা অন্য কোন স্থানে। সেখানে উভয় পক্ষেরই অভিভাবক এবং বন্ধুবান্ধবরা উপস্থিত থেকে বিয়ের দিনক্ষণ, স্থান এবং কথাবার্তা সব পাকা করবেন। আজকাল জুতো রাখার প্রথা উঠে গেছে, তবে বাদবাকী সব ঠিকই আছে। এই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় শিস্তো বা বৌদ্ধ মন্দিরে, খাঁ কোন গির্জাতে কিম্বা কোন বাড়িতে বা বড় হোটেলে। হোটেলে বিয়ের জন্য বড় বড় হলঘরগুলিকে গির্জা বা মন্দিরের মত করে সাজানো হয়।

এরপর কিন্তু বড় বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে। একে এরা বলে আশীরে (Ashire) বা আঠার মত পায়ে লেপ্টে থাকা। অর্থাৎ ট্রায়াল ম্যারেজ বা বিয়ের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দু'মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত পাত্রীকে প্রতিদিন পাত্রের বাড়িতে গিয়ে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, রান্না করা, বিছানা পাতা, গুরুজনদের সেবা করা প্রভৃতি নানা রকম গৃহস্থালির কাজকর্ম করতে হয়, কখনও-সখনও রাতেও পাত্রের বাড়িতে যেতে হয়।

জাপানী নববধূদের পক্ষে ঈর্ষা হল মহাপাপ এবং অমঙ্গলের কারণ। এই অমঙ্গলের হাত থেকে কনেকে রক্ষা করার জন্য বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কনেকে পরানো হয় একটা টুপি। এই টুপিকে এরা বলে তসুনোকাকুশি (Tsunokakushi)—ইংরেজী নাম (Horn hiding hat)। এই টুপির ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয় ঈর্ষার প্রতীক একটি সিং। টুপিটি সাদা এবং লাল রেশমী ফিতে দিয়ে বাঁধা হয় কনের মাথায়। এই টুপি পরানোর অর্থ নববধূকে ঈর্ষামুক্ত করা হল।

এদের দু'হাজার বছরের একটা কুপ্রথা আজও যায়নি। নববধূ যখন আত্মীয় পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে প্রথম স্বামী গৃহে পদার্পণ করে, তখন স্বামীর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং পাড়াপড়শীরা তাদের নানা রকম ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং উপহাসে লাঞ্ছিত করে। কাদা ছিটিয়ে দেয় নববধূর দামী কিমোনোতে। তারপর নববধূ যখন গৃহে প্রবেশ করে তখন তাকে মারা হয় বাঁশের ছড়ি দিয়ে।

আমাদের বাঙালীদের ফুলশয্যার রাতে যেমন মেয়েরা নবদম্পতির শোবার ঘরের আশেপাশে আড়ি পাতে এদেরও সেই রকম প্রথা প্রচলিত আছে। এরা আগে থেকে নবদম্পতির ঘরের দরজায় ছোট ছোট ফুটো করে সেগুলিতে কাগজ এঁটে রাখে। নববধূ যখন স্বামীর সঙ্গে ঘরে ঢোকে, তখন ওরা ফুটোর কাগজগুলি তুলে ফেলে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নবদম্পতির ক্রিয়াকলাপ।

মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সামনে রয়েছে একটা রঙ্গমঞ্চ। মাশা জানালেন এখানে মাঝে মাঝে বুগাকু (Bugaku) নাচ এবং প্রাচীন সঙ্গীত হয়। মন্দির সংলগ্ন একটি যাদুঘরে ঢুকলাম, নাম ট্রেজার মিউজিয়ম। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিসপত্র, হীরা, জহরত এবং নানান্ সময়কার নানান্ মুদ্রা।

আমরা যে বীথি দিয়ে চলেছি তার দু'পাশে কেবল চেরি গাছ আর চেরি গাছ। এরপরে আমাদের গাড়ি এসে থামল অলিম্পিক্ স্টেডিয়ামের সামনে। মাশা জানালেন—এই স্টেডিয়ামটি নির্মিত হয় ১৯৫৮ সালে, তৃতীয় এশীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে। এই স্টেডিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকাসন আছে। পরে ১৯৬৪ সালে যখন টোকিওতে অষ্টাদশ অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় তখন এটি আরও সম্প্রসারিত হয় এবং আসন সংখ্যাও বাড়ানো হয়। এই স্টেডিয়ামের নক্শাকার হচ্ছেন প্রফেসর কেন্‌জো টাঙ্গে। এই স্টেডিয়ামের স্থাপত্যশিল্পের জন্য ইনি দুটো পুরস্কার পেয়েছেন। একটি অলিম্পিক পুরস্কার এবং অপরটি একটি ফরাসী শিল্পবিদ্যা পুরস্কার। স্টেডিয়ামটির আকৃতি জাহাজের মত। প্রতি বছরেই এখানে অপেশাদারী জাতীয় ক্রীড়া উৎসব হয়। সেই উৎসবে ১৬ হাজারেরও বেশী তরুণ-তরুণী ক্রীড়াকুশলীরা যোগ দেয়।

মাশা জানালেন—আমাদের ঐতিহ্যগত খেলাধুলা হচ্ছে—সুমো (কুস্তি), জুডো (যুযুৎসু), কেন্দো (তলোয়ার) এবং কিউদো (ধনুর্বিদ্যা)। এছাড়া পাশ্চাত্যের অনেক খেলাধুলারও চল আছে। জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে জুডো। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়ায় জুডো সর্বপ্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া-সূচিতে স্থান পায়। এছাড়া আমেরিকান বেস্-বলও এখন জাপানে বেশ একটা জনপ্রিয় খেলা হয়ে উঠেছে। এই মেইজি বাগানে আমাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে ন্যাশন্যাল সুয়িমিং পুল। আন্তর্জাতিক মানের এই পুলটি চেরি গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর নীল জলে ভাসছে চেরি গাছের এবং আকাশের টুকরো টুকরো মেঘের প্রতিবিম্ব।

আসাকুসা ক্যান্নন টেম্পল (Asakusa Kannon Temple) :—বিরাট একটি টোরী গেটের সামনে আমরা বাস থেকে নামলাম। এটা মন্দিরে যাবার তোরণ। দ্বারে ঝুলছে লাল কাগজের তৈরি কারুকার্য করা বিরাট একটি লণ্ঠন। লণ্ঠনের ভেতরে মোমবাতি জ্বলছে। পথের ছ'পাশে বাজার বসেছে। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বাজারের দোকানগুলি লতা, পাতা, ঘাস দিয়ে মনোরম করে সাজানো হয়েছে। দোকানের ভেতরে গ্যালারির মত করে থাকে থাকে সাজানো রয়েছে নানান্ জিনিসপত্র। হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং নানা রকম খাবারের দোকানও আছে। খাবারের দোকান দেখে জঠরানল জ্বলে উঠল অথচ নিবৃত্তি করার উপায় নেই, কারণ পকেট তো গড়ের মাঠ। মিসেস মাশা আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে আমাদের জন্য কিনে আনলেন কিছু গরম পিঠা এবং বাদাম দেওয়া চকলেট। সফেদা দিয়ে তৈরি এই পিঠের ভেতরে নানারকম পুর দেওয়া। এগুলি খেতে বেশ সুস্বাদু। এই পিঠার নাম সুশী (Sushi)।

লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের কাগজের তৈরি ছোট ছোট লণ্ঠনের সারির নীচ দিয়ে এবং ছ'পাশে বিপনীর সারিকে পাশ কাটিয়ে আমরা এলাম মন্দিরের দোরগোড়ায়। মন্দিরটি প্যাগোডার মত দেখতে। মাশা শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা—প্রায় সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির। মন্দিরটি উৎসর্গ করা হয়েছে করুণার অবতার গৌতম বুদ্ধের নামে। মন্দিরের ভিতরে একটি বেদীর ওপরে করুণাময়ের ভঙ্গীতে একটি বুদ্ধ মূর্তি বসানো রয়েছে। ধূপধুনা ও ফুলের সুবাসে ঘর ভরপুর। বুদ্ধের পাদদেশে সারি সারি মোমবাতি জ্বলছে। বেশ শান্ত পরিবেশ। মন্দির চত্বরে দেখি অসংখ্য পায়রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুণ্যার্থীরা এদের খাওয়াচ্ছেন পুণ্যার্জনের লোভে। প্রতি বছর মে মাসে এখানে বিরাট এক উৎসব হয়। তখন বহু লোকের সমাগম হয় এখানে এবং অনুষ্ঠিত হয় প্রাচীন যুগের অর্থাৎ এদো যুগের (১৬১৬-১৮৬৮) নানান্ রকম নৃত্যগীত।

ইয়াসুকুনি শ্রাইন (Yasukuni Shrine) :—উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি নির্মিত এটি একটি স্মৃতিমন্দির। মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে মৃত জাপানী সৈনিকদের উদ্দেশ্যে। আমরা দক্ষিণ দিকে গ্র্যানিট্ পাথরের তৈরি অনেকগুলি টোরী গেট পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। আছে কেবলমাত্র একটি স্মৃতিবেদী। মাশা জানালেন বছরে দুবার,

যথা ২১শে থেকে ২৫শে এপ্রিল এবং ১৭ই থেকে ২১শে অক্টোবর এখানে স্মৃতি উৎসব হয়। সেই সময়ে মৃত সৈনিকদের পরিবারবর্গ এখানে বিগতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন।

যশিমা সীদো (Yshima Seido) :—কন্‌ফুসিয়াস্‌ এবং তাঁর ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এটিও একটি স্মৃতিসৌধ। সামন্ততন্ত্র যুগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এর জনপ্রিয়তা ছিল যোদ্ধশ্রেণীর কাছে। এটি কিন্তু আদি সৌধ নয়। আদি সৌধটি ১৯২৩ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই ভূমিকম্পে প্রথম দিন ৩৭ বার এবং পরের দিন ৯০ বার প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে আগুন জ্বলে ওঠে—সেই আগুনের লেলিহান শিখা শত শত ফিট উঁচু হয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু এবং প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়—যাকে বলে ড্রাগন টুইস্টার (Dragon Twister) বয়ে যায় প্রজ্বলিত ভূভাগের ওপর দিয়ে। সরকারী হিসাবে এই ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১০৭৫০০, আহতের সংখ্যা ৪২০০০ আর বাড়ি বিধ্বস্তের সংখ্যা ৩৭৫০০০।

মাশা জানালেন, ভূমিকম্প আমাদের নিত্যকার সাথী। কারণ জাপান দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগর পরিবেষ্টিত পর্বত-সৃষ্টিকারী বলয়ের অংশীভূত। প্রকৃতপক্ষে, পর্বতই হচ্ছে জাপানের সমগ্র ভূভাগের শতকরা ৮০ ভাগ। এই সব পর্বতগুলির মধ্যে ৫৮০টিরও বেশির উচ্চতা ২০০০ মিটারের ওপর। এর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত হচ্ছে ফুজি (Fuji), যার শৃঙ্গচূড়ার উচ্চতা ৩৭৭৬ মিটার বা ১২৩৮৫ ফিট। ফুজি একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। এর সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত হয় ১৭০৭ সালে। জাপানে মোট আগ্নেয়গিরির সংখ্যা হচ্ছে ১৯৬, এদের মধ্যে ৩০টি এখনও সক্রিয়।

সেনগাকুজি মন্দির (Sengakuji Temple) :–এটি একটি সমাধি মন্দির। এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে ৪৭ জন বীর সামুরাইকে (Samurai)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এঁরা আততায়ীর হাত থেকে এঁদের প্রভুকে রক্ষা করতে পারেননি, তাই এঁরা সকলেই হারাকিরি (Harakiri) করে এখানে মৃত্যুবরণ করেন।

মিসেস মাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম—সামুরাই কাদের বলে? এবং হারাকিরি ব্যাপারটা কি?

তিনি জানালেন : সামুরাই-এর অর্থ হচ্ছে দেহরক্ষী বা পাহারাদার। কি করে সামুরাইদের আবির্ভাব ঘটল তা জানতে হলে তৎকালীন জাপানের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে। প্রায় হাজার বছর আগে যদিও সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে, তথাপি আসল ক্ষমতা ছিল শোগুনেৎ (Shogunate) বা সামরিক সরকারের এক্তিয়ারে। সর্বশক্তিমান শোগুনেৎ-এর অধীনে বিভিন্ন সামন্ততন্ত্রী জমিদার বিভিন্ন এলাকায় শাসন করতেন। তাঁদের বলা হত 'দাইম্যো'। এই দাইম্যোরা ছিলেন নিজ নিজ এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের মধ্যে কাটাকাটি, মারামারি প্রায়ই লেগে থাকত। তাই তারা নিজেদের স্বার্থে সৃষ্টি করেছিলেন এই সামুরাই সম্প্রদায়। এরা বেতনভুক নয়। এদের মূলমন্ত্র হল প্রভুভক্তি। এদের সঙ্গের সাথী দুটি অস্ত্র—শত্রুকে আঘাত হানতে একটি তলোয়ার এবং আত্মসম্মান রক্ষার্থে একটি বড় ছোরা।

আত্মসম্মান জ্ঞান এদের খুব প্রখর। এদের কাছে জীবনের চেয়ে জবানের দাম বেশী। প্রভুর আদেশে প্রাণ দেওয়াই এদের সবচেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা। সামুরাই আইনকানুন ছিল অত্যন্ত কঠিন। যা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল 'বুশিদো' ঐতিহ্যের, অর্থাৎ জাপানী শিভ্যাল্‌রি। যদি কোন সামুরাই প্রতিজ্ঞাচ্যুত, কি নির্দেশিত পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত অথবা পরাভূত হয়, তখন তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে আত্মহত্যা বা হারাকিরি।

এই হারাকিরি বড় বীভৎস ব্যাপার। হারাকিরির নিয়মানুযায়ী আত্মহননেচ্ছু সামুরাই প্রথমে ক্ষৌরকর্ম করে পরবে ধবধবে সাদা রঙের কিমোনো এবং রেশমের ওবি। তারপর কোন নির্জন মন্দিরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে সোজা হয়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবে। প্রার্থনা শেষে নিজের বাঁদিকের উদরে নাভির কাছাকাছি ছোরাটা বিঁধিয়ে জমির সমান্তরালে আট ইঞ্চি পরিমাণ পেট চিরে ফেলবে। এরপর ছোরাটা বিদ্ধাবস্থাতেই আবার ওপর দিকে টেনে তুলবে। এই সময়ে তাকে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য তারই নিয়োজিত লোক পিছন থেকে তলোয়ার দিয়ে তার মস্তক ছেদন করবে। যুগে যুগে হাজার হাজার সামুরাই এই রকম নৃশংস ভাবে আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যাকে জাপানীরা মহৎ কর্ম বলে মনে করে। এই হারাকিরির শাস্ত্রীয় নাম হচ্ছে সাপ্পুকু (Sappuku)। সামুরাইরা আজ আর জাপানে নেই বটে, কিন্তু তাদের প্রেতাত্মারা আজও আছে। অর্থাৎ এই হারাকিরি বা সাপ্পুকু প্রথা জাপানে আজও প্রচলিত আছে।

মিসেস মাশা জানালেন যে, আমরা এখন চলেছি জাপানের উচ্চ শিক্ষালাভের কেন্দ্রস্থল ক্যাণ্ডা (Kanda)র ওপর দিয়ে। এখানে মোট বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২,৩০,০০০।

টোকিও ইউনিভার্সিটি : জাপানের সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্বে এর নাম ছিল টোকিও ইম্পিরিয়্যাল ইউনিভার্সিটি। এটিকে জাপানের শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দশটি কলেজ ভবন আছে। এই কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আঠারো হাজারের কিছু বেশি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি হাসপাতাল আছে, যার কর্মদক্ষতা বিশ্বখ্যাত।

চীন ও জাপানের বর্ণমালাকে বলা হয় পিকটোরিয়্যাল অ্যাল্‌ফাবেট। ইংরেজ এবং ভারতীয়দের লেখার ধারা বাঁদিক থেকে ডানদিকে। উর্দু এবং ফরাসী লেখার ধারা ডানদিক থেকে বাঁদিকে। আর চীন এবং জাপানীদের লেখার ধারা ওপর থেকে নেমে আসে নীচের দিকে। ওদের বই লেখা শুরু হয় আমাদের বইয়ের শেষ পাতা থেকে, আর ওদের শেষ হয় যেখানে আমাদের হয় শুরু। এমন কি বইয়ের পাতায় ওরা ফুটনোট লেখে না, লেখে হ্যাট নোট—অর্থাৎ ওদের পাতার নীচের দিকে নোট থাকে না, থাকে পাতার মাথার দিকে। চিঠির বেলাতেও তাই, ওরা সম্ভাষণ লেখে চিঠির শেষে।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখা শেষ করে আমরা যখন ফিরলাম তখন হোটেলের লবির গ্লোব ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বেজেছে। এই ঘড়িটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই ঘড়ি একই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রেরই সময় নির্দেশ করে। ইউরোপের মত এখানেও সন্ধ্যা আটটার মধ্যে নৈশভোজ সেরে নিতে হয়। ফলে মুখ, হাত, পা ধুয়ে বেশ পরিবর্তন করে চারতলায় নেমে এসে সবাই ঢুকলাম ট্রেডার ভিক্স (Trader Vic's) নামে রেস্তোরাঁতে।

নৈশভোজের পর সবাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম মিসেস মাশার সঙ্গে বাজার-হাট দেখতে। মিসেস মাশা একটা লাল নিশান হাতে এগিয়ে চললেন আর আমরা সারিবদ্ধ হয়ে চললাম তাঁর পিছু পিছু। নিশান নেবার অর্থ হল যদি আমরা কেউ দলচ্যুত হয়ে পড়ি, তাহলে তাঁর হাতের এই নিশান দেখে আমরা তাঁকে খুঁজে বের করব। আমরা চলেছি পাতাল-পথ (Sub-way) দিয়ে। বেশ চওড়া পথ। পথের দু'পাশে নানান্ রকম জিনিসের সুসজ্জিত দোকানের সারি। রেস্তোরাঁ, বার এবং সিনেমাও রয়েছে এই পাতালের ভেতরে।

আলো দিয়ে পাতাল-পথটাকে দিনের মত আলোকিত করে রাখা হয়েছে। বোঝবার উপায় নেই যে আমরা পাতালে প্রবেশ করেছি। পাতাল-পথে বেশ ভিড়, মনে হচ্ছে যেন আমাদের কলকাতার বড়বাজার কিম্বা শিয়ালদহ। কিন্তু এতটুকু গোলমাল, চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি বা ধাক্কাধাক্কি নেই। পাতাল-পথে ওঠা নামা করার জন্য এমনি সিঁড়ি তো আছেই, উপরন্তু আছে এস্‌ক্যালেটর বা চলন্ত সিঁড়ি।

গিন্‌জা (Ginza) : আমরা এলাম জাপানের চাকচিক্যময় রাজপথগুলির অন্যতম এই গিন্‌জায়। এটি একটি আমোদ-প্রমোদের স্থান। রাস্তার প্রতি মোড়ে রয়েছে একটি করে ফোয়ারা। ফোয়ারাগুলিতে নানা রঙের আলোর ফোকাস দিয়ে সেগুলিকে করে তোলা হয়েছে বৈচিত্র্যময়। দু'পাশের অতি আধুনিক দোকানপাটগুলি রঙীন আলোকমালায় ঝল্‌মল্ করছে। এই আলোর প্রতিফলনে রাস্তাটি হয়ে উঠেছে ইন্দ্রপুরী। দোকানগুলিতে থরে থরে সাজানো রয়েছে লোভনীয় জিনিসপত্র। এমন জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। বড়লোকদের জন্য রয়েছে অতি আধুনিক ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স বা বিভাগীয় বিপণি, গরীবদের জন্য রয়েছে হকার্স-কর্ণার আর মধ্যবিত্তদের রয়েছে উভয়ই। যদি হাতে বিভিন্ন জিনিসের বিরাট ফর্দ থাকে তাহলে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে যাওয়াই শ্রেয়। কারণ বিভিন্ন জিনিসের দোকান খোঁজাখুঁজির পরিশ্রম থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এই রাস্তার ওপরে আছে বহু সিনেমা, থিয়েটার এবং বিখ্যাত সব নাইট ক্লাব। তাছাড়া আশেপাশের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য বার, রেস্তোরাঁ ও মার্জনাগার (Massage Clinic)। আধুনিক ইলেক্‌ট্রনিক্স এবং কম্পিউটার মেশিনের যুগেও গণনার সাবেক পদ্ধতি এরা একেবারে বর্জন করেনি তাই অনেক হকার্স-কর্ণারে দেখি হিসাবরক্ষকরা অ্যাব্যাকাস্ (Abacus counting frame with balls)-এর সাহায্যে হিসাব গণনা করছে।

কলকাতায় জাপানী জিনিসপত্র আমরা অনেক সস্তা দরে পাই। তাই আমার ধারণা ছিল যে খাস জাপানে হয়তো ঐসব জিনিসপত্র আরও অনেক সস্তায় পাব—কিন্তু আমার ভুল ভাঙল—হংকং বা আমাদের ভারতের তুলনায় এখানে প্রত্যেকটি জিনিসেরই দাম অত্যন্ত চড়া। মিসেস মাশা জানালেন—এখানকার জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত, তাই এখানে প্রতিটি ব্যবহার্য জিনিসের ওপর শুল্ক ধার্য করা হয় অনেক বেশি।

রাত এগারোটা হল হোটেলে ফিরতে। ঘরে ঢোকার পথেই করিডরে একটা শোকেসের সামনে থমকে দাঁড়ালেন মুখার্জীদা। তারপর—'সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাকে একটু চাঙ্গা করা দরকার—' বলে শোকেসের একটি ফোকরে নির্ধারিত ইয়েন ফেলে দিয়ে নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো এক বোতল গরম সেক্ (sake)। সেক্ হচ্ছে ভাত থেকে তৈরি একপ্রকার জাপানী মদ। এই মদ গরম অবস্থাতেই পান করে।

ঘরে ঢুকে ধড়াচুড়া খুলে পরে নিলাম হোটেলের দেওয়া শয়নের পোশাক। সিংও পোশাক বদলে এসে ঢুকল আমাদের ঘরে। শুরু হল বোতলটার ছিপি করা। কি তেজী মদ রে বাবা! শরীর গরম হয়ে উঠল, দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূর হল, কিন্তু মাথাটা ঝিমঝিম করছে। আর নয়, এবার শুয়ে পড়া যাক।

* * *

ভোরে ঘুম ভাঙল ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটার কোকিল ছুটোর কুক-কুক ডাকে। মোট পাঁচবার ডেকে ওরা চুপ করল। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে ঘরের দরজা খুলতে দেখি একটি বই হাতে সিং করিডরে পায়চারি করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সিং এগিয়ে এসে বইটা আমাকে দিয়ে বলল—এটা পড়ে দেখ, এটা হচ্ছে এই হোটেলের গাইড বুক। এতে দেখলাম এদের হোটেলের সঙ্গে রয়েছে নিজস্ব একটা পুরোন প্রথার বাগান। আজ তো ফ্রী-ডে অর্থাৎ নিজ খরচে নিজের ইচ্ছামত ঘোরা—চল, এখন আমরা বাগানটা দেখে আসি, পরে ছোটহাজরি সারব টাওয়ারের কোন রেস্তোরাঁতে।

সাহাদা, সিং ও আমি বেরিয়ে পড়লাম বাগান দেখতে।

দশ একর জমির ওপর চারশো বছরের পুরোন ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বাগানটি। সমস্ত বাগানটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। গোলাপী রঙের ছোট ছোট পাথরের নুড়ি বিছানো চলার পথ। পথের দু'পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চেরি, পাইন, ওক, দেওদার, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি গাছ। প্রভাত সূর্যের আলো এসে পড়েছে গাছের মাথায়। কৃষ্ণচূড়া এবং চেরি গাছের মাথা যেন জ্বলছে। ডালে ডালে, শাখায় শাখায় পাখিরা সব গেয়ে উঠেছে 'জাগো সখী, রাত পোহালো, ভোরের আলো, তীর হেনেছে, নিশীথিনীর বুকে'।

বাগানের মাঝে মাঝে রয়েছে লতাগুল্মের ঝোপঝাড়। আবার কোথাও বা রয়েছে কুঞ্জবন। জোড়ে জোড়ে সব বসে আছে কুঞ্জবনের বেঞ্চের ওপরে।

কুঞ্জবনের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। নদীর জলের রং নীল। নদী পারাপারের জন্য জায়গায় জায়গায় রয়েছে টকটকে লাল রঙের সাঁকো। সবুজ গাছ-পালা, লতাপাতা আর ঘাসে ঘেরা বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে নীল নদী আর তার ওপরে টকটকে লাল রঙের এই সাঁকোগুলি—এ এক অপূর্ব রঙের সমাবেশ। কোথাও কোথাও শ্বেতপাথরের কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করে তার বুকে তৈরি করা হয়েছে ঝর্ণা। আবার কোথাও বা তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম হ্রদ। ঐ হ্রদের নীল জলে ভেসে বেড়াচ্ছে রঙীন মাছের দল। কোথাও বা নদীর ঘাটে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য বাঁধা রয়েছে রঙীন নৌকা। বাগানের মাঝে মাঝে ফুটে রয়েছে নানান্ জাতের ও নানান্ রঙের ফুল। ফুলগুলির চারপাশে মৌমাছি, প্রজাপতি ও ভোমরার দল উড়ে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট জাপানী ছেলেমেয়েরা এই সব প্রজাপতি ধরার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে তাদের পিছু পিছু। এক কথায় বলতে গেলে এই বাগান সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাপানে এসে এদের বাগান যিনি দেখেননি তার জাপানে আসাটাই বৃথা।

বাগান দেখা হয়ে গেলে সাহাদা বললেন, গতকাল তো সারাদিন আমরা বাইরে বাইরে কাটিয়েছি, তাই হোটেলটাকে ভাল করে দেখা হয়নি। আজ এই ফাঁকে সেই কাজটা সেরে নিই চল। আমরা ফিরলাম হোটেলে।

ইংরেজরা নীচতলাকে বলে গ্রাউণ্ড ফ্লোর এবং দ্বিতীয় তলাকে বলে ফার্স্ট ফ্লোর। এরা কিন্তু আমাদের মতই নীচতলাকেই ফার্স্ট ফ্লোর বলে। হোটেলটির অবস্থিতি একটি টিলার ওপরে। ভূকম্প প্রতিরোধের জন্য মাটির নীচেও এর চারটি তলা আছে। একতলা বা প্রথম তলাটা হচ্ছে পাতাল-পথ। দ্বিতীয় তলায় আছে গ্যারেজ, তৃতীয়তলায় ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, টাকা বদলের কাউণ্টার প্রভৃতি, চতুর্থতলায় আর্কেড বা বাজার, খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। জমির ওপরে পঞ্চমতলায় হচ্ছে এনকোয়্যারি বা অনুসন্ধান অফিস এবং ব্যাংকোয়িট-হল (Banquet-Hall) আর ষষ্ঠতলা হচ্ছে লবি-ফ্লোর বা দালান। এখানে আছে একটা রিসেপশন কাউণ্টার কিছু দোকানপাট। সেখানে বিক্রি করা হয় ট্রানজিস্টর, টেপ রেকর্ডার, ঘড়ি, ক্যামেরা, ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি। একটা কিউরিও শপ এবং একটা জুয়েলারি দোকানও আছে। এখানে বিক্রি হয় মুক্তা ও মুক্তার গহনা। আর রয়েছে কাঁচঘেরা বিরাট একটা হলঘর—হলঘরে পাতা আছে সোফা, কৌচ, ডিভান, ইজিচেয়ার, চেয়ার এবং টেবিল। একটা র‍্যাকে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানা রকম দৈনিক, পত্র-পত্রিকা এবং বই।

এই ঘরে বসে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল বর্ণের সুয়িমিং পুলটি। একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত এবং চারতলা থেকে ছয়তলা পর্যন্ত ওঠা-নামা করার জন্য সাধারণ সিঁড়ি ছাড়া চলন্ত সিঁড়িও আছে।

এই হোটেলে শোবার, খাবার, স্নানের ঘর, ব্যাংকোয়িট হল্, বার, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট প্রভৃতি মিলিয়ে সবসুদ্ধ মোট ২১০০টি ঘর আছে। সবচেয়ে বড় ব্যাংকোয়িট হল্টাতে একসঙ্গে প্রায় ৩০০ লোক ধরে। এই হল্গুলিতে সভা-সমিতি, ভোজ পর্ব ছাড়াও জাপানী প্রথায় বিয়ের ব্যবস্থাও করা হয়।

মুখার্জীদাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চারজনে লিফটে করে ৪০ তলার টাওয়ারে উঠলাম ছোট-হাজরি সারতে। এখানে অনেকগুলি রেস্তোরাঁ এবং বার আছে। দেখি টপ অফ দ্য টাওয়ার নামে একটা রেস্তোরাঁতে লেখা আছে বুফে রেস্তোরাঁ অর্থাৎ টেবিলের ওপরে নানা রকমের খাবার সাজানো আছে। ইচ্ছামত নাও আর খাও। আমরা ভেতরে ঢুকে কাউণ্টারে আমাদের কুপন জমা দিতে গেলাম—কিন্তু সেখান থেকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হল। কারণ অত কম খরচে ওখানে খাবার মেলে না। মাত্র চার ডলারে মিলবে কন্টিনেণ্টাল ব্রেকফাস্ট। একজন ওয়েট্রেস দয়াপরবশ হয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল স্থালন বেল্লে ভিউ রেস্তোরাঁ। কাঁচের দরজা ঠেলে, ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম ঘরের ভেতরে। ওয়েট্রেস স্বাগত জানিয়ে আমাদের বসবার আসন দেখিয়ে দিল এবং কুপন সংগ্রহ করে আমাদের খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল।

এই ঘরের দেওয়ালগুলি কাঁচের এবং সীলিং প্লাইউডের। ঘরের মেঝেতে পাতা রয়েছে পুরু কার্পেট। ঘরে ঢুকলেই পা বসে যায়। দরজা এবং জানালায় ঝুলছে রেশমের কাজ করা ভেলভেটের পর্দা। কাঁচের দেওয়ালে আঁকা রয়েছে উড়ন্ত পাখিদের ছবি। ঘরের চার কোণে ঝুলছে নানা রকমের ফুলের তোড়া, আর সীলিংয়ে ঝুলছে রঙীন কাগজের তৈরি ঝাড়বাতি। খাবার টেবিলের ওপরে ফুলে ভরা ফুলদানি রাখা হয়েছে, আর গেলাসে পাখির মত করে ন্যাপকিন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরে বসে একটা মডেলের মত সারা শহরটাকে দেখতে পাচ্ছি।

ছোট-হাজরি এলো—চার গেলাস কমলা লেবুর রস, একটা বোল ভরতি গোল চাকার মত করে কাটা বেশ বড় সাইজের সেঁকা পাউরুটি, একটা প্লেটে কিছু বাটার কিউব। আমার জন্য এলো এক প্লেট ডিমের পোচ, সাহাদা এবং মুখার্জীদার জন্য তু'প্লেট ডিমের ওমলেট আর সিং-এর জন্য এক প্লেট

ভেজিটেবল কাটলেট। আর মার্মালেড (Marmalade) তো টেবিলে রয়েছেই। ছখানার বেশি রুটি কেউ খেতে পারলাম না, তবে মার্মালেডের পাত্র নিঃশেষ। শেষে এলো একটা পটে চার কাপের মত কফি, একপাত্র দুধ, চারটে ক্রীমের টিউব ও একটা বাটিতে কিছু সুগার কিউব। সাহাদার ইঙ্গিতে ক্রীমের টিউব চারটে এবং কিছু সুগার কিউব আমরা পকেটস্থ করলাম।

এখন সকাল নটা। ছয়তলার লবিতে নেমে এসে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি সেখানে মিস্টার রাও ও মিসেস লালকাকাতে তুমুল ঝগড়া লেগেছে। মিস্টার রাও বলছেন—এটা তোমার জানা উচিত যে, আমরা সকলেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, দেশে আমাদের কারো পয়সার অভাব নেই অথচ এখানে আমরা কপর্দকশূন্য হয়ে ভিখারির মত ঘুরে বেড়াব, এটা কেমনধারা কথা। সুতরাং ঐ একশো ডলারগুলি আমাদের কর্জ হিসাবে দেওয়া হোক।

ব্রেকফাস্টের পর শুনলাম সাহাদা এবং মুখার্জীদা মার্কেটিং করতে যাচ্ছেন নিহমবাশিতে (Nihombashi)। ওঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বোসদা, যাবেন না কি আমাদের সঙ্গে ?

আমি জানতে চাইলাম গাড়িতে করে না পায়ে হেঁটে ?

উত্তর পেলাম, পাতাল-রেলে করে।

আমি বললাম, আমার অবস্থা তো জানেন, আমাকে কিছু কর্জ দিতে হবে।

ওঁদের কাছে বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা থাকা সত্ত্বেও ওঁরা পাশ কাটালেন।

সিং বলল, বোস, দুঃখ কোরো না বা পয়সার জন্য চিন্তা কোরো না, চল, আমরা টোকিও টাওয়ার প্রভৃতি যা যা দেখা সম্ভব ঘুরে দেখে আসি।

আমি প্রস্তাব করলাম যাবার সময় পায়ে হেঁটে দেখতে দেখতে যাব, আর ফেরার সময় বাসে করে কিম্বা পাতাল-রেলে ফিরব।

সিং রাজী হল। আমরা চললাম প্রথমে টোকিও টাওয়ার দেখতে।

হোটেল থেকে কিছু দূর এসে রাস্তা পার হবার সংকেত না পেয়ে দাঁড়ালাম একটা চৌরাস্তার মোড়ে। এখানেও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কলকাতার মত প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে সাংকেতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। হঠাৎ দেখি মাথার ওপর দিয়ে ৪।৫টা বগিযুক্ত মনো-রেল যাচ্ছে।

মনো-রেল (Mono-Rail) ঃ এটি একটি ওভারহেড রেলপথ। সারা রেলপথটা কংক্রীটের তৈরি এবং সেটা মাথায় করে ধরে রেখেছে একপায়ে খাড়া সারি সারি কংক্রীটের স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলি দেখতে ইংরেজী টি অক্ষরের

মত। টোকিও শহরের হামামাৎস্থ-চো (Hamamatsu-Cho) স্টেশন থেকে টোকিওর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হানেডা (Haneda) পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার বা ৮ মাইল দীর্ঘ পথে মনো-রেলের উদ্বোধন হয় ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে। এই পথ অতিক্রম করতে এর সময় লাগে মাত্র ১৫ মিনিট।

পাহাড়ের যেমন দূরত্ব বোঝা যায় না, টোকিও টাওয়ারও যেন সেই রকম। হাঁটছি তো হাঁটছিই, হাঁটার যেন আর শেষ হয় না। টাওয়ার যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কখনও সে লুকোচ্ছে কোন স্কাইস্ক্র্যাপারের পিছনে আবার কখনও বা লুকোচ্ছে কোন গাছের আড়ালে। শেষ পর্যন্ত একটি জাপানী ছাত্রীর সহায়তায় যখন টাওয়ারে পৌছলাম তখন রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

টোকিও টাওয়ার (Tokyo Tower): বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর এই লৌহস্তম্ভটি বিরাট একটি দৈত্যের মত চার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে ভরা শিবা পার্কের জমির ওপর। অবিকল প্যারিসের ইফেল (Eiffel) টাওয়ারের অনুরূপ। আমেরিকার কথা বাদ দিলে বিশ্বের এই জাতীয় স্তম্ভগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে উঁচু। এটির উচ্চতা ১০৯২ ফিট, ইফেল টাওয়ার ১০৪৯ ফিট, মিউনিকের অলিম্পিক টাওয়ার ৯৫১½ ফিট, দিল্লীর কুতুবমিনার ২৮৮ ফিট, আগ্রার তাজমহল ১৭৮ ফিট এবং কলকাতার শহীদ মিনার ১৫২ ফিট। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ রেডিও ও টেলিভিশন প্রেক্ষণ কেন্দ্র। এই টাওয়ারটি নির্মিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে। ভূমিকম্প আর টাইফুন হচ্ছে জাপানীদের নিত্য সাথী, কিন্তু এটি এমন ভাবে নির্মিত হয়েছে যাতে ভূমিকম্প বা টাইফুন এর কোন ক্ষতি করতে না পারে।

এর দুটি মানমন্দির আছে। প্রথমটি ৪৯০ ফিট ওপরে এবং দ্বিতীয়টি ৮২০ ফিট ওপরে। আর এর রেডিও এবং টেলিভিশন প্রেক্ষণ কেন্দ্রটি হচ্ছে একেবারে শিখরে, অর্থাৎ ১০৯২ ফিট ওপরে। এই টোকিও টাওয়ারটি বর্তমান জাপানের গর্বের বস্তু। জাপানের আরও কয়েকটি বড় শহরে এই রকম টাওয়ার আছে, তবে সেগুলি এত উঁচু নয়।

৪০০ ইয়েন খরচ করে সিং দুখানা টিকিট কিনে নিয়ে এলো। এলিভেটরে করে আমরা উঠে এলাম ৪৯০ ফিট ওপরে প্রথম মানমন্দিরে। প্রায় ২০।২৫ ফিট চওড়া শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটি বারান্দা চক্রাকারে বেষ্টন করে রয়েছে টাওয়ারটিকে। সমস্ত বারান্দাটি কাঁচ দিয়ে ঘেরা, তাই কি নিকটের, কি দূরের সবকিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি। বারান্দার এখানে ওখানে ১০।১৫টি টেলিস্কোপ বসানো

রয়েছে। এ কটিতে চোখ লাগালাম, কিছুই দেখতে পেলাম না। পাশের এক ভদ্রলোক সামনের একটি বোর্ডের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দেখি তাতে লেখা আছে—২০ ইয়েন ঐ টেলিস্কোপের ফোঁকরে ফেলে দিলে, তিন মিনিটের জন্য টেলিস্কোপের আই-পীসটার আবরণ উন্মোচন হবে। সিং-এর কাছ থেকে বিশ ইয়েন নিয়ে টেলিস্কোপের ফোঁকরে ফেলা মাত্র সরে গেল আই-পীসের আবরণটা। এতক্ষণ যেগুলিকে ছোট এবং অস্পষ্ট দেখছিলাম, সেগুলি এখন বৃহদাকার হয়ে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। টোকিও উপসাগর এখন আমার কত কাছে এসে গেছে—ঐ তো ইজু এবং বসো উপদ্বীপ দুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টেলিস্কোপটা একটু অন্য পাশে সরাতে চোখের সামনে ভেসে এলো বরফাচ্ছাদিত ফুজি পর্বতমালা। টেলিস্কোপের মুখটা একটু নীচু করতে দেখতে পেলাম টোকিও শহর। ঐ তো শহরের বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট, লোক চলাচল, যানবাহন চলাচল সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমন কি স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদও বেশ বুঝতে পারছি। এই যাঃ! তিন মিনিট হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আই-পীসের কপাটও আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সিং বলল, খুব তেষ্টা পেয়েছে, চল, এই মানমন্দিরের রেস্তোরাঁতে বসে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিম্বা আইসক্রীম যা হোক কিছু খাওয়া যাক। দুজনে দুটো চকো-ফ্রুটস্ আইসক্রীম নিলাম। দাম পড়ল ৪০০ ইয়েন অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ১২ টাকা।

এলিভেটরে করে আমরা ক্রমশ নীচে নামছি। ছয়তলায় পড়ল রেডিও টি-ভির ব্রডকাস্টিং হল এবং বিভিন্ন রেডিও ও টি-ভি কোম্পানির অফিস। পাঁচ-তলায় টেলি-কমিউনিকেশন এবং ব্রডকাস্টিং-এর নানান্ রকম প্রদর্শনী। নিপ্পন ইলেকট্রিক কোম্পানি এবং টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানির নানান্ রকম ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির একটা যৌথ প্রদর্শনীও আছে। একটা ফোয়ারা আছে। তার গায়ে লেখা রয়েছে তোশিবা কোম্পানি। সেখানে সঙ্গীত, জল, আলো—সবই বিজলীতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলছে। আমরা চারতলায় নেমে এসে ঢুকলাম খেলার ঘরে। এখানে টিকেট মূল্য কত লাগল সিং তা আমাকে জানাল না।

হল্ অফ গেম্স (Hall of Games): এখানে রয়েছে মজার মজার বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা। কোন খেলায় আপনি নির্দিষ্ট পয়েন্ট মাত্রায় পৌঁছতে পারলে এদের কাছ থেকে পুরস্কার পাবেন। কোনটা বা নিজেদের মধ্যে বাজি

ধরে খেলা, আবার কোনটা বা আত্মতৃপ্তির খেলা। প্রত্যেক খেলার জন্য পয়সা দিতে হয়। চলুন ঐ মোটর ড্রাইভিং খেলাটার কাছে। বসে পড়ুন ড্রাইভারের সীটে। কি দেখছেন, ঐ তো সামনের ড্যাশবোর্ডে স্পীডোমিটার, মাইলমিটার সবই রয়েছে। গীয়ার খুঁজে পাচ্ছেন না, ঐ তো ষ্টীয়ারিং-হুয়িলে লাগানো রয়েছে। আর ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাক্সেলারেটর সবই রয়েছে পায়ের কাছে। নিন, এবার ঐ ফোঁকরে ৫০ ইয়েন ফেলে দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিন। নিন, এবার গীয়ার চেঞ্জ করুন, তারপর অ্যাক্সেলারেটর চেপে স্পীড দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ষ্টীয়ারিং হুয়িলটা ডাইনে কাটান, বাঁয়ে কাটান। এ কি! আপনি বাতির লাল আলোর সঙ্কেত অমান্য করে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করলেন! আপনার কিছু নম্বর কাটা গেল। আরে গেল গেল - যাক, ছেলেটা বেঁচে গেল, কিন্তু আপনি আর একটা গাড়িতে ধাক্কা মারলেন। আবার আপনার নম্বর কাটা গেল। কি হল, গাড়ি থেমে গেল? যাবেই তো, পাঁচ মিনিট যে পার হয়ে গেছে। নিন, এইবার হিসাব করুন পাঁচ মিনিটে কত কিলোমিটার পথ এসেছেন এবং তাতে কত পয়েন্ট পেয়েছেন। তবে দুবার ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করার জন্য কিছু পয়েন্ট বাদ যাবে। না না, যোগ-বিয়োগ আপনাকে করতে হবে না। তার জন্য সামনেই ঐ কম্পিউটার রয়েছে।

ভাবছেন আপনি গাড়ি চালিয়েছেন? না, মোটেই তা নয়। আপনি অনড় হয়ে বসে ছিলেন মোটরের ঐ সীটটার ওপরে। যেই গাড়িতে স্টার্ট দিলেন, অমনি আপনার সামনের এবং দু'পাশের দেওয়ালে টাঙানো সাদা পর্দাগুলিতে ফুটে উঠল সিনেমার মত চলমান পথের ছবি। গাড়ির স্পীডের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হু হু করে দ্রুত চলে যেতে লাগল পিছনের দিকে। সৃষ্টি হল মায়াজালের, আর আপনি ভাবলেন যে আপনিই গাড়ি চালাচ্ছেন!

এবার এসেছি একটা বক্সিং-রিং-এর কাছে। রিং বলতে গোলাকার একটা কাঁচের আধার। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রবারের একটা ডামি পুতুল। আপনি ওকে আঘাত করবেন, ও কিন্তু আপনাকে আঘাত করবে না। ও কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করবে। সিং ঐ আধারের ফোঁকরে নির্দিষ্ট ইয়েন ফেলল। বেরিয়ে এলো দস্তানা পরা দুটো কৃত্রিম হাত। তারপর ঐ আধারের একটা বোতাম টিপে ঐ দস্তানা-পরা হাত দুটো দিয়ে ডামিটার নাকে, মুখে এবং পেটে আঘাত করার জন্য সিং দশবার চেষ্টা করল। কারণ নাকে, মুখে কিম্বা পেটে আঘাত করতে না পারলে আপনি পয়েন্ট পাবেন না। সিং-এর মাত্র দুটো

আঘাত সফল হল। একটা লাগল মুখে এবং অপরটা পেটে। আর বাকি আটটা বিফল হল। আমিও চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি একটিও আঘাত করতে পারলাম না।

এরপর এলাম যুদ্ধক্ষেত্রে। এখানে বিমান-বিধ্বংসী কামান (অ্যান্টি এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট গান) ছোড়ার খেলা হয়। এর কাঁচের আধারটা আকারে বেশ বড়। আধারের ভেতরে টাঙানো রয়েছে সিনেমা দেখাবার একটা সাদা পর্দা। এক ভদ্রলোক ঐ আধারের ফোঁকরে নির্দিষ্ট ইয়েন ফেলে দিতেই পর্দায় ফুটে উঠল একটি যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। আকাশে উড়ছে ফাইটার, বম্বার প্রভৃতি সামরিক বিমান। দু'পক্ষের বিমানের দু'রকম রং। ধরুন আপনার পক্ষের বিমানগুলির রং হচ্ছে সাদা আর শত্রুপক্ষের বিমানগুলির রং সবুজ। আপনার হাতের কাছে রয়েছে টেলিস্কোপ লাগানো একটি অ্যাক্ অ্যাক্ কামান। কামানটা ইচ্ছামত এদিক ওদিক ঘোরানো যায়। আপনার কাজ হচ্ছে টিপ করে বোতাম টিপে শত্রু বিমানকে ধ্বংস করা। কোন বিমানে গোলা লাগলেই সেটা জ্বলে উঠবে। এই রকম পাঁচটা শত্রু বিমান ধ্বংস করতে পারলে আপনি একটা পুরস্কার পাবেন। তবে সাবধানে গোলা চালাবেন। নিজের পক্ষের বিমানে গোলা লাগলে কিন্তু আপনার পয়েন্ট কাটা যাবে।

এরপর ফুটবল খেলা। কাঁচের ঘেরাটোপ দেওয়া সবুজ রঙের বেশ বড় একটা টেবিলের মাঝখানে একটি বৃত্তের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এগারোজন করে দু'পক্ষের বাইশজন খেলোয়াড় পুতুল। এটা হচ্ছে সেণ্টার লাইন। দু'পক্ষের খেলোয়াড়দের গায়ে দু'রকম জার্সি। প্রতি পক্ষের জার্সিতে এক থেকে এগারো অবধি নম্বর লাগানো আছে। আর টেবিলের উভয় দিকেই এক থেকে এগারো পর্যন্ত নম্বর দেওয়া মোট বাইশটা বোতাম আছে। টেবিলের ফোঁকরে ফেলে দিন নির্দিষ্ট ইয়েন। দেখবেন বোর্ডটা এবং পুতুলগুলি সব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এইবার আপনার দিকের বোতামগুলি টিপে টিপে আপনার ইচ্ছামত সাজিয়ে নিন আপনার খেলোয়াড়দের এবং তাদের দিয়ে বলে কিক্ করান। আপনার বিপক্ষও তাঁর দিকের বোতাম টিপে টিপে তাঁর পক্ষের খেলোয়াড়দের দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবেন এবং বলে কিক্ করাবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পক্ষ বেশি গোল দেবে সেই পক্ষই জিতবে। বলটিতে এবং পুতুলগুলিতে চুম্বক লাগানো আছে, আর খেলার বোর্ডটি তৈরি করা হয়েছে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেটিক্ পদ্ধতিতে। এই রকম বেস-বল, ভলি-বল, বাস্কেট-বল, জুডো প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট রকমের খেলার

বোর্ড আছে এখানে। সারাটা দিন হৈ হৈ করে কাটাবার ভারি সুন্দর একটি জায়গা।

এই বাড়ির তিনতলায় একটি ওয়্যাক্স মিউজিয়াম বা মোমের পুতুলের যাদুঘর আছে। লণ্ডনে একটি অতি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে মাদাম তুসোঁর ওয়্যাক্স মিউজিয়াম। সিং ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বহু দিন লণ্ডনে ছিল আর আমিও ১৯৭২ সালে লণ্ডনে গিয়ে ঐ যাদুঘরটি দেখেছি। সিং জিজ্ঞাসা করল, বোস, এখানকার যাদুঘরটাও দেখবে না কি ?

লণ্ডনে মাদাম তুসোঁর যাদুঘর আমার খুব ভাল লেগেছিল, তাই সিংকে জানালাম, দেখলে মন্দ হয় না।

তিনতলায় নেমে এসে দেখলাম, যাদুঘরে প্রবেশ করার টিকেট বিক্রির জন্য দুটি কাউণ্টার রয়েছে। দুটি কাউণ্টারে একই রকম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিতা দুজন তরুণী বসে আছে। একটিতে বেশ ভিড়। অপরটি প্রায় খালি, মাত্র ২।৪ জন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সিং খালি কাউণ্টারে গেল টিকেট কাটতে। ঐ কাউণ্টারের লোকগুলি মৃদু হেসে পিছিয়ে এসে সিংকে আগে টিকেট কাটার সুযোগ করে দিল। সিং টিকেটের মূল্য দিয়ে দুখানা টিকেট চাইল তরুণীটির কাছে। কিন্তু তরুণীটি চুপচাপ, মুখে কোন কথাবার্তা নেই। সিং কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে এসে বিরক্ত হয়ে বলল, এখানকার মেয়েগুলো কি কুড়ে, কর্মস্থলে বসে বসেই ঘুমোচ্ছে! তারপর আমাকে অনুরোধ করল টিকেট কিনে আনার জন্য। আমি গেলাম সেই খালি কাউণ্টারে। কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দেখি তরুণীটি মৃদু নাসিকা গর্জন করে ঘুমাচ্ছে। এইবারে সেই লোকগুলি আমার দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠল। তখন অপর কাউণ্টারের লাইন থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, ওটা একটা লোক-ঠকানো কাউণ্টার, আসলে ঐ তরুণীটি একটি মোমের পুতুল। বোকার হাসি হেসে অপর কাউণ্টারের কিউয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর ১০০ ইয়েন করে দুখানা টিকেট কিনে ফিরে এসে সিংকে সবিস্তারে আমি সব জানালাম।

সিং বলল, বোস, তোমার মনে আছে, লণ্ডনের ওয়্যাক্স মিউজিয়ামের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মাদাম তুসোঁর একটা প্রতিমূর্তি হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্বাগত জানায় ?

উত্তরে জানালাম, বেশ মনে আছে। ঐ মূর্তিটি তাঁর মৃত্যুর আট বছর আগে তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৮১ বছর।

ওয়্যাক্স মিউজিয়াম (**Wax Museum**):—দরজা ঠেলে দালানে প্রবেশ করতেই দেখি একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার দু'পাশে। দালানে পা দেওয়া মাত্র ওরা দুজনে কোমর ঝুঁকিয়ে এবং হাত প্রসারিত করে আমাদের স্বাগত জানাল। লণ্ডনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম যে এরা আসল নয়, নকল। দুটি মোমের পুতুল। প্রথমে যে ঘরটাতে ঢুকলাম সেখানে রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রতিমূর্তি—রুজভেল্ট, রবার্ট কেনেডি, নিক্সন, চার্চিল, রাণী এলিজাবেথ, সেক্সপীয়ার, বায়রণ, সম্রাট হিরোহিতো, তোজো, মিকি, মাও-সে-তুং, হো-চি-মিন, স্ট্যালিন, লেনিন প্রভৃতি। গর্বে বুক ভরে গেল আমাদের দেশের গান্ধীজী, নেহেরুজী এবং রবীন্দ্রনাথের তিনটি মূর্তি দেখে। ক্রীড়াবিদ এবং চিত্রতারকাদেরও প্রতিমূর্তি আছে এখানে—হবস্, ডন্ ব্র্যাডম্যান, ওরেল, পেলে, গ্রেটা গার্বো, চার্লি চ্যাপলিন, লরেল এবং হার্ডী প্রভৃতির মূর্তি দেখলাম।

আর একটা হলঘরে এলাম। আলো, আঁধার ও শব্দের মায়াজাল বিস্তার করে যে কি কুহেলিকা সৃষ্টি করা যায়, তাই দেখানো হয়েছে এখানে। হলের এক কোণ থেকে কানে ভেসে এলো মধুর প্রেমালাপের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি। সেখানে আলোকপাত হতে দেখা গেল একজোড়া যুবক-যুবতী আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে প্রেমালাপ করছে। দ্বিতীয় কোণায় আলোকপাত হতে দেখা গেল মোটর রেস্ হচ্ছে। আলোক সম্পাত হয়েছে চালক সমেত মোটর গাড়িগুলির ওপরে। মোটর চলার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তৃতীয় কোণায় দেখলাম চন্দ্রাভিযানের দৃশ্য। চন্দ্রাভিযাত্রীরা রকেটে চেপে চলেছে মহাকাশে। প্রথমে হল রকেট উৎক্ষেপণের কর্ণবিদারক শব্দ। তারপর সেই শব্দ ক্ষীণ হতে হতে মহাশূণ্যে মিলিয়ে গেল। আর চতুর্থ কোণায় দেখলাম অতি করুণ একটি দৃশ্য—দুর্বৃত্তরা একজন নারীকে জোর করে ধর্ষণ করছে। নারীটির কাতর আর্তনাদে এবং দুর্বৃত্তদের হুঙ্কারে সমস্ত শরীর রাগে কাঁপতে লাগল।

হল্ অফ হররস্ (**Hall of Horrors**): এটা আর একটা ঘর। এর দরজায় লেখা রয়েছে 'ছোট ছেলেমেয়েদের প্রবেশ নিষেধ'। এখানেও সেই আলো, আঁধার এবং শব্দের সাহায্যে কুহেলিকা সৃষ্টি করা হয়েছে। যত সব বীভৎস দৃশ্য রয়েছে এই হলঘরে। মেরী অ্যাণ্টয়নেট, তাঁর স্বামী ফরাসীরাজ লুই এবং তাঁদের পুত্রকন্যাদের গিলোটিন-এর দৃশ্য। ওঁরা ভয়ার্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, আর ওঁদের মাথার ওপর ধীরে ধীরে নেমে আসছে শাণিত ভারী

খাঁড়াটা! দেখলাম অব্রাহাম লিঙ্কন হত্যার দৃশ্য—প্রেসিডেন্ট সস্ত্রীক প্রেক্ষাগৃহের একটি বক্সে বসে মনোযোগ সহকারে অভিনয় দেখছেন। এমন সময়ে বক্সের পিছনের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো একটি বন্দুকের নল। চকিতে দেখা গেল গুপ্তঘাতককে। গর্জে উঠল তার বন্দুক। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন এবং তাঁর পত্নী। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ হতভম্ব। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি দৃশ্য—চতুর্দিক অন্ধকার, হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল, শুরু হল সৈন্যদের ছুটোছুটি এবং তৎপরতা। তারপর বিমান আক্রমণের আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ও কামানের গর্জন। সৈন্যদের মাটিতে মুখ লুকানো, আহত সৈনিকদের আর্তনাদ, অ্যাম্বুলেন্স চলাচলের শব্দ, সে এক বীভৎস দৃশ্য। মনে হয় আমি যেন কোন রণক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে আছি!

আর এক জায়গায় দেখি কয়েকজন দুর্বৃত্ত পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করছে একটি পরিবারের সকলকে। পরিবারের লোকজনদের বিহ্বল দৃষ্টি ও ভয়ার্ত আর্তনাদ এবং দুর্বৃত্তদের বীভৎস রূপ ও বিকট চিৎকার আপনাকে নিশ্চয়ই ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবে।

তারপর দেখলাম ফ্র্যাঙ্কেন্‌স্টাইন-এর বীভৎস মূর্তি। রক্তচোষা কাউণ্ট ড্র্যাকুলার পৈশাচিক মূর্তি। তার চোয়াল বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। দেখলাম মধ্যযুগের বিভিন্ন ধরণের অত্যাচারের দৃশ্য—করাত দিয়ে মানুষ কাটা হচ্ছে—ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে তার রক্ত। মানুষের পিঠে হুক ফুঁড়ে দিয়ে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালে। ইত্যাদি আরও যা আছে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এখানেই শেষ করছি। মানুষ সমান ওই মূর্তিগুলির খুব কাছাকাছি না এলে বোঝাই যায় না যে এগুলি আসল না নকল।

হল্ অফ হররস্ থেকে বেরিয়ে এক জায়গায় দেখি অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী বেশ পরিবর্তন করছে। গোপন উৎস থেকে আসা জোরালো হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে তার পোশাক। যুবতীটি বার বার বেসামাল হয়ে পড়ছে। আর এক সুশ্রী যুবক আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আদেখলের মত উপভোগ করছে ঐ সুন্দরী যুবতীর অর্ধনগ্ন দেহের রূপলাবণ্য। দু-তিনবার 'এক্সকিউজ মী' বলে তাকে আমাদের যাবার পথ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম, কিন্তু সে নির্বিকার দাঁড়িয়েই রইল। তখন তার পিঠে হাত রেখে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে ওটিও একটি মোমের পুতুল। আর ঐ যুবতীটির কাছে গিয়ে দেখলাম ওটি হচ্ছে সুন্দরী মেরেলিন মোনরোর প্রতিমূর্তি।

এই রকম ঠকেছি আর এক জায়গায়। একটি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আলুথালু বেশে ঘুমোচ্ছে অপরূপ সুন্দরী এক নারী। তার বক্ষাবরণ সরে গেছে, দেখা যাচ্ছে তার হৃদ্‌স্পন্দন। এক ভদ্রলোক রমণীটির বুকে একটি হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রমণীটির বক্ষস্থলের দিকে। সিং ও আমি বলাবলি করছি এও বোধ হয় একটা ডামি। তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠলেন, নো! আই অ্যাম্ রীয়্যাল্! অর্থাৎ—না, আমি সত্যিকারের মানুষ। আমিও আপনাদের মত একজন পর্যটক। আমি দেখছিলাম এঁর হৃদ্‌স্পন্দনটা সত্য না আমার দৃষ্টিভ্রম!

মোমের তৈরি এই পুতুলগুলি দেখতে দেখতে সত্যিই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। শুনলাম এই পুতুলগুলি সব মাদাম তুসোঁর সংগ্রহশালা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ইকেবানা (Ikebana Flower Arrangement) : এরপর শোফু ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেণ্ট স্কুল—এখানে পুষ্পসজ্জা শেখানো হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং অধ্যাপিকা মিসেস জোসুই ওশিকাওয়া আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন এবং জানতে চাইলেন আমাদের আসার উদ্দেশ্য। সবিনয়ে জানালাম যে, আমরা এসেছি আপনাদের পুষ্পসজ্জার রীতি-নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে জানালেন—ইকেবানা শিল্পীর উদ্দেশ্য হল পুষ্পের বহুমুখী ব্যঞ্জনার যে কোন একটি প্রতীককে ফুটিয়ে তোলা। শুধু ফুলই নয়, এর সঙ্গে লতা-পাতা, গাছের ডাল-পালা এবং গাছের শুকনো ছালও থাকে। এর নানা আইন-কানুন ও মাপজোখও আছে। ইকেবানার দু' রকম পদ্ধতি আছে, যথা :—'নাগেইরি' অর্থাৎ ছুঁড়ে দেওয়া আর 'মোরু' অর্থাৎ প্রাচুর্য।

তারপর মিসেস্ জোসুই ওশিকাওয়া প্রতীকরূপে ব্যবহৃত কয়েকটি পুষ্পসজ্জার পাত্র এনে আমাদের বোঝাতে লাগলেন—ইকেবানার মূল সূত্র হচ্ছে 'ইয়ো' আর 'ইন্'। ইয়ো হচ্ছে আলো বা জীবন, আর ইন্ হচ্ছে আঁধার বা মৃত্যু। ফুলের পাপড়ি বা লতা-পাতার সামনের দিকটা ইয়ো বা আলো আর পিছন দিকটা হচ্ছে ইন্ বা আঁধার, এই কথাটা মনে রেখে শিল্পীকে ফুল সাজাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যিক গঠনের মূল সূত্র হচ্ছে, সো—শিন্—তাই। অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল অথবা ঈশ্বর, মানুষ এবং মাটি। সারাদিনে মানুষের তিনটি রূপ প্রকাশ পায়। দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা এবং শুয়ে থাকা। নাগেইরিকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাতেরু এবং নাগেইরেরু আর মোরু থেকে হয়েছে মোরিবানা। এইবার কয়েকটি সজ্জিত পাত্র নিয়ে তিনি আমাদের বোঝাতে লাগলেন।

এই পাত্রটিতে ফুল সমেত তিনটি গাছের ডাল আছে। একটি বড়, একটি মাঝারি এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মাঝারি এবং ছোট ডাল দুটি একটু কাত করে লতা দিয়ে বাঁধা আছে বড় ডালটির সঙ্গে। এই সর্বোচ্চ ডালটি হচ্ছে স্বর্গ বা ঈশ্বর, মাঝারি ডালটি হচ্ছে মর্ত্য বা মানুষ এবং ছোট ডালটি হচ্ছে পাতাল বা মাটি।

তাতেরু (**Standing**)**:** এই পাত্রে ডাল-পালা, লতা-পাতা, ফুল সব খাড়া করে সাজানো হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে এটা মানুষের যৌবন কাল, তাই সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নাগেইরেরু (**Throwing in**)**:** এই পাত্রের ডাল-পালা, লতা-পাতা, ফুল সব হেলানো। অর্থাৎ মানুষের প্রৌঢ়ত্ব এসেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আর তার নেই, তাই সে হেলে পড়েছে।

মোরিবানা (**In abundance**)**:** এটি একটি চীনামাটির ট্রেতে সাজানো। এখানে ডাল-পালা, লতা-পাতা সব ফুল ভারে অবনত। এটি হচ্ছে পুষ্পসজ্জার 'শেষ প্রণামে'র ভঙ্গিমা। মানুষের বার্ধক্য এসেছে, সে ধরাশায়ী। তাই সে অবনত মস্তকে নিজেকে সমর্পণ করেছে দেবতার পদতলে।

শ্রীমতী ওশিকাওয়া আরও কয়েকটি মডেল দেখালেন আমাদের। যেমন: লতা-পাতা ঘেরা একটি আধফোটা গোলাপ। এটি হচ্ছে, 'তরুণের স্বপ্নে'র প্রতীক। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'র প্রতীকটি দেখলাম। একটি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপকে জড়ানো হয়েছে একটি শুকনো গাছের ডাল ও কিছু শুকনো গাছের ছাল দিয়ে। তারপর দুটি ধানের শীষ দেখিয়ে শ্রীমতী ওশিকাওয়া বললেন—এরা হচ্ছে এক কৃষক দম্পতি। ঐ ধানের শীষ দুটিতে কিছু কাঁটাগুল্ম জড়িয়ে উনি বললেন—এই কাঁটাগুল্মগুলি হচ্ছে জোতদার এবং মহাজনদের বেড়াজাল। কাঁটাগুল্ম দিয়ে জড়ানো ঐ ধানের শীষ দুটি এখন হল 'জোতদার এবং মহাজনের নাগপাশে বাঁধা একটি কৃষক জীবনে'র প্রতীক। সব শেষে দেখালেন—পূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত একটি পদ্মফুল আর তার পদতলে পড়ে থাকা ঝরা ফুলের কিছু পাপড়ি। এটা হচ্ছে 'বুদ্ধদেব এবং সেবকের' প্রতীক।

এবার শ্রীমতী ওশিকাওয়া জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা উঠেছেন কোথায়? উত্তরে জানালাম—উঠেছি, দ্যা নিউ উতানি হোটেলে। তিনি বললেন ওটা তো খুব মহার্ঘ হোটেল। আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম—সস্তা দরের কোন হোটেল তাঁর জানা আছে কি না? তিনি অনেকগুলি হোটেলের নাম করার পর

সেগুলি নাকচ করে দিয়ে বললেন—আপনারা কোন রিওকান-এ (Ryokan) যান। রিওকান হচ্ছে জাপানী পান্থনিবাস বা ধর্মশালা। সেখানে অনেক সস্তায় আপনাদের থাকা এবং খাওয়া হবে। আমরা বললাম—আমরা তো এখানকার পথ-ঘাট কিছুই চিনি না, কেমন করে যাব? তিনি পথ প্রদর্শকরূপে একটি ছেলেকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

রিওকান (Ryokan): ছেলেটি আমাদের নিয়ে এলো একটি বাগানের মধ্যে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত সুন্দর একটি জাপানী পান্থনিবাসে। এই পান্থনিবাসের কর্তৃত্ব ভার একজন মহিলার। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানালাম যে, আমরা ২।৪ দিনের জন্য এখানে থাকতে চাই, তাই যদি দয়া করে আমাদের কয়েকটি ঘর দেখান, তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হব। তিনি একজন পরিচারিকাকে ডেকে আমাদের কয়েকটি ঘর দেখাবার নির্দেশ দিলেন।

একটা ঘরের চাবি খুলে দিতে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, মেড বাধা দিল এবং হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আমাদের পায়ের কাছে, তারপর আমাদের জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। অপ্রস্তুত হলাম। কারণ এ কথা জানা আছে যে, জাপানীদের প্রথা হচ্ছে, ওদের ঘরে ঢুকতে গেলে, বাইরের জুতো খুলে রেখে, ওদের দেওয়া জুতো পরে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। মেড আমাদের জুতো খুলে নিয়ে দুজনকে দু'জোড়া ঘাস ও কাপড় দিয়ে তৈরি চটি-জুতা পরিয়ে দিল। তাই পরে আমরা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলাম।

এটা দুজন থাকবার মত ঘর। ঘরে খাট বা পালঙ্কের বালাই নেই। ঘর জুড়ে পাতা রয়েছে কারুকার্য করা বেশ পুরু টাটামি বা মাদুর। পরিচারিকা জানাল, আপনার পরিচর্যার জন্য সব সময়েই পাবেন একজন পরিচারিকা। সে এই টাটামির ওপরে আপনার বিছানা বিছিয়ে দেবে, গুটিয়ে দেবে, আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে দিয়ে যুকাতা (Yukata কিমোনোর মত দেখতে, পুরুষদের পোশাক) আপনাকে পরিয়েও দেবে।

ঘরের দরজা জানালায় ঝুলছে, সরুকাটির মাদুরের পর্দা। সেগুলির কোনটাতে আঁকা রয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্য, আবার কোনটাতে বা হিজিবিজি কি সব লেখা (Scrowl) রয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘড়ি, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন— সবই আছে। পরিচারিকা বলল, যদি জাপানী পারিবারিক পরিবেশ উপভোগ করতে চান তাহলে কয়েকদিন এখানে থেকে যান। এখানে আপনার ঘরেও খাবার পরিবেশন করার ব্যবস্থা আছে। তবে আমাদের এখানে একটা

অসুবিধা, এখানে কোন স্নানাগার নেই, আর আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সাধারণ পায়খানা।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে স্নান করব কোথায়? ও উত্তর দিল—সেণ্টো (Sento)-তে। বলে ও বুঝিয়ে দিল যে, ঐ বাগানের মধ্যে সর্বসাধারণের স্নান করার জন্য একটা পুকুর আছে। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বিবস্ত্র হয়ে একত্রে স্নান করে। এটাই হচ্ছে জাপানের প্রথা।

তারপর আরও কয়েকটি ঘর দেখার পর দেখতে চাইলাম ওদের খাবার ঘর। জাপানী ঘরোয়া পরিবেশে সুসজ্জিত বিরাট হলঘর। মাথার ওপরে কড়িকাঠে ঝুলছে টকটকে লাল কাগজে তৈরি বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন। অবিশ্যি তাতে ইলেকট্রিক বাল্ব লাগানো আছে। দরজায়, জানালায় ঝুলছে ছবি আঁকা সরুকাঠি মাদুরের পর্দা। মেঝেতে পাতা রয়েছে কারুকার্য করা বেশ পুরু টাটামি। ঘরের শেষ প্রান্তে রয়েছে ফলে-ফুলে ভরা একটি চেরি গাছ। ঘরের মেঝেতে আট দশটি লম্বা টেবিল পাতা আছে। টেবিলগুলির উচ্চতা দেড় থেকে তুই ফিটের মধ্যে এবং টেবিলের তু'পাশে চারটি করে আটটি এবং তু'প্রান্তে একটি করে সবশুদ্ধ মোট দশটি আসন পাতা আছে। টেবিলের ওপরে পাতা রয়েছে ধপধপে সাদা বিরাট টেবিল ক্লথ। আসনে হাঁটু গেড়ে বসে টেবিল ক্লথের প্রান্ত দিয়ে পা ঢেকে বসে খাওয়াটাই হচ্ছে এদের রীতি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—প্যাণ্ট পরা লোকেরা এ রকম করে বসে খাবে কি করে? ও জানালো—তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। এই বলে ও অপর একটি টেবিলের কাছে আমাদের নিয়ে গেল। টেবিল ক্লথের প্রান্তটা একটু সরিয়ে দিতেই দেখা গেল টেবিলের নীচে বিরাট গর্ত। ও বলল—আসনে বসে ঐ গর্তে পা ঝুলিয়ে দিলে, আশা করি আর কোন অসুবিধা হবে না।

অনেক বেলা হয়ে গেছে, এবারে হোটেলে ফেরা প্রয়োজন। সিং প্রস্তাব করল—স্নানটা এখানেই সেরে নেওয়া যাক, নতুবা হোটেলে ফিরে স্নান করে আহারাদি সারতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। বললাম, তেল, সাবান, তোয়ালে, কিছুই তো নেই আমাদের। সিং বলল—সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না। বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সিং পরিচারিকার কাছ থেকে তুটো তোয়ালে এবং সাবান নিয়ে এলো।

বাইরে বেরিয়ে দেখি আমাদের পথ প্রদর্শক যুবকটি ক্যাসাবিয়ানকার মত দাঁড়িয়ে আছে। যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ! উত্তরে সে জানালো—তোমরা নবাগত। তাই আমার ওপর অধ্যাপিকার

আদেশ আছে যে, তোমাদেরকে তোমাদের হোটেলগামী কোন গাড়িতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি নেই।

সেন্টো (Sento): সর্বসাধারণের স্নানাগার। প্রচণ্ড ভিড়। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এসেছে স্নান করতে। আজ রবিবার ছুটির দিন, তাই এত ভিড়। এত ভিড়, কিন্তু কোন হৈ-হট্টগোল নেই। পুকুরটি পাইন এবং চেরি গাছ দ্বারা বেষ্টিত। একটি পাইন গাছের ঝোপে জুতো, মোজা, জামা, প্যান্ট সব খুলে রেখে ছোট তোয়ালে দিয়ে কোন রকমে লজ্জা ঢেকে যুবকটির সঙ্গে গিয়ে ঢুকলাম প্রতীক্ষাগারে। যুবকটিও আমাদের সঙ্গে স্নান করবে। প্রতীক্ষাগারে সোফা কৌচ চেয়ার সব পাতা রয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে একটি পর্দার কাছে বসে আছেন এক জাপানী মহিলা। আমাদের তিনজনের প্রত্যেকের জন্য আটাশ ইয়েন করে মহিলাটিকে দিয়ে যুবকটি ঘরের পর্দা সরিয়ে আমাদের একটি দালানে নিয়ে এলো। সেখানে বাঁশের পার্টিশান দেওয়া সারি সারি খুপরি খুপরি অনেকগুলি ঘর রয়েছে। এই পার্টিশানগুলির উচ্চতা তিন সাড়ে তিন ফিটের বেশি হবে না। প্রত্যেক খুপরিতে রয়েছে, একটি করে জলের কল এবং বসে স্নান করার জন্য টুল।

যুবকটি বলল, যে কোন একটি খুপরিতে ঢুকে সাবান মেখে গায়ের ময়লা তুলে ফেলুন এবং মাথা ঘষে মাথার চুলগুলিকে তৈলমুক্ত করুন। কারণ জীবাণুমুক্ত পুকুরের জলকে সাবান বা কোন প্রসাধন দ্রব্য দ্বারা দূষিত করতে দেওয়া হয় না।

আমার এক পাশের খুপরিতে দিগম্বর হয়ে স্নান করছে সিং এবং অপর পাশের খুপরিত্রে দিগম্বরী হয়ে স্নান করছে একটি জাপানী তরুণী। দাঁড়িয়ে স্নান করার উপায় নেই। দাঁড়িয়ে স্নান করতে গেলেই বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে পাশের তরুণীর উন্মুক্ত বক্ষের সুডৌল দুটি মাংসপিণ্ডের ওপর। টুলে বসেও রেহাই নেই। সেখান থেকে বাঁশের পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তরুণীটির দেহের নিম্নাংশ।

ছোট ছোট চার-পাঁচটি কংক্রীটের তৈরি জলাশয় রয়েছে এখানে। আয়তনে বারো-চোদ্দ ফিট লম্বা, দশ-বারো ফিট চওড়া এবং তিন-চার ফিট গভীর। এই জলাধারগুলি নীল রং করা, ফলে এর জীবাণুমুক্ত জলকে বেশ স্বচ্ছ এবং নীল দেখাচ্ছে। এখানে মেয়ে, পুরুষ সকলেই একত্রে স্নান করছে, কেউই বিবসন নয়। মেয়েরা পরেছে বিকিনি আর পুরুষদের পরণে আছে জাঙ্গিয়া।

যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—কৈ, এখানে তো কাউকেও বিবস্ত্র হয়ে স্নান করতে দেখছি না। উত্তরে সে জানাল—পর্যটকদের, কুৎসিত দৃষ্টির জন্য শহর

থেকে এখন সে প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনও সাবেক প্রথা চালু আছে। আমি যুবকটিকে প্রশ্ন করলাম—এই নগ্ন হয়ে স্নান করার অর্থ কি? সে জানালো—স্নান করাটাকে আমরা শুচিতা ও ধর্মের একটা অঙ্গ বলে মনে করি। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা স্নান না করে আহার গ্রহণ করেন না। স্নানিকর অঙ্গাবরণ পরিত্যাগ করে আমরা বন্ধনমুক্ত এবং ক্লেদমুক্ত হয়ে স্নান করে ফিরিয়ে আনি আমাদের দেহের ও মনের শুচিতা এবং পবিত্রতা। স্নানের সময়ে পরস্পরের দেহের প্রতি আমাদের কোন মোহ বা আকর্ষণ থাকে না। সেই জন্য আমাদের মনে কোন কুভাবের উদয় হয় না। তাই আমরা বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন নিরাবরণ হয়ে একত্রে স্নান করতে কোন রকম সংকোচ বোধ করি না।

পাতাল রেল (**Tube Rail**) **:** পাতালে নেমে অবাক হয়ে গেলাম। মাটির নীচে যে এত বড় স্টেশন এবং এত প্রশস্ত রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম আছে তা কল্পনাও করতে পারিনি। একতলা, দোতলা এবং তিনতলা দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করছে। বিলেতেও টিউব রেলে চেপেছি, কিন্তু সেখানে এত বড় স্টেশন ভবন ও এত প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম দেখিনি। এ যেন এক গোলোকধাঁধায় এসে পড়েছি। কোথা থেকে যে ট্রেনে চাপব কিছুই বুঝতে পারছি না। যুবকটি আশ্বাস দিল—কিছু চিন্তা করবেন না। আমি দেখিয়ে দিলে সবই জলের মত সহজ হয়ে যাবে।

মার্কারি ল্যাম্পের আলোতে অন্ধকূপটাকে দিনমান করে রাখা হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে লাগানো বিরাট একটি কাঁচের বোর্ড দেখিয়ে যুবকটি বলল—ঐ দেখুন, ঐ বোর্ডে পাতাল রেলের তিনটি লাইনেরই ম্যাপ দেওয়া রয়েছে। ম্যাপে তিনটি লাইনে তিন রকম রং দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক লাইনের সবকটি স্টেশনের নাম জাপানী এবং ইংরেজী ভাষায় লেখা আছে। ম্যাপে যে লাইনের যে রকমের রং দেখছেন, সেই লাইনের গাড়িগুলির রংও সেই রকম।

তারপর সে স্টেশন ভবনের একটি দেওয়ালের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেখানে তীর চিহ্ন দিয়ে জাপানী এবং ইংরেজী ভাষাতে লেখা রয়েছে লাইনের নাম, কোন্ লাইনের গাড়ি কোন্ তলা থেকে ছাড়বে এবং কোন্ দিকে সেই প্ল্যাটফর্মে যাবার সিঁড়ি। আমাদের গাড়ির রং সবুজ, ছাড়বে একতলা থেকে, তাই চলন্ত সিঁড়ি করে আমরা নেমে এলাম একতলাতে। যুবকটি আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলল—ভাল করে দেখে গাড়িতে উঠবেন, এঞ্জিনের গায়ে লেখা থাকবে ট্রেনটা কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় যাবে।

এবার টিকেট কাটার পালা। এখানে কাউন্টারের বা টিকেট বিক্রির লোকের কোন বালাই নেই। যুবকটি আমাদের নিয়ে গেল একটি কাঁচের বাক্সের কাছে। তার গায়ে লেখা আছে কোথাকার টিকেটের কত মূল্য। সিং স্লট মেশিনের ফোঁকরে নির্দিষ্ট ইয়েন ফেলে দিয়ে বোতাম টিপতেই বেরিয়ে এলো আমাদের গন্তব্যস্থলে যাবার টিকেট। দুখানা টিকেটের জন্য এ কাজ তাকে দুবার করতে হল। তারপর ঘুরন্ত দরজা পেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম প্ল্যাটফর্মে। যুবকটি আমাদের দুজনকে এক ভদ্রলোকের হাতে সঁপে দিয়ে সায়োনারা (Sayonara) জানিয়ে বিদায় নিল। আমরাও কোমর নুইয়ে তাকে আরিগাতো (Arigato) বা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম।

পাঁচ মিনিট অন্তর এই ইলেকট্রিক ট্রেন, সুতরাং ট্রেনের জন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ট্রেন স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে তার দরজা খুলে গেল, আবার চলার পূর্বমুহূর্তে আপনা আপনিই তা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ যদি এই দরজা বন্ধ হতে না দেন তাহলে কিন্তু ট্রেন চলবে না।

গাড়িতে বেশ ভিড়, তাই আমরা দাঁড়িয়েই চলেছি। এই চলার ফাঁকে পাশের ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানতে পারলাম—জাপানের ছয়টি বড় শহরে এই পাতাল রেল আছে—টোকিও, ওসাকা, নাগোয়া, কোবে, ইয়োকোহামা এবং স্যাপ্পোরো। এই পাতাল রেলের গতিপথ কেবল মাত্র শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উপস্থিত অর্থাৎ ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই ভূগর্ভস্থ রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে মোট ২৭৭·৮ কিলোমিটার বা ১৭২·৫ মাইল। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা এসে গেলাম আমাদের নির্দিষ্ট স্টেশনে। ভদ্রলোক আমাদের হোটেলের দরজায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

এখন বেলা দেড়টা। জঠরানল জলছে। মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে সোজা চলে গেলাম রোজ-রুমে। গতকাল আমরা তিনজনেই ছিলাম আমিষভোজী, তাই তিনজনে সম্মিলিত ভাবে খাওয়াটা বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু আজ সিং নিরামিষাশী আর আমি আমিষাশী, তাই দুজনে যে যার রুচি অনুযায়ী খাবারের ফরমাশ করলাম। আমি খেলাম ভেজিটেবল স্যুপ, পাঁউরুটি ও মাখন, ভাত (আকারে জাপানীদের মত বেঁটে বেঁটে এবং বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা), তেম্‌পুরা (Tempura) অর্থাৎ শাক সব্‌জির সঙ্গে কাঁচা কুচো চিংড়ি ও কুচো মাছ দিয়ে রান্না করা গাঢ় ঝোল। আঁসটে গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি উঠে আসার যোগাড়। তবে ফ্রুট স্যালাডটা খেয়ে মুখ ছাড়ল। তারপর কফি পান করলাম।

চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে, চোখ জড়িয়ে আসছে। একটু দিবানিদ্রা দিলে মন্দ হয় না। সবে কি একটা স্বপ্নে বিভোর হয়েছি, এমন সময়ে মুখার্জীদার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মুখার্জীদা জানালেন, বোসদা, আপনার ফোন এবং নারী কণ্ঠ। আমি ভেবেই পেলাম না এখানে কে আমাকে ফোন করতে পারে, তার ওপর আবার নারী কণ্ঠে। তাই রসিকতা ভেবে আমি পাশ ফিরে শুলাম। মুখার্জীদা আবার ডাকলেন এবং বললেন—ফোনটা ধরেই দেখুন না, কথাটা সত্যি না মিথ্যা। তখন মনে পড়ে গেল সেই ভদ্রলোকের কথা, যাঁকে লিখেছিলাম, এখানে আমাকে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে সাহায্য করার জন্য। হয়তো তাঁর স্ত্রী বা কন্যা ফোন করছেন। অগত্যা উঠে গিয়ে ফোনটা ধরতে হল। রিসিভার কানে লাগাতেই শুনতে পেলাম—আমি লালকাকা বলছি। একবার আমার ঘরে আসবেন কি? একটু প্রয়োজন আছে।

শ্লীপিং ড্রেস পরেই লালকাকার ঘরে গেলাম। লালকাকা বসে বসে হিসাব-নিকাশ করছে। আমাকে বসতে বলে সে খাতাপত্র গুটোতে লাগল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—বোস্, আই অ্যাম্ সরি—অনেক হিসাব-নিকাশ করেও পঁচিশ ডলারের বেশি আমি কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারলাম না। এই নিয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং কথা দিতে হবে যে, এ কথা অন্য আর কেউ জানতে পারবে না।

নেই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল। এই কথা ভেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পঁচিশ ডলার নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকতেই মুখার্জীদা জিজ্ঞাসা করলেন —ব্যাপার কি? লালকাকার সঙ্গে এত পিরিত কিসের? মিথ্যা কথাই বলতে হল, বললাম—লালকাকা আমাকে কিছুই সাহায্য করতে পারবে না, তাই জানিয়ে দিলে।

আমি এখন ২৮ মার্কিন ডলার বা ৮৪০০ জাপানী ইয়েন বা ২৫২ ভারতীয় টাকার মালিক। সুতরাং মনটাও একটু প্রফুল্ল হয়েছে। সাহাদা বললেন— বিকেল চারটে হল, চা-পানের সময় হয়েছে। অথচ আমাদের কোম্পানি তো ইভনিং-টি বা বেড-টি কিছুই দেবে না, আর নিজেদের কিনে খাওয়ারও ক্ষমতা নেই, কারণ এক কাপ চা বা কফির দাম হচ্ছে এক মার্কিন ডলার বা ন' টাকা। তবে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে চা-টা আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারি। মনে মনে ভাবলাম—যদি তোমাদের কাছ থেকে কিছু কর্জ মেলে এই আশায় তোমাদের দুজনকে তো একটু তোষামোদ করতেই হবে। তাই

বললাম—বান্দা প্রস্তুত, আদেশ করুন জাঁহাপনা। তারপর সাহাদার আদেশ মত আমি প্যানে করে হীটারে জল বসালাম আর সাহাদা তাঁর স্যুটকেসের ভেতর থেকে বের করলেন চায়ের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম। আমাদের তিনজনের পকেট থেকে বেরুল সুগার কিউব ও ক্রীমের টিউব। এগুলি প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ে হাতসাফাই হয়েছে।

সিং আমাদের ঘরে এসে বলল, টোকিওতে তো অদ্যই আমাদের শেষ রজনী। সুতরাং সময় নষ্ট না করে চল, টোকিওর যে কোন একটা দ্রষ্টব্য স্থান দেখে আসি। তথাস্তু বলে আমরা চারজনে বেরিয়ে পড়লাম।

হিবিয়া পার্ক (Hibiya Park): আমরা এসেছি নাম করা একটি পার্কে। পার্কের প্রবেশ দ্বারের নোটিস বোর্ডে লেখা রয়েছে—৪১ একর বা ১২৪ বিঘা জমির ওপরে নির্মিত হয়েছে এই বাগানটি। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এর দ্বার খুলে দেওয়া হয় ১৯০৩ সালে। এই বাগানটি নির্মিত হয়েছে অর্ধেক জাপানী এবং বাকী অর্ধেক পাশ্চাত্য প্রথায়।

আমরা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাগানের ঘাসগুলি সব সমান করে ছাঁটা, মনে হচ্ছে কে যেন একটা বিরাট সবুজ কার্পেট পেতে রেখেছে। সবুজের বক্ষ ভেদ করে চলে গেছে টকটকে লাল নুড়ি পাথরের পথ। বাগানে ফুটে রয়েছে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ হরেক রঙের ফুল। রয়েছে নানা রকমের পাতাবাহারী গাছ। ভারী সুন্দর কনট্রাস্ট হয়েছে। বাগানটিকে সুন্দর একটি রঙীন ছবির মত দেখাচ্ছে।

জাপানী প্রথার বাগানে রয়েছে ফার্ণ, পাইন, চেরি প্রভৃতি বড় বড় গাছের সারি। আর ফুলগাছের মধ্যে রয়েছে যুঁই, বেলা, মল্লিকা, মালতী, টগর, গোলাপ, গাঁদা প্রভৃতি। মাঝে মাঝে লতা-পাতা গুল্মের ঝোপঝাড় রয়েছে। সেখানে বসে নিভৃতে প্রেমালাপ করার জন্য কাঠের বেঞ্চিও পাতা আছে। বেঞ্চিগুলির রঙ টকটকে লাল। আর রয়েছে কৃত্রিম নদী, নালা, হ্রদ, কৃত্রিম পাহাড় এবং ঝরণা। নদীর ওপরে রয়েছে টকটকে লাল রঙের সব পুল। হ্রদে এবং নদীতে ফুটে আছে অসংখ্য পদ্ম এবং নানা রঙের লিলি ফুল। হ্রদে এবং নদীতে নৌবিহারেরও ব্যবস্থা আছে। নানা রঙের ও নানা জাতের মাছ এবং রাজহাঁসের দল নির্ভয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে নদী এবং হ্রদের জলে।

লাল নুড়ি পাথরের পথের অপর পাশে হচ্ছে পাশ্চাত্য ধরণের বাগান। সেখানে বড় বড় গাছের মধ্যে রয়েছে উইলো, ওক্, রোজ-উড, ডগ-উড প্রভৃতি।

এই ডগ-উড গাছগুলি আমদানি করা হয়েছে আমেরিকা থেকে। ফুলগাছের মধ্যে রয়েছে ডেইজি, ফ্লক্, প্যানজি, হোলিহক, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি।

এক ভদ্রলোক বললেন—প্রতি বছর অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে এখানে চন্দ্রমল্লিকার বিরাট এক প্রদর্শনী বসে। সেই সময়ে সমগ্র বিশ্ব থেকে তাদের সেরা চন্দ্রমল্লিকা ফুলগুলি আনা হয় এই প্রদর্শনীতে। এখানেও মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আছে আর কৃত্রিম ঝরণার পরিবর্তে ফোয়ারা। রঙীন আলোর ফোকাসে ফোয়ারার জলরেণুগুলি রামধনু রং ছড়াচ্ছে। আরও রয়েছে একটা ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড সেখান থেকে মৃদুমন্দ হাওয়ায় কানে ভেসে আসছে সুমধুর অর্কেস্ট্রার সুর।

মোমের পুতুলের মত জাপানী ছেলেমেয়েরা রঙীন প্রজাপতি ধরার জন্য ছুটাছুটি করছে। কিশোর কিশোরীরা নানা রকম খেলাধুলায় ব্যস্ত। যুবক যুবতীরা কেউ বা খেলাধুলা করছে, কেউ বা অপরের বাহু বেষ্টন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার কেউ কেউ বা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঝোপেঝাড়ে বসে প্রেমালাপে মত্ত। আর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কেউ পায়চারি করছেন, কেউ বা বেঞ্চিতে বসে অতীতের স্মৃতিচারণ করছেন। এদের মহিলাদের সাজ-পোশাকে বেশ শালীনতা আছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার মহিলাদের মত পুরুষের রক্ত চঞ্চল করা পোশাক পরে না।

সূর্যমামা তার রক্তিম আভার জাল চতুর্দিকে বিস্তার করে ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে পাটে নামছেন। বিহঙ্গকুল ফিরে আসছে নিজ নিজ কুলায়। তাদের মধুর কাকলীতে সমস্ত বাগানটি মুখরিত। একটি দুটি করে তারার দল আকাশে ফুটে উঠল। জ্বলে উঠল বাগানের সমস্ত রঙীন বাতি। মনে হচ্ছে যেন বসে আছি এক ইন্দ্রপুরীতে। এমন সময়ে রসভঙ্গ করে হঠাৎ সাহাদা গেয়ে উঠলেন —হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার কর আমারে। আমিও সুর করে তার জবাব দিলাম—ফিরে চল, ফিরে চল, আপন ঘরে—

আমরা চলেছি ওপরের রাস্তা দিয়ে, ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে নয়। রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথে বসেছে অসংখ্য দোকান-পাট। তবে ফুটপাথ অবরোধ করে নয়। তারা বসেছে লোকজনের যাতায়াতের পথ রেখে। এই সব বিপণীতে জিনিসপত্রের দাম অপেক্ষাকৃত কম। এখানেও দেখি দোকানীরা হিসাব-নিকাশের জন্য কেউ কেউ ব্যবহার করছে 'অ্যাব্যাকাস্'।

'এলো আঁধার ঘিরে, পাখি এলো নীড়ে, তরী এলো তীরে'। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, আমরাও নীড়ে ফিরেছি। আমাদের নীড়ের আর্কেড বা বাজারটা ঘুরে

চলন্ত সিঁড়িতে চেপে উঠে এলাম ছয়তলার লবি ফ্লোরে। এখানে ড্রয়িং-রুমে এসে দেখি মিস্টার রাও ও মিসেস্ লালকাকাতে তুলকালাম কাণ্ড বেধেছে। সমর এবং বাসুদেব নীরব শ্রোতা হয়ে বসে আছে। মিস্টার রাও অনেক চেষ্টা করলেন আমাকে তাঁর দলে টানার জন্য। কিন্তু মিসেস লালকাকা পঁচিশ ডলার দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই, 'যঃ পলায়তি স জীবতি'। তারপর হাত-পা মুখ ধুয়ে গিয়ে ঢুকলাম রোজ রুমে আমাদের নৈশভোজের জন্য। সমর এবং বাসুদেবও এলো আমাদের সঙ্গে।

মুখার্জীদা এবং আমি আমাদের কুপন দুটি সাহাদাকে দিয়ে বললাম—আপনি একজন অভিজ্ঞ লোক, বেশ কয়েকবার কন্টিনেণ্ট এবং আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, সুতরাং আপনিই এই নৈশভোজের ব্যবস্থা করুন। তবে ড্রাই ফুড হওয়া চাই। কারণ মুখার্জীদা আজ আমাদেরকে সেক্ পান করাবেন বলেছেন। সেক্ আবার ভাতের সঙ্গে চলে না। মুখার্জীদা ওয়েট্রেসকে এক বোতল সেক্ এবং চারটি পাত্র আনতে বললেন। ওয়েট্রেস্ জানতে চাইল কড়া, মিঠে-কড়া এবং নরম, আপনারা কোন্‌টা নেবেন? সাহাদা মন্তব্য করলেন—মাঝামাঝিই ভাল। অতএব মিঠে-কড়াটাই নিয়ে এসো। তারপর সাহাদা খাবারের ফরমাশ করলেন,—চিকেন এগকর্ণ স্যুপ, হ্যাম স্টেক্ এবং ফ্রায়েড চিকেন। পাউরুটি ও মাখন স্যুপের সঙ্গেই দেবে এবং শেষ পদটির জন্য নেওয়া হল ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রি। আমি ঠাট্টা করলাম—ও মুখার্জীদা! সাকী যে সেক্ রেখে চলে গেল! উত্তরে তিনি বললেন—পয়সা খরচা করলে অমন অনেক সাকী পাওয়া যাবে, তবে সেটা যে যার নিজ নিজ খরচায়।

আহারান্তে সিং আমার কানে কানে বলল—বোস্, খাবার টেবিলে যে সাকীর কথা বলছিলে, চল না, নাইট ক্লাবে ঘুরে আসি। সিং-এর কথা জড়িয়ে গেছে, আমারও বেশ নেশা জমেছে, তাছাড়া ঘুমেও চোখ জড়িয়ে আসছে। সুতরাং সিংকে আমার অনিচ্ছা জানালাম এবং বললাম—যেতেই যদি হয়, তাহালে টুরের শেষে হংকং-এ যাব। বলে শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি ঘর রোদে ভরে গেছে। ঘরের দেওয়াল ঘড়িটার কোকিল দুটো কুক্ কুক্ করে ডেকে উঠল। চোখের পাতা মেলতেই সাহাদা এক কাপ গরম চা রাখলেন আমার বেডসাইড টেবিলের ওপরে। মনটা খুশিতে ভরে গেল। গেয়ে উঠলাম—'প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ হেরিনু, দিন যাবে আজি ভালো।'

ঘরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতে দেখি পথ-ঘাট রোদে ভরে গেছে। কিছু তরুণ-তরুণী মাথায় টুপি, মুখে মুখোশ, হাতে দস্তানা এবং পায়ে গামবুট পরে রাস্তা-ঘাট বাগান ব্রাশ দিয়ে পরিস্কার করছে। পরে মিসেস্ মাসার কাছে শুনেছি, এরা স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী। অবসর সময়ে এই রকম কাজকর্ম করে এরা এদের হাত-খরচের পয়সা উপার্জন করে। এখন সকাল ন'টা। আমরা নিত্যকর্ম সেরে অপেক্ষা করছি টোকিওর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য।

একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে টোকিওর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার ধারণা ছিল যে, এই জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছেই আমাদের নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নাম পরিচিত। কিন্তু আমার সে ভুল ভাঙল। এঁরা কেউই তাঁর নাম শোনেননি। ফোন করলাম আমাদের এম্ব্যাসি অফিসে। রেঙ্কোজি মন্দিরটি কোথায়, যেখানে রাখা হয়েছে আমাদের নেতজীর চিতাভস্ম! তাঁরাও কোন হদিস দিতে পারলেন না। জানি না এই অজ্ঞতা তাঁদের ইচ্ছাকৃত না কারো নির্দেশিত। বুঝতে পারলাম না ভারতীয় হয়েও নেতাজী সম্বন্ধে তাঁদের এই ঔদাসীন্যের কারণ কী। বিদায় টোকিও—বিদায়।

ঠিক ন'টার সময় আমরা হ্যা নিউ 'ওতানী হোটেল ত্যাগ করে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মিনি বাসে করে তোমেই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দিয়ে চলেছি টোকিওর ৪০ মাইল দক্ষিণে কামাকুরাতে। পথের দু'পাশে চেরি, পাইন ও হরিৎ বর্ণের সীডার গাছের সারি। সীডার কাঠের রং লাল এবং বেশ মজবুত। এর কাঠের বেশ একটা সুবাস আছে। আমাদের চলার পথে পড়ল সোনী কোম্পানির বিরাট কারখানা। ইয়োকোহামা শহরকে পাশ কাটিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম কামাকুরার সীমানার মধ্যে। এই পথ আসতে আমাদের সময় লাগল মাত্র চল্লিশ মিনিট।

কামাকুরা (Kamakura)

তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা, সবুজ গাছপালায় ভরা ছবির মত সুন্দর উপত্যকা কামাকুরা। এর দক্ষিণ দিকে সমুদ্র এবং একটি সৈকত। মাসা জানালেন—এটি অবকাশ যাপনের একটি কেন্দ্র। গ্রীষ্মকালে ইয়োকোহামা, টোকিও প্রভৃতি বিভিন্ন শহর থেকে বহুলোক এখানে অবসর যাপনের জন্য আসেন।

এরপর মিসেস মাসা কামাকুরার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন—১১৯২ সালে গেঞ্জি জাতির (Genji Clan) এক সর্দার, মিনামোতো বংশের প্রধান ইয়োরিতোমো তাঁর শোগুনেৎ বা সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এইখানে। পূর্বকালীন সম্রাটরা যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইয়োরিতোমো সেই শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন। তিনি মনে করতেন যে পূর্বতন সম্রাটদের শান্তি ও শিল্পকলার প্রতি অত্যধিক অনুরক্তিরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিয়োতোর শাসন-ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও পতনের কারণ। তাই তিনি অনাড়ম্বর, শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাত্রা ও সামরিক কলা-কৌশলের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করলেন। পূর্ববর্তী সম্রাটদের কালে অর্থাৎ হেইয়ান যুগে ঘটেছিল শিল্পকলার উৎকর্ষ, আর ইয়োরি-তোমোর যুগে ঘটল বুশিদো বা সামুরাইদের জীবনচর্যা, অর্থাৎ দেখা দিল জাপানী শিভালরি। ইয়োরিতোমোর কালকে বলা হয় 'কামাকুরা যুগ'।

১২১৩ সালে মিনোমোতো বংশের পর হোজো সম্প্রদায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই হোজো সম্প্রদায় হচ্ছে ইয়োরিতোমোর স্ত্রীর বংশধর। হোজোরা ১৩৩৩ সালের কিছু সময় পর্যন্ত কামাকুরায় সামরিক সরকার পরিচালনা করেন। তারপর ১৩৩৩ থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত স্বল্পকালের জন্য রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর অল্পদিন পরেই আশিকা গাগন নামে এক সেনানী কিয়োতোর মুরোমাচি নামক স্থানে নতুন সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। মুরোমাচি শাসনকাল স্থায়ী হয় ১৩৩৮ থেকে ১৫৭৩ সাল পর্যন্ত। মুরোমাচি শাসনকালে জাপানের জাতীয় জীবনে আবার পরিবর্তনের ঢেউ এলো। বুশিদো যুগের শিভালরি বা শৌর্যানুষ্ঠানের অনাড়ম্বর শৃঙ্খলার ছায়াপাত ঘটল ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সৌন্দর্য সাধনার ক্ষেত্রে। এর বৈশিষ্ট্য হল উন্নত ধরনের সংযম ও সারল্য। এই বৈশিষ্ট্য আজকের জাপানের শিল্পকলার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

আমাদের বাস এসে থামল একটা গলির মোড়ে। আমরা দেখতে যাব সাতশো বছরের পুরোন এক বুদ্ধ মূর্তি। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। অনেকটা পথ যেতে হবে এই গলি দিয়ে। এখন কি করা যায়? ঐ তো সামনেই কয়েকটা ছাতার দোকান রয়েছে। এখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নানা রকমের সুন্দর সুন্দর সব ছাতা ঝুলছে। এর ভেতরে সবচেয়ে কম দামের ছাতাগুলি পলিথিনের তৈরি। দাম ১৫০ ইয়েন বা সাড়ে চার টাকা তাই একটা কিনলাম। দুই কাজই হবে। এখানে মাথার জল আটকানো যাবে, আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে এটা কাউকে উপহার স্বরূপ দেওয়াও যাবে। ক্ষেপে গেল মিস্টার রাও।

গালিগালাজ শুরু করল—আমরা শালারা লোফার, ভিখারি ইত্যাদি। নির্বিকার সমর ও বাসুদেব। তারা আমাদের সঙ্গে ভিজতে ভিজতেই চলল বুদ্ধ মূর্তি দেখতে।

দাইবুৎসু (Daibutsu-Great Buddha) : আমরা এসেছি কোটোকুইন (Kotokuin) মন্দিরে বৃহৎ বুদ্ধ দেখতে। মন্দির প্রাঙ্গনের দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বৌদ্ধ শ্রমণ। আমাদের বিদেশী পর্যটক দেখে তিনি সাদরে আমাদের নিয়ে গেলেন প্রাঙ্গনের ভেতরে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখি উন্মুক্ত এক উঠানে দরজার দিকে মুখ করে একটা বেদির ওপরে করুণাময়ের ভঙ্গীতে উপবিষ্ট বিরাট এক বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তির দু'পাশে রয়েছে দুটি একতলা ভবন। শ্রমণ মহোদয় ভবন দুটি দেখিয়ে বললেন—এদিকটা হচ্ছে প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান এবং ওদিকটাতে রয়েছে অফিস ঘর, লাইব্রেরি ও কিছু দোকান ঘর। আর মূর্তির পিছনে রয়েছে মেঘাবৃত সবুজ পাহাড়। মন্দিরের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। শ্রমণ মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি এমন অবহেলিত ও অনাবৃত হয়ে পড়ে আছেন কেন?

উত্তরে শ্রমণ মহোদয় জানালেন—মোটেই দাইবুৎসু অবহেলিত নন। নিত্য দু'বেলা এঁর পূজা হয়। ইনি আর অনাবৃত কেন? তাহলে শুনুন তার ইতিহাস—

প্রথম শোগুন বা সামরিক শাসনকর্তা ইয়োরিতোমোর উইল অনুযায়ী এবং সম্রাট সিজোর আদেশে এই সম্পত্তির মালিক হন পুরোহিত জোকো। পুরোহিত জোকোর আপ্রাণ চেষ্টায় ১২৫২ সালে এখানে নির্মিত হয় সুন্দর বিরাট এক মন্দির, বেদি সমেত এই ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তিটির উচ্চতা ১২'৮ মিটার। এই মূর্তিটির ওজন হচ্ছে ১২১ মেট্রিক টন। সমগ্র জাপানে বিরাট বিরাট যত মূর্তি আছে, তার মধ্যে এটির স্থান দ্বিতীয়। সবচেয়ে বৃহৎ মূর্তিটি আছে নারা শহরে। এই মন্দিরটির নাম দেওয়া হয় কোটোকুইন। তারপর এলো সেই মহাকাল ১৪৯৫ সাল। এলো প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়, ভেঙে পড়ল মন্দির ভবন, হল প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভাসিয়ে নিয়ে গেল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। কিন্তু মূর্তি রইল অনড়, অচল এবং অটুট। মূর্তির গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তাই সেই থেকে মূর্তিটি এই উন্মুক্ত স্থানেই রয়েছে। শ্রমণ মহোদয় জানালেন এত দিনের রোদ, ঝড়, জল বা বরফ কিছুই আজ পর্যন্ত মূর্তিটিকে এতটুকু বিকৃত করতে পারেনি।

তসুরুগাওকা হাচিমাঙ্গু শ্রাইন (Tsurugaoka Hachimangu Shrine) : একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। পলিথিনের ছাতা মাথায় চেরি ও পাইন গাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এলাম এই মন্দিরে। মিসেস মাশা জানালেন এটি একটি শিন্তো মন্দির বা পূর্বসূরীদের স্মৃতি-মন্দির। এটি বীর সামুরাইদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। ১১৯১ সালে সামরিক শাসনকর্তা ইয়োরিতোমো এই স্মৃতি-মন্দিরটি নির্মাণ করান। শোগুনেৎ বা সামরিক সরকারের আমলে এই স্মৃতি-মন্দিরটি যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। ইয়োরিতোমোর শোগুনেৎ যাকে কামাকুরা যুগ বলা হয়, সেই যুগে শিল্পকলার চেয়েও বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় 'বুশিদোর' অর্থাৎ সামুরাইদের জীবনচর্যা বা শিভ্যাল্‌রির ওপর। এখনও প্রতি বছর ১৬ই সেপ্টেম্বর এখানে অশ্বারোহী সৈন্যদের নানা প্রকার রণকৌশল দেখানো হয়। এখানে পুরোন দিনের ঐতিহ্য-মণ্ডিত আরও দ্রষ্টব্য স্থান আছে, কিন্তু আমাদের সময় অতি অল্প, তাছাড়া বৃষ্টিও নেমেছে, তাই সেগুলি দেখা আর সম্ভব হল না।

বাসে উঠে মাশাকে অনুরোধ করলাম জাপানের জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। মাশা শুরু করলেন :—

জাতীয় পতাকা—ধপধপে সাদা পটভূমির কেন্দ্রস্থলে গাঢ় লাল রঙের বৃত্ত নিয়ে গঠিত জাপানের জাতীয় পতাকা। এটিকে বলা হয় 'হি-নো-মারু,' যার অর্থ হচ্ছে 'সূর্যের গোলাকৃতি'। এটি জাপানের প্রতীক-নির্দেশক, যার জাপানী ভাষায় আখ্যা হল নিপ্পন (Nippon) অর্থাৎ সূর্যের উৎস। তাইতো জাপানকে বলা হয় 'সূর্য ওঠার দেশ।'

বাসে করে যেতে যেতে এক সময় মাশা ঘোষণা করলেন—এবার আমরা চলেছি ওল্ড ক্যাস্‌ল্ টাউন (Old Castle Town) এর কাছ দিয়ে। এখানে সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিদেরই বসবাস বেশি। আমাদের বাঁদিকে সমুদ্র আর ডানদিকে শহর। ওল্ড ক্যাস্‌ল্ টাউনের যে স্থানটি দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তার নাম হচ্ছে ওড্যায়ারা (Odawara)। এখানে প্রথম দেখতে গেলাম জাপানের পুরোন দিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত সব বাড়ি-ঘর। প্যাগোডার মত দেখতে তিনতলা, চারতলা রং-বেরঙের কাঠের বাড়ি-ঘর। এগুলি হচ্ছে সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিদের বাড়ি। আর রংবেরঙের একতলা, দোতলা ছোট ছোট কাঠের বাড়িও অনেকগুলি আছে, সেগুলি হচ্ছে সাধারণ ব্যাক্তিদের অবসর বিনোদনের জন্য।

হাকোনে (Hakone)

প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কখন যে সমতল ভূমি শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা পাহাড়ের ওপরে উঠতে শুরু করেছি তার কিছুই টের পাইনি। হঠাৎ দেখি এক পাশে অগাধ খাদ, আর এক পাশে পাহাড়ের দেওয়াল। খাদের দিকে ধাপ কেটে কেটে সিঁড়ির মত করে সেখানে ধান এবং গমের চাষ করা হয়েছে। আঁকা বাঁকা সর্পিল পথে গাড়ি ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠেছে। আমাদের আশপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। কোথাও বা নুপুরনিক্কণ করতে করতে নৃত্যের তালে তালে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে সুন্দরী লাস্যময়ী ঝরণা। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ সত্যেন দত্তের একটা কবিতার দুটো লাইন বেরিয়ে এলো :—

'ঝরণা ঝরণা সুন্দরী ঝরণা,
পাষাণের বুক চেরা বিদ্যুৎপর্ণা।'

ফুজি-হাকোনে-ন্যাশন্যাল-পার্ক (Fuji Hakone National Park): আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭২৩ মিটার বা ২৩৭১ ফিট ওপরে উঠে এসেছি। ফুজি পর্বতের ওপরে আশি লেক নামে একটা হ্রদকে ঘিরে এই পার্কের অবস্থিতি। আমাদের গাড়ি থামল হ্রদের পূর্বতীরে হাকোনে নামে একটা হোটেলের সামনে। আমরা বাসে বসে রইলাম, মাশা নেমে গিয়ে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের অর্ডার দিয়ে এলেন ঐ হোটেলটাতে। আমরা সকলে মাশাকে সমস্বরে জানালাম যে, এখানে আজ আমরা জাপানী খানা খাব। মাশা ফিরে এলে আমরা গাড়ি করে চললাম হ্রদ প্রদক্ষিণে।

আশি লেক (Ashi Lake): ফুজি আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই হ্রদ। সৃষ্টি হয়েছে এই রকম আরও অনেক হ্রদ এবং উষ্ণ প্রস্রবণ। এই হ্রদগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কেন্দ্রিক আবাস, যেখানে অসংখ্য নর-নারী ছুটির দিনে আসেন বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের জন্য। ফুজি এখন একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। এর শেষ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ১৭০৭ সালে। লেক পরিক্রমা করতে করতে এই সব তথ্য আমাদের জানালেন মিসেস্ মাশা। তিনি আরও জানালেন—এই হ্রদের আয়তন হচ্ছে ৬৯০ হেক্টর বা ২·৭ বর্গ মাইল, আর এর পরিধি হচ্ছে ১৭·৫ কিলোমিটার বা ১১ মাইল। এর পূর্ব তীরে বিশ্বের ২৯টি দেশের আদর্শ অনুসারে ২৯টি ভবন আছে। হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে একটা রজ্জু পথ আছে। এতে করে ১৬৮১ মিটার বা ৫৫৪৭ ফিট্ উঁচু কোমা

পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যায়। উঠতে সময় লাগে মাত্র সাত মিনিট। সেখান থেকে পক্ষীর দৃষ্টিতে দেখা যায় সমগ্র হাকোনে শহর এবং ইজু উপদ্বীপের পর্বতমালা। দক্ষিণ-পূর্ব তীরে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য রয়েছে বিলাসবহুল বিভিন্ন নৌকা। নৌ প্রতিযোগিতার জন্য কিছু ইয়ট্ (Yacht) বা হাল্কা পাল তোলা নৌকাও রয়েছে ওখানে। আর দক্ষিণ তীরে রয়েছে সাঁতারের ব্যবস্থা। প্রচুর মাছ এই হ্রদের জলে। অনেককে মাছ ধরতেও দেখলাম। ফুজি পর্বতের তুষারাবৃত শিখরের প্রতিবিম্ব পড়েছে হ্রদের জলে। মনে হচ্ছে কে যেন নৈবেদ্য নিবেদন করেছে হ্রদে। আমাদের পূজা-পার্বণে আমরা যেমন আলোচালের নৈবেদ্য সাজাই, ফুজি পর্বতের তুষারাবৃত চূড়াটি অবিকল সেই রকম দেখতে। নানারকম খেলাধূলার ব্যবস্থাও রয়েছে এই পার্কে।

হোটেল হাকোনেতে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজে বসেছি। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে আমরা লেক এবং ফুজি পর্বত দেখতে পাচ্ছি। খাবার টেবিলের ওপরে সাজানো রয়েছে কিরিন, স্যাপ্পোরো, আসাহা, সান্তোরী এবং সাকুরা এই পাঁচ রকম বীয়ার—নাও, যে যার পছন্দ মত পান কর। চেরি ফুলকে এরা সাকুরা বলে, তাই আমি সাকুরাই পছন্দ করলাম। বীট, গাজর, বীন, মুলো, পেঁয়াজ, কুচো মাছ ও কুচো চিংড়ি সিদ্ধ করা স্যুপ এলো এবং তার সঙ্গে দিল পাঁউরুটি ও মাখন। স্যুপে একটা চুমুক দিতেই কাঁচা মাছের আঁসটে গন্ধে পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার যোগাড় হল। এর পরের পদ এলো ওকারিবায়াকি (Okari-bayaki)। এই খাদ্যটি জাপানী সুকিয়াকি (Sukiyaki) খাদ্যেরই মত, তবে একটু তফাত আছে। সুকিয়াকি তৈরি করা হয় গোমাংস দিয়ে, আর ওকারিবায়াকি তৈরি করা হয়, গরু কিম্বা শুয়ার কিম্বা হাঁস বা মুরগী বা অন্য কোন পাখির মাংস দিয়ে। প্রথমে ঐ সব জীবের যে কোন একটির মাংসকে কাগজের মত পাতলা ফালি করে কাটা হয়। এর পরে মাছ ও মাংসের কিমার সঙ্গে আদা, পেঁয়াজ, বীট, গাজর ও আলু মিশিয়ে তাতে নানা রকম মসলা মাখিয়ে ওগুলিকে সিদ্ধ করে নিয়ে একত্রে চটকে একটা পুর তৈরি করা হয়। তারপর এই পুরটা ঐ কাগজের মত পাতলা ফালি করে কাটা মাংসগুলি দিয়ে গোল করে মুড়ে, গোলা ডিমে ডুবিয়ে সোয়াবীনের তেল দিয়ে ভেজে, তাতে নুন, মিষ্টি, তেল, জল ও নানা রকম মসলা দিয়ে ফুটিয়ে গরম গরম অতিথিদের পাতে দেওয়া হয়। এ খাদ্যটি বেশ সুস্বাদু লাগল। ভাবছেন গরুর মাংস খেলাম, মোটেই না। আমাদের খাদ্যের স্লাইস্ করা মাংসটা হচ্ছে শুয়ারের মাংস, আর পুরটা মুরগীর

মাংসের। সুইট্ ডিশের পরিবর্তে দিল আঙ্গুর এবং চেরি ফল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—গ্রীন্ টি অর্থাৎ সবুজ চা না কফি? গ্রীন্ টি বিনা দুধে পান করতে হয়, তাই আমরা কফি নিলাম।

এবার আমরা নীচে নামছি অন্য পথ অর্থাৎ হ্রদের দক্ষিণ দিক দিয়ে। এই স্থানটির নাম হ্যাকোনেমাচি। মাশা আরম্ভ করলেন তাঁর বক্তৃতা—১৭ থেকে ১৯ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ সামুরাই শাসনকর্তাদের সময়ে এখানে ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি চেক্‌পোস্ট, তৎকালে বেশীর ভাগ গুপ্তচর এবং বিদ্রোহীরা এই পার্বত্য পথ দিয়ে জাপানে প্রবেশ করত। এখানকার প্রহরীরা পুরুষদের চেয়েও মহিলাদেরই বেশী সন্দেহ করত। কারণ তৎকালীন সামুরাই শাসনকর্তাদের অধীনস্থ কর্ম-চারীরা নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের মাঝে মাঝে জামিন স্বরূপ রাখত নিজেদের প্রভুর কাছে। এই সব মহিলারা কৌশলে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করত ঐ সব শাসনকর্তাদের কাছ থেকে। আর এই সব মহিলারাই করত গুপ্তচরের কাজ। তাই মহিলাদের তল্লাশীটা একটু কড়া ধরণের হত। সেই চেক্‌পোস্টটা দেখলাম পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু তার অনতিদূরে নতুন একটি চেক্‌পোস্ট তৈরি হয়েছে ১৯৬৫ সালে। এখন এই নতুন চেক্‌পোস্টে পরীক্ষা করা হয় বিদেশীদের পাস্‌পোর্ট, ভিসা এবং অন্যান্য কাগজপত্র।

সুন্দর আঁকাবাঁকা পহাড়ী রাস্তা দিয়ে আবার আমরা ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছি। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সীডার, পাইন, চেরি, আপেল, নাশপাতি ও ডালিম প্রভৃতি গাছ। বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসে আমাদের বাস কিছুক্ষণের জন্য থামল এক স্থানে। সেখানে একটা পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে জুক্কোকু পাস্ (Jukkoku Pass)। এখানকার উচ্চতা ৭৬৬ মিটার বা ২৫২৭ ফিট। এখানে দেখি অনেকগুলি পথ রয়েছে। মাশা জানালেন—এখান থেকে দশটি পথ দশটি প্রদেশের দিকে গিয়েছে তাই একে 'টেন প্রভিন্সেস্ পাস্' ও বলে। এবার আমাদের গাড়ি আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হুহু করে নেমে চলেছে নীচের দিকে। ইজু উপদ্বীপের রিলিফ ম্যাপ চোখের সামনে ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এই পথে নদী, ঝরণা ছাড়াও কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পেলাম।

আমরা এসেছি আতামি স্টেশনে—চড়ব বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেনে। যাকে বলে বুলেট ট্রেন বা হিকারি এক্সপ্রেস্ (Hikari Express)। যাব

জাপানের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ নগরী নাগোয়াতে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো সুন্দর স্টেশন ভবনটি। নানা রকম সুন্দর সুন্দর বিলাস-দ্রব্যের বিপনি রয়েছে এর ভেতরে। রয়েছে বার এবং রেস্তোরাঁ। স্টেশন ভবনের ভেতরকার দেওয়ালগুলি প্রাচীর-চিত্রে চিত্রিত। স্টেশনের মাঝখানে এক জায়গায় ঝুলছে কাঁচের ফ্রেমে আঁটা বিরাট রেলওয়ে ম্যাপ। দেওয়ালের মাঝে মাঝে দু-চারটে সিনেমার অশ্লীল ছবির পোস্টারও ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। এই ট্রেনে সবই সংরক্ষিত আসন এবং তা আগে থেকেই সংরক্ষণ করা যায়। তাই আমাদের টিকেট কেনার কোন বালাই নেই, কারণ সে কাজ মিসেস মাশা আগেই সেরে রেখেছেন। আমরা এসে দাঁড়ালাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। এখানে দেখি ১, ২ করে ১২ অবধি নম্বর লেখা বারোটি স্ট্যাণ্ড দাঁড় করানো রয়েছে। মাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম এর অর্থ কি? মাশা আমাদের রেলের টিকেট দিয়ে বললেন—এই দেখছ প্রত্যেক টিকেটে ক্রেতার নাম, রেলের কামরার নম্বর এবং সীট নম্বর লেখা আছে। আমাদের সকলেরই স্থান সংরক্ষিত হয়েছে সাত নম্বর কামরাতে, তাই আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই সাত নম্বর স্ট্যাণ্ডটার কাছে। আমাদের সাত নম্বর কামরা এইখানেই এসে দাঁড়াবে এবং আমরা যে যার সীট নম্বর অনুযায়ী গাড়িতে বসে পড়ব।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করল। দেখি সত্যিই কামরাগুলি নম্বর অনুযায়ী দাঁড়িয়ে গেছে নির্দিষ্ট স্থানে। হাতঘড়িতে দেখলাম এখন কাঁটায় কাঁটায় বিকেল চারটে। মাশা ঠাট্টা করে বললেন—যে যার ঘড়ি মিলিয়ে নিন, আমরা এই ট্রেনের যাতায়াতের সময় দেখে ঘড়ি মিলাই। অর্থাৎ এদের ট্রেন কদাচিৎ দেরিতে যাতায়াত করে। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে খুলে গেল কামরার ভ্যাকিউয়াম্ দরজাগুলি। আমাদের দেশের মত কামরা খোঁজার জন্য হন্যে হয়ে ছুটাছুটি করতে হল না। দু' মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল। ট্রেন ছাড়বার পূর্বমুহূর্তে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল কামরার দরজাগুলি।

এই ট্রেনটি বারোটা বগি নিয়ে গঠিত। এতে আছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। প্রথম শ্রেণীর চেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাই বেশি। দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। প্রথম শ্রেণীর জানালার কাঁচের ওপরে ঝুলছে ভেলভেটের রঙীন পর্দা, আর সীটের গদির ওয়াড়টায় সোনালী জরির পাড় দেওয়া। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গদির ওয়াড়ে রূপালী জরির পাড় দেওয়া এবং জানালার কাচের ওপরে ঝুলছে রঙীন কাপড়ের পর্দা। সব কামরাই

বাতানুকুল। গাড়ির ভেতর দিয়েই এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাতায়াতের পথ আছে।

প্রত্যেক কামরার জানালায় দু'রকম রঙের কাঁচ লাগানো আছে। সাদা এবং নীল। আপনার ইচ্ছামত যে কোনটা দিয়ে আপনি বহির্দৃশ্য দেখতে পারেন। বসবার আসনগুলি প্লেনের মত অর্থাৎ পুশ-ব্যাক সীট। সেগুলিকে ইচ্ছামত একটু হেলিয়ে দিয়ে অনায়াসে সুখনিদ্রা দেওয়া যায়। সামনের সীটের পিছনে যুক্ত রয়েছে ভাঁজ করা টেবিল। প্রয়োজন মত ভাঁজ খুলে নিয়ে এর ওপরে লেটার প্যাড রেখে অনায়াসে চিঠি লেখা যায় বা খাবারের প্লেট রেখে খাওয়া যায়। গাড়িটা একটু ঘুরে দেখতে ইচ্ছা হল। দেখি প্রত্যেক বগিরই এক প্রান্তে রয়েছে টেলিফোন এবং লেটার বক্স। এখান থেকে ডায়াল ঘুরিয়ে জাপানের যে কোন স্থানে ফোন করা যায়। প্রত্যেক বগিতে রয়েছে চারটি করে বাথরুম, দুটি জাপানী প্রথায় এবং দুটি পাশ্চাত্য প্রথায়। স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য বাথরুমগুলি আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাথরুমগুলিতে শাওয়ার ও বেসিন দুই আছে এবং ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকম জলেরও ব্যবস্থা আছে। সাবান ও ছোট ছোট তোয়ালে রাখা হয়েছে থাক দিয়ে, জল খাবার গেলাসও আছে। ব্যবহার করা তোয়ালেগুলি ফেলে দিন ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। পরের জংসন স্টেশনে সেগুলির বদলে আবার দিয়ে যাবে পরিষ্কার তোয়ালে। একটা কামরায় লেখা রয়েছে 'পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস'। সেখানে দেখি খাম, পোস্টকার্ড ও টিকেট বিক্রি হচ্ছে। এখান থেকে টেলিগ্রামও পাঠানো হয়। পাশ্চাত্য বেশভূষায় সজ্জিত জাপানী তরুণীরা ট্রলিতে করে নানারকম খাদ্য, পানীয়, চকোলেট, আইসক্রীম, সিগারেট প্রভৃতি নিয়ে কামরায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করছে। ধূমপানের জন্য আলাদা কামরা আছে। এখানকার যাত্রীরা খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন পড়ে সীটেই ফেলে রেখে চলে যান অন্য যাত্রীদের পড়ার জন্য।

অতি দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। কামরার ভেতরে বসে এর কিছুই টের পাচ্ছি না আমরা। না পাচ্ছি গাড়ি চলার শব্দ, না অনুভব করছি এর দুলুনি বা ঝাঁকানি। চলন্ত ট্রেনে বসে কাগজ কলম নিয়ে অনায়াসে লেখা যায় বা রং ও তুলি নিয়ে ছবি আঁকা যায়। এতটুকু হাত কাঁপবে না। আমরা গাড়ির গতিবেগ অনুভব করছি বাইরের দিকে তাকিয়ে। দেখি বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত সব হুহু করে পিছু হটে যাচ্ছে। আর অনুভব করছি যখন পাশ দিয়ে বিপরীতগামী কোন ট্রেন তীরবেগে চলে যাচ্ছে।

মাশাকে অনুরোধ করলাম এর কারিগরি সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। মাশা নীরব রইলেন। কিন্তু আমার পিছনের সীটের এক জাপানী ভদ্রলোক স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর পাশের খালি সীটে বসতে বললেন এবং নিজেকে একজন প্রযুক্তিবিদ বলে পরিচয় দিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন—এই রেলপথটার নাম হচ্ছে নিউ টোকাইডো লাইন। এটা জাপান ন্যাশন্যাল রেলওয়ের (J.N.R.) অধীনে। এই লাইনটা গেছে টোকিও থেকে কিয়ুশু দ্বীপের হাকাতা শহর পর্যন্ত। টোকিও থেকে হাকাতা পর্যন্ত এই লাইনের দূরত্ব হচ্ছে ১০৬৯ কিলোমিটার বা ৬৫০ মাইল। এই নতুন লাইনের নাম দেওয়া হয়েছে নিউ স্যানিও লাইন। আগে এই সুপার এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার বা ১৩০ ৪১ মাইল, এখন এই গতিবেগকে বাড়িয়ে করা হয়েছে; ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বা ১৫৫.২ মাইল।

কিছুক্ষণ থেমে ভদ্রলোক বললেন—এ তো গেল ভূমিকার কথা, এবার শুনুন এর প্রযুক্তিবিদ্যার কথা—এর প্রতিটি লাইন ওয়েল্ডিং করে পরস্পরের সঙ্গে জোড়াই করা। এর মাঝে এক্সপ্যানশন্ জয়েন্ট-এ কোন ফাঁক নেই। ফাঁক প্রতি মাইলে মাত্র একটি। লাইনের স্লীপার কাঠের নয়, প্রি-স্ট্রেসড্ কংক্রীটের তৈরি। আর রেললাইন ও স্লীপারের মধ্যে দেওয়া আছে রবারের কুশন্। তাই গাড়িতে দুলুনি বা ঝাঁকুনি কিছুই নেই। এই সুপার এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি জাপানের একটি গর্বের বস্তু। সরকারী পরিচালনাধীন জে. এন. আর. ছাড়াও ১৫৪টি বেসরকারী কোম্পানি আছে, তাঁরা আঞ্চলিক রেল ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

নাগোয়া (Nagoya)

এখন সন্ধ্যা ছয়টা। আমরা এসেছি জাপানের তৃতীয় বৃহৎ নগরী নাগোয়াতে। উঠেছি পাঁচ তারাযুক্ত নাগোয়া মিয়াকো হোটেলে। হোটেলটির অবস্থিতি একটি টিলার ওপরে। এখানে সিং এবং আমার জন্য বাথরুম সংযুক্ত দুই শয্যার একটা ঘর মিলেছে। ছেঁকে ধরেছে দালালের দল। এদের হাতে, সিনেমা, থিয়েটার, বুনরাকু (Bunraku) বা পুতুল নাচ, নাইট ক্লাব, ম্যাসাজ ক্লিনিক এবং পুরোনো জাপানী বাসগৃহের ঐতিহ্য ধারার সব প্রচারপত্র। সিং আমাকে অনুরোধ করল

কোন নাইট ক্লাবে যাবার জন্য। সিংকে জানালাম—যদি সামর্থে কুলায়, তাহলে এ কাজটি ফেরার পথে হংকং-এ সারা যাবে। এবার আমি পাল্টা প্রস্তাব করলাম —তার চেয়ে চল না এদের পুরোনো বাসগৃহ এবং বিখ্যাত অভিনয় কাবুকি (Kabuki) দেখে আসি। সিং রাজী হল এবং একজন দালালের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করল। জাপানী বাসগৃহ দেখানোর জন্য ওকে পারিশ্রমিক হিসাবে ২ ডলার করে ৪ ডলার দিতে হবে, আর কাবুকি অভিনয় দেখার জন্য আমাদের টিকেটের দাম লাগবে ৮ ডলার করে দুজনের ১৬ ডলার। তবে এই ৮ ডলার নৈশ আহার সমেত। মিসেস লালকাকাকে জানালাম যে, আজ আমরা দুজন নৈশ আহার করব না, সুতরাং ঐ বাবদ যদি আমাদের দুজনকে ৮ ডলার করে ১৬ ডলার দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা বাধিত হব। মিসেস্ লালকাকা বিনা আপত্তিতে নৈশভোজ বাবদ আমাদের দুজনকে ১৬ ডলার নগদ দিয়ে দিল। আরও ২।৪ জন আমাদের পন্থা অনুসরণ করলেন।

দালালই বলুন, আর গাইডই বলুন, সে আমাদের তাগাদা দিল তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার জন্য। কারণ জাপানীরা রাত আটটার মধ্যে তাদের নৈশ-আহার সেরে নেন। তারপর রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত তারা তাদের গৃহস্থালির যাবতীয় কিছু দেখান। গাইড আমাদের অনুরোধ করল সঙ্গে কিছু একটা প্রেজেণ্টেশন্ নেবার জন্য। কারণ এটা একটা রীতি এবং এতে তারা খুশি হবেন। সিং এবং আমার কাছে কিছু নতুন রঙীন রুমাল ছিল। তার মধ্যে ছয়খানা রুমাল ভাল করে রঙীন কাগজ দিয়ে মুড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গাইডের সঙ্গে।

বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আমরা পদব্রজে চলেছি বনবীথির পথ ধরে। মেঘ মুক্ত আকাশ। চাঁদ উঠেছে, তারার দলও ঝিলিক মারছে। আমাদের চলার পথে চলেছে আলো-ছায়ার খেলা। গাইডকে অনুরোধ করলাম নাগোয়ার ইতিহাস বলার জন্যে। গাইড শুরু করল—সামুরাই প্রধান লিয়াসু তোকুগাওয়া, যিনি জাপানের ছোট বড় সব দ্বীপগুলিকে একত্রিত করে গড়েছেন এই বৃহৎ জাপানকে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসে উপসাগরের (Ise Bay) উপকূলে পত্তন করেন এই বন্দর এবং শিল্পনগরী। তবে ঐ যে পীচে মোড়া সড়ক, ফ্লুরেসেণ্ট-লাইট এবং স্কাইস্ক্র্যাপারগুলি দেখছেন, ওগুলি সব তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম এক গৃহস্থের গৃহে। গৃহকর্তা এবং কর্ত্রী উভয়েই আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন বৈঠকখানায়

ঘরে। কারণ গাইড হোটেল থেকে ফোনে তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিল আমাদের আগমন বার্তা।

কর্তা ও গিন্নী উভয়েই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। গিন্নী আমাদের বাইরের জুতা খুলে দিয়ে পরিয়ে দিলেন তাদের দেওয়া দড়ির তৈরি চটি জুতা। তারপর সাদর অভ্যর্থনা করে আমাদের নিয়ে গেলেন তাদের ঘরের ভেতরে। পরিবারের অন্যান্যরাও এলেন আমাদের আপ্যায়ণ করতে। আমরা উপহারের প্যাকেটটি দিলাম গিন্নীর হাতে। সকলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন সেটাকে এবং তারিফ করলেন, কিন্তু কেউ একবারও প্যাকেটটি খুলে দেখলেন না যে কি আছে তার ভেতরে। ঘরে সোফা, কৌচ বা চেয়ার টেবিলের কোন বালাই নেই। ঘরের মেঝে জুড়ে পাতা রয়েছে টাটামি। টাটামির ওপর পাতা রয়েছে দামী একটা কার্পেট। কর্তা ও গিন্নী আমাদের বসতে অনুরোধ করলেন ঐ কার্পেটের ওপর। এরপর ওঁরা জানতে চাইলেন আমাদের পরিচয়। উত্তরে জানালাম—আমরা ভারতবাসী। অভ্যর্থনার পালা শেষ হল, এবার গৃহ দর্শনের পালা।

পুরাতন বাসগৃহ—প্যাগোডার মত দেখতে, কাঠের তৈরি দ্বিতল একটি ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে আছে ছোট একটা ফুলের বাগান। তার পিছনে রয়েছে ছোট একটা সবজির বাগান। ঘরের ভেতরের দেওয়ালগুলি এবং সীলিংটা প্লাস্টার করা নয়, সেগুলি সব রঙীন কাগজ দিয়ে আঁটা, আর কড়ি বরগাগুলি সব সোনালী রং করা। ঢালু ছাদটাতে লাল রঙের টালি দেওয়া। বেশির ভাগ বাড়িই একতলা, তবে দোতলা বা তিনতলা বাড়িও কিছু কিছু আছে। গৃহস্বামী বললেন—যেহেতু জাপানে সমতল ভূমি খুব কম এবং লোকসংখ্যা অনেক বেশি, সেই হেতু জাপানের গৃহগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রাকার এবং ঘনসন্নিবিষ্ট। দরজা, জানালাগুলি সব তৈরি শক্ত প্যানেলের ওপর, তাই সেগুলি ইচ্ছা মত ঠেলে খোলা এবং বন্ধ করা যায়। সিঁড়িতে এবং প্রত্যেক ঘরের মেঝেতে টাটামি পাতা।

প্রত্যেকটি ঘরকেই খাবার, শোবার এবং বৈঠকখানা ঘরে পরিণত করা যায়। কাঠের প্যানেলের পার্টিশন লাগিয়ে ছোট করা যায়, আবার পার্টিশন খুলে নিয়ে বড়ও করা যায়। ঘরের দেওয়ালে এবং সীলিংয়ে যে রঙের এবং যে ডিজাইনের কাগজ আঁটা থাকে, পার্টিশনটিতেও সেই রঙের এবং ডিজাইনের কাগজ লাগানো হয়। এর কারণ হচ্ছে অল্প জায়গার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা। অধিকাংশ জাপানী পরিবার টাটামি পাতা মেঝের ওপরে বিছানা পেতে শুয়ে ঘুমান।

দিনের বেলায় এই বিছানাপত্র অন্য একটা নিভৃত কক্ষে রেখে ঘরটিকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়া হয়। ঐতিহ্যগত জাপানী শৈলীর গৃহাভ্যন্তরে বাইরের জুতা পরে ঢোকা নিষিদ্ধ বলে মেঝেতে পাতা ঐ টাটামিগুলি সব সময়েই পরিষ্কার থাকে। তবে আধুনিকরা অনেকেই আজকাল খাট পালঙ্ক ব্যবহার করছেন।

এঁদের ঘর সাজাবার রীতি হচ্ছে, প্রধান ঘরটিতে অর্থাৎ যে ঘরটিতে অতিথিরা এসে বসবেন, সেখানে সাধারণতঃ থাকবে হয় একটা ছোট বেদী কিংবা একটা কুলুঙ্গি। সেই কুলুঙ্গিকে জাপানী ভাষায় বলা হয় তোকোনোমা (Tokonoma)। ঘরের শোভাবর্ধনের জন্য এই বেদীটিকে কিংবা তোকোনোমোটিকে নানা রকম পুতুল ও হস্তশিল্প দ্বারা সজ্জিত করা হয়। উৎসবের দিনে এই বেদীতে ও তোকোনোমাতে পুষ্পসজ্জাও প্রদর্শিত হয়। ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো হয় সুন্দর হস্তলিপি সম্বলিত স্ক্রল, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy)। আর ঘরের মাঝখানে রাখা হয় মেঝে থেকে সীলিং পর্যন্ত লম্বা, বাকল ছাড়ানো পালিশ করা একটা চেরি গাছের ডাল। আসবাবপত্রের মধ্যে থাকে কয়েকটি দেরাজওয়ালা আলমারি, কয়েকটি নিচু খাবার টেবিল এবং টেবিলের চারপাশে পাতা থাকে কিছু সুন্দর গদির আসন।

এদের সাবেকী জীবনযাত্রার প্রণালী দেখে মনটা ভরে গেল। আমার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল। মুগ্ধ হলাম এদের আতিথেয়তায়। কর্তা ও গিন্নী পথ অবধি আমাদের এগিয়ে দিলেন।

এবার আমরা চলেছি জাপানী নাটক দেখতে। পথে যেতে যেতে গাইড জানাল যে, জাপানে তিন রকমের ক্ল্যাসিক্ বা উচ্চাঙ্গের নাট্য আছে, যথা:—নৌ (Noh), কাবুকি (Kabuki) এবং বুনরাকু (Bunraku)। নৌ হচ্ছে নৃত্য-গীতি নাট্য। কাবুকি সংলাপ নাট্য আর বুনরাকু হচ্ছে পুতুল নাচ বা পুতুল দ্বারা অভিনীত নাট্য। আমরা চলেছি নৌ এবং কাবুকি নাট্য দেখতে। গাইড আমাদের শোনালো নৌ নাট্যের ইতিকথা।

নৌ (Noh) নাট্য:—জাপানে তিনটি উচ্চাঙ্গ নাটকের মধ্যে নৌ নাট্য হল সবচেয়ে প্রাচীন। এর উদ্ভব ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় নৃত্যাদির সংহত রূপদান ও উন্নতি বিধান করা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি কানামি (Kanami) এবং জিয়ামি (Zeami) নামে পিতা ও পুত্র মিলে প্রাচীনকালের দেশী ও বিদেশী নৃত্য-গীতের সংমিশ্রণে

এর নবরূপ দান করে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। এই নাটক তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তোকুগাওয়ার সময় থেকে মেইজির সময় পর্যন্ত এই নাটক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে অভিনীত হত। আঙ্গিকের দিক থেকে নো নাটক উচ্চ কলা-কৌশল সমৃদ্ধ এবং মূলত এই নাটক অভিনীত হয় কেবলমাত্র সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের জন্য।

আমরা রঙ্গালয়ের কাছে এসে গেছি। গাইড আমাদের দুজনের জন্য দুটি টিকিট কিনে আমাদের সঁপে দিলেন এক ভদ্রলোকের কাছে। তিনি আমাদের প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিলেন তাঁর পাশের দুটি সীটে।

ঠিক রাত ন'টায় অডিটোরিয়ামের আলো স্তিমিত হয়ে গেল। মঞ্চের পর্দা সরে গেল, উজ্জ্বল হল সেখানকার আলো। মঞ্চের প্ল্যাটফর্ম দেখলাম বেশ নীচু। সমগ্র মঞ্চের ওপরে কেবলমাত্র পিছন দিকে রয়েছে মাত্র একটা দৃশ্যপট। তাতে আঁকা রয়েছে বিরাট একটা পাইন গাছের ছবি। আর মঞ্চের ওপরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। পাইন গাছের নীচে লাল কাপড় দিয়ে ঘেরা একটা জায়গার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভদ্রলোক বললেন—ঐ ঘেরার অন্তরালে একদিকে বসেছেন বাদকের দল এবং অপরদিকে বসেছেন গায়ক ও গায়িকার দল। তিনি আরও জানালেন যে নো নাটক তিনভাগে বিভক্ত, যথা :—জো (Jo), হা (Ha) এবং কিউ (Kyu)। জো হচ্ছে ভূমিকাস্বরূপ। এতে প্রত্যেক চরিত্র সম্বন্ধে দর্শকদের একটা মনোভাব সৃষ্টি হবে। এর টেম্পো হবে গতিসম্পন্ন। হা হচ্ছে অভিনয়ের মধ্যম ভাগ। এতে প্রকাশ পাবে নাটকের মূলভাব। এতে টেম্পোর গতি হবে শ্লথ। আর কিউ হচ্ছে উপসংহার। এর টেম্পো হবে স্পষ্ট, চেতনা সম্পন্ন এবং দ্রুত।

অভিনয় শুরু হল। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা নানা রঙের ব্রোকেডের পোশাক পরে এবং মুখে বিভিন্ন ধরণের মুখোশ এঁটে একে একে এসে আবির্ভূত হল মঞ্চের ওপরে। এটা একটা নৃত্য-গীতি নাট্য। নৃত্যের তালে তালে শিল্পীদের সাজ পোশাকের ওপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে তীব্র রঙীন আলোর ঢেউ। সৃষ্টি হচ্ছে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশের। এর গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে এবং পরিস্থিতি বর্ণনা করা হচ্ছে কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে। নৃত্যে যখন দমক দেবার প্রয়োজন হচ্ছে তখন শিল্পীরা নৃত্যের তালে তালে জোরে জোরে পা ঠুকছেন ঐ ইতস্তত ছড়ানো কাঠের গুঁড়িগুলির ওপরে। এতে নুপুরের

ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র হলঘরে। প্রথমে একটা প্রার্থনার দৃশ্য দেখিয়ে যে নাটকটা দেখানো হল তার সারাংশ হচ্ছে নিম্নরূপ।

দাইমিয়ো নামে জাপানের দক্ষিণাংশের এক সামন্ত নৃপতি এবং তাঁর হরিহর আত্মা বন্ধু তারোকাজা তাদের বিয়ের জন্য খোঁজাখুঁজি করছিলেন দুটি সুন্দরী কন্যা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন কোন সুন্দরী কন্যার সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সামন্ত নৃপতি তার বন্ধু তারোকাজাকে অনুরোধ করলেন—চল যাই, আমরা ইবিসু মন্দিরে গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই। তিনি যদি দয়া করে আমাদের দুজনকে দুটি মনের মত কন্যা পাইয়ে দেন। সামন্ত নৃপতি দাইমিয়োর দেব-দ্বিজে অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু তার বন্ধু তারোকাজা ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ তিনি একজন নাস্তিক। এদিকে বন্ধুর অনুরোধও উপেক্ষা করা যায় না, সুতরাং তিনি বাধ্য হলেন বন্ধুর সঙ্গে ইবিসু মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানাতে। প্রার্থনার ফল স্বরূপ স্বর্গ থেকে পড়ল দু'গাছা মাছ ধরার ছিপ। এই ছিপ নিয়ে দুজনে সমুদ্রতটে গেলেন মাছ ধরতে। প্রথমে ছিপ ফেললেন দাইমিয়ো। তার ছিপে উঠল মাছের পরিবর্তে অপরূপ সুন্দরী এক জলপরী। দাইমিয়োর কি আনন্দ। তিনি তাকে নিয়ে চললেন বিয়ে করতে। এরপর ছিপ ফেললেন তারোকাজা। তারও ছিপে উঠল এক নারী। কিন্তু তার মুখ আবরিত। মুখের আবরণ উন্মোচন করতে দেখা গেল কুৎসিতদর্শনা এক নারীকে। তারোকাজা এই কুৎসিত নারীকে গ্রহণ করতে নারাজ, তাই তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। কিন্তু নারীটি ছাড়বার পাত্রী নয়, তাই সেও তারোকাজার পিছু পিছু ছুটল তাকে ধরবার জন্য। এইখানে নৌ নাটকের যবনিকাপাত ঘটল।

এখন রাত দশটা। আধঘণ্টা বিরাম। সুতরাং আমরা দর্শকরা সবাই চলে গেলাম ভোজন কক্ষে নৈশভোজ সারতে। এখানে পাশ্চাত্য কায়দায় চেয়ার টেবিল সাজানো। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসলেন। আমাদের তিনজনের জন্য পানীয়ের অর্ডার দেওয়া হল, জাপানের তৈরি সানটোরি হুয়িস্কি। খাদ্যতালিকায় দেখলাম চারপদী খাদ্য পরিবেশন করা হবে। যথা—স্যুপ, পাউরুটি ও মাখন বা চীজ আমিষ তরকারি এবং ফল। খাদ্যতালিকা দেখিয়ে ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম একটা সুস্বাদু জাপানী আমিষ পদ নির্বাচন করে দেবার জন্য। ভদ্রলোক নির্বাচন করে দিলেন টেপ্পানিয়াকি (Teppanyaki)। আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি জিনিস? উত্তরে তিনি জানালেন—নানা রকম তরিতরকারির সঙ্গে খদ্দেরদের ফরমাশ মত মাংস, যথা :—গরু, শুয়ার,

ভেড়া, হাঁস কিংবা মুরগী মিশিয়ে শুকনো শুকনো একটা কারি। আমি অনুরোধ করলাম—আমার টেপ্পানিয়াকি যেন ভেড়ার মাংস দিয়ে বানানো হয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একজন পাচিকা একটা ছোট উনুন, কিছু রন্ধন সামগ্রী এবং রান্না করার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসে হাজির হল আমার কাছে। আমার সীটের পাশে বসে টেপ্পানিয়াকি তৈরি করতে শুরু করল। টেপ্পানিয়াকির রন্ধন প্রণালী দেখলাম। কিউব-এর মত করে কাটা ভেড়ার মাংসের টুকরাগুলির সঙ্গে বীনগাছের অঙ্কুর এবং অন্যান্য সবজি মিশিয়ে তাতে নানা রকম মসলা মাখিয়ে সেগুলি একটা ফ্রাই প্যানে করে সয়াবীনের তেল দিয়ে ভাজল। তারপর ওতে পরিমাণ মত তেল, জল, নুন ও মিষ্টি দিয়ে ওগুলি সেদ্ধ করে শুকনো অবস্থায় গরম গরম আমার প্লেটে ঢেলে দিল। একেই বলে টেপ্পানিয়াকি। এই খাদ্যটি কিন্তু খেতে বেশ সুস্বাদু। এর সঙ্গে দিল এক প্লেট স্যালাড। আমি খেলাম চিকেন-স্যুপ, পাঁউরুটি, মাখন, টেপ্পানিয়াকি এবং এক বাটি টাটকা স্ট্রবেরি ফল। আর সিং নিরামিষ খেলো—মাশরুম বা ছত্রাকের স্যুপ আর টেপ্পানিয়াকির বদলে বীন-শূট এবং ব্যাম্বু শূট-এর বা বীনগাছের অঙ্কুরের এবং বাঁশগাছের অঙ্কুরের তরকারি। দু' পেগ হুয়িস্কি শেষ করে সবে তৃতীয় পেগে চুমুক দিয়েছি এমন সময়ে ঘণ্টা বেজে উঠল। ভদ্রলোক বললেন—গেলাস হাতে করে চলুন, অডিটোরিয়ামে গিয়ে বসা যাক, এখুনি কাবুকি নাটক শুরু হবে। নাটক শুরু হবার ফাঁকে ভদ্রলোক আমাদের শোনালেন কাবুকি নাটকের ইতিকথা।

কাবুকি (Kabuki) নাট্য :—নৌ নাটক, বুনরাকু ও পূর্ববর্তীকালের অন্যান্য নাট্যকলার সংমিশ্রণে এই বিখ্যাত কাবুকি নাট্যকলার উৎপত্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইজুমো মঠের সংস্কার সাধন করার জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন ঐ মঠের প্রধান ধর্মযাজিকা ওকুনি সুন্দরী তরুণীদের নিয়ে একটা দল গঠন করলেন এবং নৌ, বুনরাকু ও পূর্ববর্তীকালের অন্যান্য নাট্যকলার সংমিশ্রণে রচনা করলেন নৃত্য-গীতি মুখর নতুন এক ধর্মীয় নাটক। এই নাট্যকলার নাম দিলেন কাবুকি। কাবুকির অর্থ হচ্ছে অলৌকিক বা অত্যাশ্চর্য কিছু। তিনি দলবল নিয়ে গেলেন তখনকার শিল্পকলার কেন্দ্রস্থল কিয়োতো শহরে। তাঁদের এই নাটক অভিনয় সাড়া জাগাল সারা শহরে। ভেঙে পড়ল শহরের লোক, সংগৃহীত হল প্রচুর অর্থ।

এই নাটকের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কিয়োতো শহরে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে লাগল নৃত্য-গীতি নাট্য প্রতিষ্ঠান। তখনকার দিনে নাটক

রচনা করা হত কোন পৌরাণিক বা বীরত্ব কাহিনী নিয়ে। এর উদ্দেশ্য ছিল সৎ-এর জয় এবং অসৎ-এর পরাজয়। এইসব কাবুকি নাটকে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় চরিত্রেই অভিনয় করতেন কেবলমাত্র মহিলারা। এইসব বীরত্ব কাহিনীকে জাপানী ভাষায় বলা হয় আরাগোতো (Aragoto)। এই সময়ে কিছু যুবক যুবতীও কয়েকটি কাবুকি নাট্য সম্প্রদায় গড়ে তুলল। তারপর অভিনয়ের মধ্যে ঢুকল অনাচার। মহিলারা নানারকম অশ্লীল দেহ ভঙ্গিমায় তাদের দেহের প্রতি পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন এবং অভিনয়ান্তে বিলি করতে লাগলেন তাদের দেহ। ফলে সরকার নিষিদ্ধ করে দিলেন এই অভিনয়।

মহিলা দলগুলি নিষিদ্ধ হবার পর তাদের স্থান অধিকার করল কিছু সুদর্শন যুবকের দল। এই অভিনয়ের নতুন নাম হল ওয়াকাশু কাবুকি (Wakashu Kabuki)। এতে স্ত্রী-চরিত্রে ছেলেরাই অভিনয় করতে লাগল। কিন্তু এই যুবকের দল স্ত্রী-চরিত্রগুলি এমন বিশ্রীভাবে অভিনয় করতে লাগল যা আগেকার মহিলা অভিনীত স্ত্রী-চরিত্রগুলির অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীকেও হার মানাল। তাই সরকার এই ওয়াকাশু কাবুকিকেও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন।

এর বেশ কয়েক বছর পরে জনসাধারণের চাপে পড়ে সরকার এই নাটকের পুনরাভিনয়ের অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু কয়েকটি শর্তে। শর্তগুলি হল এই যে, পূর্বেকার নৃত্য-গীত নাটকের সংস্কার করে সেটিকে করতে হবে আধুনিক সংলাপপূর্ণ একটি গদ্যময় নাটক। তাতে কোন রকম অশ্লীলতার ইঙ্গিত থাকবে না। আর এই সব নাটকের স্ত্রী-চরিত্রগুলি অভিনীত হবে পুরুষদের দ্বারা। যে সব পুরুষরা এই সব স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করে জাপানী ভাষায় তাদের বলা হয় ওন্নাগাতা (Unnagata)। এই নাটকের সম্পূর্ণ আধুনিকীরণ রূপের বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। বর্তমানে বীরত্ব এবং পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং প্রেম ও ভালবাসার নাটকও অভিনীত হয়।

মঞ্চের যবনিকা সরে গেলে দেখা গেল যে মঞ্চটি অনেক উঁচু হয়ে গেছে। নো নাটক অভিনয়ের সময় মঞ্চটি ছিল বেশ নীচু। নাটক শুরু হল। ভদ্রলোক নাটকের গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে কাবুকি নাট্য সম্বন্ধেও আমাদের বোঝাতে লাগলেন। কাবুকি হচ্ছে বর্ণাঢ্য, সমৃদ্ধিশালী এবং সুষম একটি নাটক। নাটকের তিনটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে—শব্দ বা আবহ সঙ্গীত, রঙের বৈশিষ্ট্য এবং অভিনয়ের গভীরতা। এর একটা বিশেষ স্টাইল বা প্রয়োগ পদ্ধতি আছে।

চরিত্রের আসল রূপ এবং উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে হবে চোখ ও ভ্রূর সাহায্যে মুখভঙ্গিমায় এবং নাচের মুদ্রায়। এই নাটকে ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতার প্রতীক হচ্ছে লাল রঙের মেক্‌আপ এবং পোশাকী নীল বর্ণ হচ্ছে খল এবং দুষ্ট লোকের প্রতীক, মহামানবের প্রতীক বাদামী রং এবং ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব বা শয়তানের প্রতীক হচ্ছে বেগুনী রং। এছাড়া সাধারণ ভূমিকায় বা হাস্য-কৌতুকের ভূমিকায় যারা অংশ গ্রহণ করেন তারা যে কোন রঙের পোশাক এবং মেক্-আপ ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিবিধ পদ্ধতিতে এই কাবুকি নাটক অভিনীত হয়, যথা—এদো (Edo, বর্তমানে টোকিও) পদ্ধতি এবং কিয়োতো-ওসাকা (Kyoto-Osaka) পদ্ধতি। নাটকে পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যে বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি হচ্ছে তিন তার যুক্ত জাপানী গিটার শামিসেন, এটি এদের খুব প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। বিরাট ঢাক ওডাইকো, সুজুমি অর্থাৎ ডম্বরু, বিরাট ঘণ্টা হনৎসুরি, যা মন্দিরে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও আছে বাঁশি, বড় করতাল, ছোট ঘণ্টা, কাঁসর ও অন্যান্য ধাতব বাদ্যযন্ত্র যা বৌদ্ধ মঠে ব্যবহৃত হয়। এই পরিবেশ সৃষ্টিকারী শব্দের জাপানী নাম হচ্ছে গেজা (Geza)।

আমরা যে নাটকটি দেখলাম তার সারাংশ হল এই রকম :—এনজি নামে এক সম্রাট ছিলেন। তার দুই মন্ত্রী। একজনের নাম সুগায়ারা মিচিজানে এবং অপরজনের নাম ফুজিয়ারা শিহেই। ফুজিয়ারা শিহেই অত্যন্ত অসৎ লোক ছিলেন। তিনি তার প্রতি কর্মে বাধা পেতেন মন্ত্রী সুগায়ারা মিচিজান এবং সম্রাট ভ্রাতা যুবরাজ তোকিয়োর কাছ থেকে। তাই তিনি নিষ্কণ্টক হবার জন্য অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ওদের দুজনের নামে মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটালেন এবং সম্রাটকে দিয়ে ওদের দুজনকে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করলেন। মন্ত্রী মিচিজান এবং যুবরাজ তোকিয়োর দুজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিল, নাম উমেও মারু এবং সাকুরা মারু। এরা দুজনে একই মায়ের সন্তান। প্রভুদের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও দেশ ত্যাগ করল এই সংকল্প নিয়ে যে, যতদিন না প্রভুদের এই অপবাদ ঘুচিয়ে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পারে, ততদিন পর্যন্ত ওরাও দেশে ফিরবে না। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে ভাগ্যবিড়ম্বিত এই দুইজন অবশেষে এসে আস্তানা গাড়ল যোশিদা মঠের কাছে। বেশ কিছু দিন কেটে গেছে, একদিন এক ঘোষক ঘোষণা করল যে, আগামী কাল মাননীয় মন্ত্রী শিহেই এখানে আসবেন মঠ পরিদর্শনে। ওরা দুজনে শুনল সে কথা এবং মনে মনে

ভাবল এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যথা সময়ে মন্ত্রী মহোদয় এলেন এবং মঠে ঢুকতে যাবেন, এমন সময়ে এরা দুজন মিলে আক্রমণ করল মন্ত্রী মহোদয়কে। কিন্তু বাধা দিল এদেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাৎসুয়ো মারু। সে মন্ত্রী শিহেইর একজন বিশ্বস্ত অনুচর। তাকে হত্যা না করলে মন্ত্রী মহোদয়ের কেশাগ্রও স্পর্শ করা যাবে না, সুতরাং নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য ওরা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং মন্ত্রী মহোদয়কে হত্যা করল। দৈবক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হল নির্বাসিত যুবরাজ তোকিয়ো এবং মন্ত্রী মিচিজানে। ওরা দুজন নিজেদের প্রভুদের পদতলে লুটিয়ে পড়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠাল এবং নিজেরা ভ্রাতৃহত্যার জন্য হারাকিরি করে প্রাণ বিসর্জন দিল।

এইখানে ঘটল নাটকের যবনিকা পাত। নাটকের শেষে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন কাবুকি নাটকের আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন? আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। তখন তিনি বললেন—এই কাবুকি নাটকের কোন অঙ্কের শেষে বা যবনিকা পাত হবার আগে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা যে যেমন অবস্থায় থাকে ঠিক সেই ভঙ্গীমায় তারা মঞ্চের বাঁদিক ঘেঁষে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ান এবং তখন চলে তাদের মূক অভিনয়। এই অবস্থাকে জাপানীরা বলে কাতা (Kata), আর এই যবনিকার নাম হচ্ছে জোসিকি-মাকু (Joshiki Maku)।

বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকি। ড্রাইভাররা গাড়ি থামায় কিন্তু হোটেলের কার্ডটা দেখেই সবাই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে সরে পড়ে। কেউ কথাও বলে না বা ট্যাক্সির দরজাও খোলে না। পরে জেনেছি যে, এখানে রাত ন'টার পর কোন ট্যাক্সি অল্প দূরত্বের পথ যেতে চায় না। তবে হ্যাঁ, যায়, যদি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ ভাড়া কবুল করা যায়। তবে এই ভাড়ার কথা জানাতে হবে তাদের আঙুলের ইঙ্গিতে। রাত বারোটা নাগাদ আমাদের পাশের সীটের ভদ্রলোক তার গাড়িতে করে আমাদের হোটেলে পেঁাছে দিলেন।

পয়সা উসুল করার জন্য মদ্যপানের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে। তাই দুজনেই বেসামাল হয়ে পড়েছি। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টের বোতামগুলোর কখনও পাঁচ নম্বর, কখনও দশ নম্বর আবার কখনও বা বারো নম্বর তের নম্বর টিপছি, অথচ আমাদের ঘর হচ্ছে আটতলায়। হোটেলের নৈশপ্রহরী আমাদের আটতলায় তুলে ঘরের দরজা খুলে এবং আমাদের পায়ের জুতা-মোজা খুলে দিয়ে, আমাদের

বিছানায় শুইয়ে দিল। কে কার বিছানায় শুলাম তা ঈশ্বরই জানেন তবে নিদ্রাদেবীর কৃপা লাভ করতে একটুও দেরী হল না।

সকালে চোখ মেলতেই দেখি, ঘরের কাচের জানালা ভেদ করে বিছানায় এসে পড়েছে তরুণ রবির অরুণ আলো। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন :—

'আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল ঘরের আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ॥'

এ কী হল! মাথাটা ভার ভার, দেহটা অবশ লাগছে, বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। কারণ আজ সকাল সাড়ে আটটায় হোটেল ছেড়ে দিয়ে আমরা যাব কিয়োতো শহরে। সাহাদা এবং মুখার্জীদা দুজনে দু'কাপ চা হাতে করে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। সাহাদার তৈরি চা পান করে দেহের অলসতা দূর করলাম। তারপর প্রাতঃকৃত্য এবং স্নান সেরে চারজনে মিলে চললাম খাবার ঘরের দিকে।

ছোট হাজরি। এ এক এলাহী ব্যাপার। টেবিলের ওপরে সাজানো রয়েছে প্রায় ২০।২৫ রকমের খাদ্যদ্রব্য। এখন যে যার ইচ্ছা মত নাও আর খাও। ইংরাজীতে একে বলে বুফে-ব্রেকফাস্ট (Buffet Breakfast)। আমি নিলাম কর্ণ-ফ্লেক্স, দুধ, সেঁকা পাঁউরুটি, পনির, দুটো মুরগীর ডিম, একটা চিকেন স্টেক, দুটো পেস্ট্রি, খানিকটা জ্যাম ও জেলি, একটা কমলা লেবু, কিছু চেরি ফল, এক কাপ র-(Raw) কফি এবং কয়েকটা ক্রীমের টিউব। আর গোলমরিচ, নুন এবং চিনি। ফ্যাসাদ ঘটল যখন খাবার টেবিলে বসতে যাচ্ছি। একজন ওয়েট্রেস ছুটে এসে আমার প্লেট থেকে ডিম দুটো তুলে নিল এবং আমাকে জাপানী ভাষায় কি বলল। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম আর মনে মনে ভাবলাম, ডিম নেওয়াটা কি অন্যায় হয়েছে। সমস্যার সমাধান করলেন মিসেস্ মাশা। মাশা বললেন—ওয়েট্রেস জানতে চাইছে যে ডিম দুটো তুমি কাঁচা খাবে না ও ডিম দুটোকে নিয়ে গিয়ে সেদ্ধ, আধ-সেদ্ধ কিম্বা পোচ বা ওমলেট বানিয়ে আনবে? বললাম, ওমলেট বানিয়ে আনতে। আর এই ভ্রমণে এসে এই প্রথম নিজের ইচ্ছা এবং রুচিমত পেট ভরে খেতে পেলাম।

বুলেট ট্রেন বা হিকারি এক্সপ্রেস যখন নাগোয়া স্টেশনে প্রবেশ করল তখন হাতঘড়িতে দেখি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নয়টা। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ট্রেনটি আবার তীব্রবেগে ছুটতে শুরু করল তার নির্দিষ্ট পথের দিকে। হন্‌শু (Honshu) দ্বীপের দুই প্রান্তে দুটি বড় শহর। উত্তর প্রান্তে রাজধানী টোকিও শহর আর দক্ষিণ প্রান্তে ওসাকা শহর। মাশা জানালেন সমগ্র হন্‌শু দ্বীপের প্রায় সত্তর ভাগ লোক বসবাস করেন ঐ রেলপথের দু'পাশের শহরগুলিতে। তাই এই রেল লাইনটিকে বলা হয়—বর্তমান জাপানের মেরুদণ্ড। টোকিও থেকে ওসাকা পর্যন্ত সমস্ত পথটাই সমুদ্র এবং পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড় আর সমুদ্র যেন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। পথের ধারের দু'পাশের গ্রামগুলিতেও দেখি শহরের মত কোঠাবাড়ি, পীচের রাস্তা, ফ্লুরেসেণ্ট আলো আর মোটর গাড়ির ছড়াছড়ি। গ্রাম আর শহর যেন একাত্ম হয়ে গেছে।

কোথাও এতটুকু পতিত জমি পাচ্ছি না। চতুর্দিকে কেবল ক্ষেত আর খামার। মাশা জানালেন—ভূমি চষা হয় ট্র্যাকটরের সাহায্যে। আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্লাস-হাউস দেখিয়ে বললেন—ওগুলি হচ্ছে পরীক্ষাগার। অধিকাংশ ক্ষেতই দেখি পাতলা পলিথিন কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত। মাশা জানালেন যে যাতে পাখিরা ক্ষেতের ধান, গম, যব নষ্ট করতে না পারে সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে গাঁয়ের ছোট ছোট একতলা, দোতলা ও তিনতলা কংক্রীটের এবং কাঠের বাড়ি। কি বিচিত্র রং এগুলির। কংক্রীটের বাড়িগুলির পাকা ছাদ, তবে সেগুলি ঢালু। আর কাঠের বাড়িগুলির ছাদ কোনটা করোগেটেড-টিনের, কোনটা করোগেটেড-এলুমিনিয়ামের আবার কোনটা বা লাল টালির। নাগোয়া থেকে কিয়োতো আসতে ঠিক পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগল। আমরা উঠেছি টোকিও ইন হোটেলে।

কিয়োতো (Kyoto)

মিসেস্ মাশা বলতে শুরু করলেন কিয়োতোর ইতিকথা—এই কিয়োতো শহরের তিনদিকে পাহাড় আর এর অন্তস্থল দিয়ে বয়ে চলেছে কামো (Kamo) নদী। এই কামো নদীই হচ্ছে এই শহরের প্রাণ। এটি গিয়ে মিশেছে ওসাকা উপসাগরের সঙ্গে। ৭৯৪ সালে নারা থেকে জাপানের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এই কিয়োতো শহরে। এটি হল জাপানের দ্বিতীয় স্থায়ী রাজধানী। এই নতুন রাজধানীটি নির্মিত হল তৎকালীন চৈনিক রাজধানীর অনুকরণে এবং এটি

আয়তনে নারার চেয়েও অনেক বড়। এখানকার রাস্তাগুলি দাবা খেলার ছকের মত।

কিয়োতোতে রাজধানী স্থানান্তরের সময় থেকেই জাপানের ইতিহাসে হেইয়ান যুগের সূচনা হয়। এই যুগ স্থায়ী হয় ১১৯২ সাল পর্যন্ত। এই যুগটি হল জাপানের শিল্পকলার উন্নতির ক্ষেত্রে অন্যতম মহান যুগ। নবম শতাব্দীর শেষাশেষি চীন ও জাপানের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয় এবং সেই সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে জাপানের সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং রীতিনীতি। এই হেইয়ান যুগে উদ্ভব হল জাপানের নিজস্ব বর্ণমালা। কিয়োতোর আর এক নাম হচ্ছে উৎসব নগরী। কারণ এখানে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। একে আরও বলা হয় 'জাপানের আধ্যাত্মিক নিবাস'। জাপানের চারটি বৃহৎ জাতীয় শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে কিয়োতো হচ্ছে অন্যতম।

এখানেও আমরা উঠেছি পাঁচ-তারা যুক্ত হোটেলে। কিন্তু পকেট শূন্য। গড়ের মাঠ। এখানে আমাদের দলের সকলেরই ঠাঁই মিলেছে বারোতলার ওপরে। এখানেও সিং ও আমি এক ঘরেই আছি। মধ্যাহ্ন ভোজ সেরেই আমরা বাসে গিয়ে বসলাম। একটুও বিশ্রামের অবকাশ পেলাম না।

মিসেস্ মাশা জানালেন আমরা প্রথমে চলেছি হেইয়ান শ্রাইন (Heian Shrine) দেখতে। ওখানে কিন্তু কোন দেবমূর্তি নেই, ওটা হচ্ছে শিন্তো মন্দির বা স্মৃতিমন্দির। একটা লাল রঙের সেতু পার হলাম। মাশা সেতুটির নাম বললেন কিরয়ু (Keiryu) ব্রিজ। সেতু পেরিয়ে আমরা এলাম বিরাট একটা টোরী গেটের সামনে। দেখি এই টোরী গেটের নীচে দিয়ে একটা প্রশস্ত সড়ক চলে গেছে শিন্তো মন্দিরের প্রধান ফটক অবধি।

আমরা ওতেনমন (Otenmon) অর্থাৎ মঠ বা মন্দিরের প্রধান ফটকের কাছে এসে বাস থেকে নামলাম। এই ফটকটিকে জাপানীরা বলে শিম্মন (Shimmon) অর্থাৎ পবিত্র ফটক। এই ফটকের গৃহটি দোতলা। এটি কাঠের তৈরি। দেখতে প্যাগোডার মত। এর ঢালু ছাদ দুটিতে লাল রঙের টালি বসানো এবং এর কাঠের কাঠামো নীল রং করা। এটি নির্মিত হয়েছে ১২০০ বছর আগের হেইয়ান যুগের রাজপ্রাসাদ সিচো-চোডো হল (Seicho Chodo Hall)-এর ফটকের অনুকরণে।

হেইয়ান শ্রাইন Heian Shrine :—ফটক পেরিয়ে আমরা প্রথমে দেখতে এসেছি হেইয়ান জিঙ্গু শ্রাইন (Heian Jingu Shrine)। বিরাট

একটা হলঘর। মাশা জানালেন এটি হচ্ছে প্রধান উপাসনা কক্ষ। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন এর ইতিকথা—এটি হচ্ছে কিয়োতোর একটি আদি মন্দির। রাজধানী কিয়োতোর প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞ সম্রাট কাম্মু এখানকার মনোরম দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে ৭৯৪ সালে ঐ আদি মন্দিরটি এখানে স্থানান্তরিত করে মন্দিরটির নামকরণ করলেন হেইয়ান জিঙ্গু শ্রাইন। মন্দিরটি নির্মিত হল ৭৯৪ সালের পুরাতন রাজপ্রাসাদের অনুকরণে। প্রধান উপাসনা কক্ষের তিন পাশে সারিবদ্ধ ভাবে কাঠের থামের ওপরে টালির ঢালু ছাদ দিয়ে করা হয়েছে উপাসনা কক্ষে প্রবেশের পথ। উপাসনা কক্ষের এবং প্রবেশ পথের কাঠের থামগুলি লাল রং করা এবং বার্নিশ করা আর ছাদের টালিগুলির রং নীল।

উপাসনা কক্ষের পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে দুটি কাষ্ঠনির্মিত এবং কারুকার্যমণ্ডিত একতলা ভবন আছে। এই ভবনের ছাদ দুটি জাপানী সাইপ্রেস গাছের ছাল দ্বারা আচ্ছাদিত। এই ভবন দুটি নির্মিত হয় কিয়োতোতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা হবার ১১০০ বছর পূর্তির বার্ষিক স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে। একটি ভবন উৎসর্গ করা হয় রাজধানীর স্থাপক এবং কিয়োতোর প্রথম সম্রাট কাম্মুর নামে এবং অপরটি উৎসর্গ করা হয় কিয়োতোর শেষ সম্রাট কোমেইর নামে। এঁদের দুজনকে কিয়োতোবাসী তথা সমগ্র জাপানের অধিবাসী অভিভাবকের মত ভক্তি ও পূজা করেন।

এরপর আর দুটি ভবন দেখলাম। মাশা জানালেন—একটির নাম সোরিয়ু রো (Soryu-ro) অর্থাৎ গ্রীন ড্র্যাগন এবং অপরটির নাম বিয়াক্কো-রো (Byakko-ro) অর্থাৎ হোয়াইট টাইগার। এ দুটি ভবনেরও কাঠের কাঠামোটা লাল রং করা ও বার্নিশ করা এবং ছাদের টালির রং নীল। সারি সারি কাঠের খুঁটি বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে এর প্রবেশ পথ এবং এই খুঁটিগুলির মাথার ওপরে লতানো চেরিগাছ দিয়ে পথটাকে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। এই গাছগুলিকে বলে উয়ীপিং চেরি (Weeping Cherry)। পুষ্পশোভিত এই গাছগুলি এমন ভাবে বসানো হয়েছে মনে হচ্ছে যেন আমরা মহিলাদের চিত্রিত ছাতার নীচে দিয়ে যাচ্ছি। মাশা জানালেন এই গাছগুলির বয়স প্রায় আশি বছর।

আরও দুটি ভবন দেখলাম, যথা :—গিশিকি ডেন (Gishiki Den) বা আনুষ্ঠানিক হল। এখানে হামেশাই শিন্তো মতে বিবাহাদি অনুষ্ঠান হয়। আর চোকুশি কান (Chokushi Kan) বা সাম্রাজ্য সংক্রান্ত বার্তাবহদের হল। প্রতি বছর ১৫ই এপ্রিল বার্ষিক উৎসবের সময় সম্রাটের দূতগণ এইখানে থাকেন।

এই হলঘরের কাঠের দরজাগুলির গায়ের চিত্রাঙ্কন দেখে মুগ্ধ হলাম। মাশা জানালেন—এগুলি বিখাত জাপানী শিল্পী দোমোতো ইনশোর আঁকা।

এরপর আর একটি কাঠের বাড়ি দেখিয়ে মাশা বললেন—এই বাড়িটির নাম হচ্ছে সোবিকান। এটি কিয়োতোর পুরাতন রাজপ্রাসাদ থেকে সরিয়ে এখানে এনে রাখা হয়েছে। এর দরজাগুলিতে আঁকা রয়েছে বিখ্যাত জাপানী শিল্পী মোচিজুকি গিয়োকুকির ছবি। এর মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছবিগুলি হচ্ছে একদল সারস পাখি, একটা পাইন গাছ, এক ঝাড় বাঁশ ও একটা ফলন্ত কুলগাছ। এগুলি কিন্তু তুলি দিয়ে আঁকা নয়, এগুলি আঁকা হয়েছে রঙের গুঁড়ো ছিটিয়ে। ঘরের মধ্যে রয়েছে সম্রাট কোমেইর (Komei) পছন্দ মত নানা রকম ছবি, তাঁর ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, তরবারি, তামাক পাতা রাখবার ছোট থলি এবং সম্রাট মেইজির হস্তাক্ষর আর ঘরের কুলঙ্গিগুলিতে রয়েছে সম্রাজ্ঞী তেইমেইর (Teimei) রূপোর খেলনা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক জায়গায় ট্রামগাড়ির মত একটা গাড়ি দেখিয়ে মাশা জানালেন—১৮৯৫ সালে হেইয়ান শ্রাইন নির্মাণ করার সময়ে ঐ মন্দির তৈরির মাল-মসলা পরিবহণ করার জন্য এই গাড়িটি ব্যবহৃত হত।

এবারে আমরা এসেছি এই মন্দির সংলগ্ন বিখ্যাত বাগানে। মাশা বললেন—এটিকে চার ঋতুর বাগান বলা হয়। এর আয়তন হচ্ছে ৩০০০০ বর্গমিটার। যদিও এটিকে চার ঋতুর বাগান হলা হয়, আসলে এটি কিন্তু তিন ভাগে বিভক্ত। বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং শরৎ। বসন্তকাল হচ্ছে চেরি ফুলের সময়। বিভিন্ন জাতের চেরি গাছ আছে এই বাগানে। যেমন সোমেইয়ো শিনো (Someiyo Shino), ইয়ামাজাকুরা (Yamayakura), অৎসুমোনোজাকুরা (Atsumono-jakura) প্রভৃতি। বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন রঙের ফুল হয়। গ্রীষ্মে আইরিস (Iris) ফুলের শোভা। আইরিস গাছের পাতাগুলি তলোয়ারের মত দেখতে। এতে রামধনু রঙের ফুল হয়। এর ফুলগুলি অনেকটা ক্যানা ফুলের মত। আমরা এসেছি শরৎকালে। এখন বাগানের শোভা বর্ধন করছে বিভিন্ন পাতাবাহারী গাছ। কী বিচিত্র রঙের সব পাতাগুলি। মাশা জানালেন এই গাছগুলির নাম মেপল্‌স (Maples)। বাগানের মাঝখানে বিরাট একটা হ্রদ। তার নীল জলে ফুটে রয়েছে অসংখ্য পদ্মফুল এবং নানা রঙের ওয়াটার লিলি। সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে রাজহংসের দল। বাগানের পটভূমিতে রয়েছে হিগাশিয়ামা পর্বত। হ্রদের জলে পড়েছে এই পর্বতের প্রতিবিম্ব। মাশা জানালেন—শীতকালে এই পর্বত

তুষারাচ্ছাদিত হয়ে শ্বেতশুভ্র রূপ ধারণ করে এবং হ্রদের জলে ও বাগানেও পড়ে তুষারের আস্তরণ। তখন এখানে ফোটে নানা রকম শীতের ফুল।

জিদাই মাৎসুরি (Jidai Matsuri) :—এটি একটি স্মারক উৎসব। মাশা জানালেন এটি হল এই মন্দির এবং সমগ্র কিয়োতো শহরের সবচেয়ে বড় উৎসব। এটিকে বয়সের উৎসবও বলা হয়। এই উৎসব স্মরণ করিয়ে দেয় যে ১৮৯৫ সালের এই দিনেই এই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সম্রাট কাম্মু ও কোমেই রাজধানীর উন্নতি সাধনকল্পে যে সব মহৎ কাজ করে গেছেন তার জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। হাজার হাজার নরনারী যোগদান করে এই উৎসবে। তাদের পরণে থাকে হেইয়ান যুগের সূচনা থেকে মেইজি যুগের শেষ অবধি বিচিত্র ধরণের সাজ-পোশাক। স্বয়ং সম্রাটও যোগ দেন এই উৎসবে। সম্রাটের ঘোড়ায় টানা গাড়িকে সামনে রেখে নৃত্য-গীত, অভিনয় ও নানা রকম কৌতুক করতে করতে বের হয় বিরাট লম্বা লাইনের এক মিছিল। এতে নানা রকম প্রদর্শনীও থাকে। এই মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী আসে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান দেখতে।

এই বাগানের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে চেরিকুঞ্জের মধ্যে সুন্দর একটি একতলা কাঠের কুটির দেখিয়ে মাশা জানালেন, এটির নাম হচ্ছে চোশিন-তেই (Chosin-Tei)। এটি একটি চা কুটির। এখানে বিখ্যাত চা উৎসবের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করা হয়।

নিজো ক্যাসল্ (Nijo Castle) :—এখন আমরা এসেছি তকুগাওয়া শোগুনেতের প্রতিষ্ঠাতা ইয়েয়াসু তকুগাওয়ার বাসভবন দেখতে। এটি নির্মিত হয় ১৯০৩ সালে। মাশা জানালেন এই ভবনটি নির্মিত হয়েছে ঐ সামরিক শাসনকর্তার শৌর্য-বীর্যের প্রতীক স্বরূপ। কারণ জাপানে যত প্রাসাদ আছে সবই উঁচু পাঁচিল এবং পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু এই প্রাসাদটির চারপাশে কোন পরিখা নেই এবং এটি নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এতে প্রমাণিত হয় যে উক্ত শাসনকর্তার নিজের শক্তির প্রতি কী দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল। এই বিরাট ভবনটিও কাষ্ঠনির্মিত এবং একতলা। এর ঢালু ছাদেও টালি বসানো এবং এর প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে ত্রিভুজের মত তিনটি স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরটিতেই জাফরির কারুকার্য করা। এই ভবনটি প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। এই প্রাসাদের ভিতরে নিনোমারু (Ninomaru) নামে যে

হলঘরটি আছে তার আভ্যন্তরীণ জমকালো সজ্জা এবং কারুশিল্প জাপানের গর্বের বস্তু। এই প্রাসাদের মেঝে এমন ভাবে নির্মিত যে গৃহাভ্যন্তরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে পাখির মত পিক্ পিক্ শব্দে বেজে উঠবে বিপদ সংকেত। এতে সামরিক শাসনকর্তা বুঝতে পারবেন যে গৃহাভ্যন্তরে কোন অবাঞ্ছিত লোক বা গুপ্তঘাতকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তিনি নিজে সাবধান হবেন। এই মেঝেকে বলা হয় নাইটিংগেল্-ফ্লোর (Nightingale floor)।

কিন্‌কাকুজি টেম্পল (Kinkakuji Temple) বা স্বর্ণমণ্ডপ :— মনোরম বিরাট এক উদ্যানের মধ্যে এই ত্রিতল বিশিষ্ট মণ্ডপটির অবস্থিতি। মাশা এর ইতিকথা বলতে শুরু করলেন—এই মণ্ডপটির আদি নাম হচ্ছে রকুওনজি মন্দির (Rokuonji Temple)। আদি মন্দিরটি জেন বুদ্ধের (Zen Buddhism) রিনজাই সম্প্রদায় কর্তৃক ১৩৯৭ সালে নির্মিত হয়। মন্দির নির্মাণের পূর্বে এটি ছিল সাইয়োনজি কিন্‌ৎসুনে (Saionji Kintsune) নামে মুরোমচি যুগের (1336—1573) এক সামরিক শাসনকর্তার শৈলাবাস। তখন এর নাম ছিল কিতায়ামাদাই প্যালেস। তারপর যোশিমিৎসু নামে আশিকাগা শোগুন-এর তৃতীয় সামরিক অধিকর্তা এটি সাইয়োনজি কিন্‌ৎসুনের কাছ থেকে ক্রয় করেন। যোশিমিৎসু এটির পুনঃসংস্করণ করেন এবং এর পুরানো নাম বদলে নতুন নাম রাখেন কিতায়ামাদেন প্যালেস। তিনি তাঁর সামরিক সরকারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে বাকী জীবনটা এইখানেই কাটান এবং এই কিতায়ামাদেন প্রাসাদে একটি সোনালী রঙের মণ্ডপ তৈরি করিয়ে দিয়ে এর আর একটি নাম রাখেন স্বর্ণমণ্ডপ। তিনি এই মণ্ডপটির চতুর্দিকে একটি গভীর পুষ্করিণীও খনন করান। যোশিমিৎসুর মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুযায়ী এই প্যালেসের স্বত্ব জেন্-বুদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান মুসো কোকুশির (Muso Kokushi) হাতে সমর্পণ করা হয়। তিনি এই প্রাসাদকে পুনরায় মন্দিরে পরিণত করেন।

মাশা জানালেন—এখন আমরা যে স্বর্ণমণ্ডপটি দেখছি এটি কিন্তু আসল মণ্ডপ নয়। এটি নবনির্মিত মণ্ডপ। আসল মণ্ডপটি ১৯৫০ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তারপর ১৯৫৫ সালে হুবহু আদি মণ্ডপের অনুকরণে বর্তমান মণ্ডপটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। ভারী অদ্ভুত পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে এই তিনতলা কাষ্ঠমণ্ডপটি। প্রথম তলার পদ্ধতি হচ্ছে শিন্‌দেন্-জুকুরি অর্থাৎ ফুজিয়ারা যুগের প্রাসাদের পদ্ধতি। একে বলা হয়

হোসুই-ইন্ (Hosui-In)। দ্বিতীয় তলার পদ্ধতি হচ্ছে বুকে-জুকুরি অর্থাৎ কামাকুরা যুগের সামুরাইদের গৃহ নির্মাণের পদ্ধতি। একে বলা হয় চুন্-দো (Choon-Do)। আর তৃতীয় তলার পদ্ধতির নাম হচ্ছে কারায়ো অর্থাৎ চৈনিক গৃহ নির্মাণের বা জেন সম্প্রদায়ের মন্দির নিমাণের পদ্ধতি। একে বলা হয় কুক্কিয়ো-চো (Kukkyo-Cho)। এই মণ্ডপের দ্বিতল এবং ত্রিতলটি সোনালী রং করা এবং তাতে বার্নিশ করা। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন বা স্বর্ণমণ্ডপ। এর পাতায় ছাওয়া চালে একটা পাতলা তক্তার ওপরে বসে আছে আগুনে পোড়া ছাই থেকে উত্থিত সোনালী রঙের একটা ফিনিক্স (Phœnix) পাখি। এই ফিনিক্সটি হচ্ছে, এর আগুনে পুড়ে যাবার প্রতীক।

এই মণ্ডপের বিরাট হলঘরটি নির্মাণ করিয়েছেন সম্রাট গোমিজু। এখানে একটা বেদির ওপরে বসানো রয়েছে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব ভঙ্গিমায় বিরাট এক মূর্তি। এই মূর্তি নির্মাণ করেছেন জাপানের বিখ্যাত শিল্পী যেচো। জাপানের রাজকুমারী তোফুকুমোনিন এই বিগ্রহের নিত্য পূজা করতেন। মণ্ডপের পিছন দিকে প্রস্থানের পথের কাছে ফুদো-দো নামে একটা ছোট মন্দির আছে। এই মন্দিরের ভেতরে ফুদোমিওর একটি প্রস্তর মূর্তি রয়েছে। তিনি এই মণ্ডপের অভিভাবক-রূপে পূজিত হন। এই মণ্ডপটিকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

এইবার আমরা দেখতে এলাম রকুওনজি বা কিন্‌কাকুজি মন্দির সংলগ্ন উদ্যানটি। মাশা জানালেন—এটি হচ্ছে জাপানী উদ্যানের পুরাতন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ স্মারক। এই উদ্যানের পশ্চিম দিকের পটভূমিতে রয়েছে কিনুগাসায়ামা পর্বত। উদ্যানের বুক জুড়ে রয়েছে বিরাট স্বচ্ছ এক হ্রদ। হ্রদটির নাম কিয়োকো-চি অর্থাৎ মুকুর হ্রদ। এই হ্রদের জলে কিনুগাসায়ামা পর্বত সমেত সমগ্র স্থলভাগের চিত্র প্রতিফলিত হয়, তাই একে বলা হয় মুকুর হ্রদ। হ্রদের মাঝে এদিকে ওদিকে ছড়ানো রয়েছে ছোট বড় অনেকগুলি দ্বীপ।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলাম বাগানের উত্তর প্রান্তে। এখানে রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ, ফোয়ারা, পুকুর এবং কৃত্রিম ঝরণা ইত্যাদি। তারপর উঠলাম ছোট একটা টিলার ওপরে। সেখানে দেখি পরিত্যক্ত ছোট একটা কাঠের ঘর রয়েছে। তার গায়ে লেখা রয়েছে 'সেক্কাতেই'। মাশা জানালেন এটি সাবেকী একটি চা-ঘর। সম্রাট গোমিজু তাঁর বৃদ্ধ বয়সে এই ঘরে বসে চা পান করতেন। ফেরার পথে অদূরে সাদা ফুলভরা একটা গাছের দিকে মাশার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে

চাইলাম ওটা কী গাছ। মাশা জানালেন ওটি হচ্ছে সাইপ্রেস্ (cypress) গাছ, তবে সাদা সাদা গুলি ফুল নয়, ওগুলি সব সাদা কাগজের টুকরো বাঁধা রয়েছে। জাপানী মহিলারা হয় ভগবান বুদ্ধের কাছে নয়তো তাঁদের পূর্বপুরুষের কাছে মানত জানিয়ে এগুলি বেঁধেছেন। আমাদের দেশের তীর্থস্থানগুলিতে গেলেও গাছের ডালে এই রকম কাপড়ের টুকরো এবং ঢিল বেঁধে মানত করার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

গিন্‌কাকুজি টেম্পল্ (**Ginkakuji Temple**) **বা রৌপ্যমণ্ডপ :—** স্বর্ণমণ্ডপের সঙ্গে এটির নামের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে বটে, কিন্তু আসলে দুটির স্থাপত্য শৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। স্বর্ণমণ্ডপের দ্বিতল এবং ত্রিতল দুটি সোনালী রং করা, এতে রূপালী রঙের কোন বালাই নেই। এটি একটি একতলা কাষ্ঠমণ্ডপ, দাঁড়িয়ে আছে বালুময় পাথুরে একটি উদ্যানের ওপর। মাশা বলতে শুরু করলেন এর ইতিকথা—এটি নির্মিত হয়েছে সামুরাইদের গৃহ নির্মাণের পদ্ধতিতে। ১৪৮৯ সালে এটি নির্মাণ করান আশিকাগা শোগুনের আর এক সামরিক শাসনকর্তা। এইটি ছিল তাঁর গ্রাম্য বাসভবন। অবসর গ্রহণের পর তিনি এইখানেই বসবাস করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই মণ্ডপের বাইরের এবং ভেতরের দেওয়ালগুলি রূপোর পাত দিয়ে মুড়ে দেবেন। তাই তিনি এর নাম রেখেছিলেন 'গিন্‌কাকুজি' বা রৌপ্যমণ্ডপ। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূরণের আগেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটিকে বৌদ্ধ মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়। স্বর্ণমণ্ডপটি যেমন একটি গভীর পুষ্করিণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত তেমনই এরও সামনে একটি বিরাট পুকুর আছে। এই পুকুরের চারধারে বসানো হয়েছে নানা রকমের গাছ এবং বড় বড় পাথরের ঢিবি। দেখলে মনে হয় যেন একটা মরুদ্যান। এটিকেও এঁরা জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

এরপর ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা হোটেলে ফিরলাম। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। একটু চা কিম্বা কফি পান না করলে এই পিপাসা দূর হবে না। সাহাদাকে অনুরোধ করা হল একটু চা বানাবার জন্য। সাহাদা জানালেন তাঁর চায়ের ভাণ্ডার বাড়ন্ত। অগত্যা যে যার নিজের খরচায় চা পানের জন্য ঢোকা হল আমাদের হোটেলেরই রেস্তোরাঁতে। আমি সাহাদা এবং মুখার্জীদা খেলাম এক কাপ করে কফি, একটা করে হ্যাম-স্টেক্ ও একটা করে পেস্ট্রি। আর সিং হ্যাম্-স্টেকের বদলে খেল ভেজিটেব্‌ল্-স্টেক্। আহারান্তে রেস্তোরাঁর

বিল দেখে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। এক কাপ কফির দাম ৩০০ ইয়েন অর্থাৎ ৯ টাকা, আর স্টেক্ এবং পেষ্ট্রির প্রত্যেকটির দাম ১৫০ ইয়েন অর্থাৎ সাড়ে চার টাকা করে। এক এক জনের একুনে পড়ল ৬০০ ইয়েন অর্থাৎ ১৮ টাকা করে। সিং জানে না যে এখন আমি প্রায় ৩০ মার্কিন ডলারের মালিক, তাই আমি পকেটে হাত ঢোকাবার আগেই সে আমার বিলটাও মিটিয়ে দিল।

নৈশভোজ সারা হল মিসেস্ লালকাকার নির্ধারিত মেনু অনুযায়ী। আহারান্তে সিং ও আমি মাশাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জাপানের বিখ্যাত পুতুলনাচ বা বুনরাকু (Bunraku) দেখতে। গিয়ন কর্ণারে কামো (Kamo) নদীর ধীরে একটা প্রেক্ষাগৃহে আমরা ঢুকলাম। প্রত্যেককে দর্শনী দিতে হল ৯০০ ইয়েন বা ২৭ টাকা করে। সব টাকাই সিং দিল।

বুনরাকু (Bunraku) পুতুল নাচ বা পুতুল নাট্য :—সমগ্র বিশ্বে প্রায় আদিকাল থেকে চলে আসছে এই পুতুলনাচ বা পুতুল নাট্য। জাপানেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নাটক শুরু হতে তখনও দেরি আছে। ইত্যবসরে মাশা আমাদের শোনালেন এই বুনরাকুর ইতিকথা—নৌ নাট্যের পরেই জাপানে উদ্ভব ঘটল পুতুল নাট্যের। তখন এর নাম ছিল নিনগিও (Ningyo)। এর প্রাধান্য ঘটল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। কারণ ঐ সময়ে কাবুকি নাটকের অভিনেত্রীদের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে ঐ নাটক জনসাধারণের বিরাগভাজনের কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই তৎকালীন শাসক সম্প্রদায় এই কাবুকি দলগুলিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি এর সঙ্গে সংযুক্ত হল জোরুরি (Joruri) এবং শ্যামিসেন (Shamisen) এবং এর নতুন নামকরণ করা হল বুনরাকু।

মাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম—জোরুরি এবং শ্যামিসেন কী? তিনি উত্তরে জানালেন—জোরুরি হচ্ছে গীতিকবিতা। এককালে জোরুরি নামে জাপানে এক সুগায়িকা ছিলেন। তাঁর কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয় গান এবং তাঁর উপকথা নিয়ে এই গীতিকবিতার উৎপত্তি। আর শ্যামিসেন হচ্ছে ব্যাঞ্জোর মত দেখতে তিন তারের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। এর নীচের ঢপটা সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি। ষোড়শ শতাব্দীতে ওকিনায়া দ্বীপে এই জোরুরি এবং শ্যামিসেনের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি জোরুরি জাপানে এলো ওকিনায়া দ্বীপ থেকে আর শ্যামিসেন এলো চীন থেকে লুচু দ্বীপ হয়ে। তখন জাপানের অধিবাসীরা এই জোরুরি এবং শ্যামিসেন শোনার জন্য পাগল। তাই এই দুটিকে

বুনরাকুর সঙ্গে সংযুক্ত করে বুনরাকুকে আরও আকর্ষণীয় করা হল। এখন বুনরাকু হচ্ছে একটি ত্রিবিধ অনুষ্ঠান। অর্থাৎ নাটক, গীতিকবিতা এবং বাজনার সমন্বয়। জাপান এখন এই বাদ্যযন্ত্রটির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে এর নীচেকার ঢপটি সাপের চামড়ার বদলে বিড়ালের চামড়া দিয়ে তৈরি করছে। বুনরাকু হচ্ছে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জাপানের লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান সম্পদ। এর জন্য জাপান বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারে।

নাটক শুরু হল। এটি সম্রাট মেইজির রাজত্বকালে ১৯০৪-১৯০৫ সালের রুশো-জাপানী যুদ্ধের কাহিনী। এতে যুদ্ধ জাহাজ কামান ও বন্দুক ছোড়া সবই দেখানো হয়েছে। কাহিনীকারের বর্ণনায়, কামান ও বন্দুকের গর্জনে এবং বাদ্যযন্ত্র ও আলোর সাহায্যে এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করা হল। সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হল। এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করল। ফিরে পেল তার দক্ষিণ সাখালিন দ্বীপ, যেটিকে ১৮৭৫ সালে রাশিয়ার হস্তে সমর্পণ করা হয়েছিল কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের বিনিময়ে। অধিকার করল ফরমোসা এবং কোরিয়া। এ ছাড়া মাঞ্চুরিয়াতেও বিশেষ স্বত্ব লাভ করল।

পুতুল নাট্য শেষ হল রাত সাড়ে এগারোটায়। মিসেস মাশা, সিং এবং আমি তিনজনে পায়ে হেঁটে আমাদের হোটেলে ফিরছি। পথে যেতে যেতে মাশাকে অনুরোধ করলাম এই পুতুলগুলি এবং তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। মিসেস মাশা জানালেন, পুতুলগুলি সব কাঠের তৈরি এবং লম্বায় প্রায় ৩।৪ ফিট হবে। এই পুতুলগুলির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুলে আলাদা করা যায় এবং প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনাও করা যায়। পুতুলগুলি কেবল চলাফেরাই করে না—হাত, পা, হাতের আঙুল, ঠোঁট, চোখের পাতা এবং ভুরুও নাড়ায়। এমন কী চোখের তারাও ঘোরায়। এগুলি সব করা হয় সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে। প্রতিটি পুতুল পিছু তিনজন করে ম্যানিপিউলেটর (Manipulator) থাকে। তারাই এই পুতুলগুলির নাটকীয় গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। আগে পুতুলগুলি ছিল ফাঁপা, হাল্কা এবং আকারে অনেক ছোট। পুতুলগুলির নীচের দিকে গর্ত ছিল। নিয়ন্ত্রণকারীরা এই গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে, আঙুল দিয়ে পুতুলগুলিকে পরিচালনা করতেন। ঐ নিয়ন্ত্রণকারীদের আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা থাকত। তাদের বলা হত কুরোগো (Kurogo)। পুতুলগুলির সাজ-পোশাক এবং এই পুতুল নাট্যের কাহিনী, পরিবেশ ও মঞ্চসজ্জা আজও অতীত জাপানের ঐতিহ্য বহন করছে।

হোটেলে ফিরতে রাত সাড়ে বারোটা হল। ধড়াচূড়া ছেড়ে মুখ, হাত, পা ধুয়ে ওদের দেওয়া পোশাক পরে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম বকের পালকের মত ধপধপে সাদা বিছানায়—নিদ্রাদেবীর কৃপা লাভ করতে এতটুকু বিলম্ব হল না।

ঘুম ভাঙল সকাল ছ'টায়। না না, পাখির ডাকে নয়, সিং-এর ডাকে। সুন্দর প্রভাত। ঘর ভরে গেছে সোনালী রোদে। ইতিমধ্যে সিং-এর প্রাতঃকৃত্য, স্নান, পূজা গোছগাছ সবই সারা হয়ে গেছে। আমিও ধড়মড়িয়ে উঠে কাল-বিলম্ব না করে তৈরি হয়ে নিলাম। আজ সকাল আটটার মধ্যে আমাদের হোটেল ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের দুটো সুটকেস ঘরের দোরগোড়ায় রেখে সিং এবং আমি সোজা চলে এলাম খাবার ঘরে। এসে দেখি প্রায় সকলেই এসেছে, আসেনি কেবলমাত্র দুজন লেটলতিফ অর্থাৎ সমর এবং বাসুদেব। ছোট-হাজরি খেয়ে পেট ভরে গেল। ছোট-হাজরীর মেনু ছিল এক গেলাস আপেলের রস, বড় চাকার মত করে কাটা টোস্ট, যে যার ইচ্ছামত নিতে পারেন।' মাখন এবং পনির, দুটো মুরগীর ডিম বা ভেজিটেবল কাটলেট একটা, ফ্রায়েড বেকন বা আলুভাজা এক প্লেট, সঙ্গে আনারসের জেলি এবং কফি।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। আমরা এসেছি কিয়োতোর শিরাহামা (Shirahama) স্টেশনে। এখান থেকে কিন্‌কি-নিপ্পোন (Kinki-Nippon) রেলের ডিল্যুক্স ভিস্টা কার-এ করে আমরা যাব নারা (Nara) শহর দেখতে। কিয়োতো থেকে নারার দূরত্ব মাত্র ৪২ কিলোমিটার বা ২৬ মাইল।

আমাদের টিকিট মিসেস মাশা আগে থেকেই কিনে রেখেছেন। কারণ এই ট্রেনের সবই সংরক্ষিত আসন। এই ট্রেনটি ছয়টি বগি নিয়ে গঠিত। এর প্রত্যেকটি বগিই দোতলা। ঠিক ন'টায় গাড়ি ছাড়ল। সমস্ত গাড়িটাই শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। এর বসবার গদি আঁটা আসনগুলি দু'পাশের জানালার ধারে। ইচ্ছা হলে পিঠ রাখবার স্থানটা একটু পিছনে হেলিয়ে দিয়ে আরামে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। দু'পাশের জানালায় রঙীন কাচ আঁটা এবং তাতে পর্দা ঝোলানো। বগির মাঝখানে যাতায়াতের পথ, সেখানে মাদুর বিছানো। এই পথ দিয়ে অন্যান্য বগিতেও যাতায়াত করা যায়। সুবেশা সুন্দরী তরুণীরা হাত, মুখ মোছার জন্য দিয়ে গেল গরম জলে ভেজানো সুগন্ধী তোয়ালে। এরপরে সকলকেই দিয়ে গেল এক গ্লাস করে ঠাণ্ডা ফলের রস। তারপর তারা ট্রলিতে করে বিক্রি করার জন্য নিয়ে এলো নানা রকম সিগারেট, মদ, প্রসাধন সামগ্রী, চকোলেট, লজেন্স ও নানা রকম খাদ্যসামগ্রী। বেলা সাড়ে ন'টায় আমরা নারা স্টেশনে পৌঁছলাম।

নারা (Nara)

স্টেশনে সকলকে একত্রিত করে মাশা আমাদের শোনালেন নারা শহরের ইতিহাস। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপানের প্রথম স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয় এই নারা শহরে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে চীন ও কোরিয়ার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্ম জাপানের এই শহরে প্রথম প্রবেশ লাভ করে। তারপর এখানে স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠা হবার পর তা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে সমগ্র জাপানে। এই ধর্ম কেবল বিস্তার লাভই করল না, তা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেল জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব বেশি বলে একে 'শান্তির শহর'ও বলা হয়।

নারা শহরটি তৈরি হয়েছে চীনা শহরের অনুকরণে এবং চীনের সরকার গঠনের পদ্ধতির নিদর্শনে তৎকালীন জাপ সম্রাট এইখানেই তাঁর নিজস্ব সরকার গঠন পদ্ধতি রচনা করেন। ৭১০ থেকে ৭৮৪ সাল পর্যন্ত জাপানের সম্রাট ও তার পরিবারবর্গ এই নারা শহরেই বসবাস করতেন এবং এখান থেকেই ক্রমে ক্রমে দেশের সর্বত্র শাসনক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। এখানে স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে প্রত্যেক সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীও স্থানান্তরিত হত।

এইবার আমরা চারজন এক একটি দলভুক্ত হয়ে ট্যাক্সি করে চললাম এখানকার বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে। প্রত্যেক ট্যাক্সিটাই নতুন এবং তাতে লাগানো রয়েছে ছোট একটা টেলিভিসন সেট এবং বার্তা গ্রহণের একটি বেতার যন্ত্র। এগুলি রয়েছে ড্রাইভারের সামনে। এই বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে পুলিস গাড়িগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোন রাস্তা জ্যাম থাকে তাহলে পুলিস বেতার মারফৎ গাড়ির ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় গাড়ি অন্য পথে ঘুরিয়ে নেবার জন্য। সাহাদা, মুখার্জীদা, সিং এবং আমি উঠেছি এক গাড়িতে। আমাদের গাড়ির চালক স্থানীয় এক যুবতী। মুখার্জীদাকে বিড়ি টানতে দেখে চালক জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি ইণ্ডিয়ান সিগারেট? উত্তরে মুখার্জীদা জানালেন—না, এটা বিড়ি। এই বলে একটা বিড়ি ধরিয়ে তাকে দিলেন। যুবতীটি বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবং মনের আনন্দে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে গাড়ি চালাতে লাগল।

টোডাইজি টেম্পল (Todaiji Temple) :—এটি একটি বুদ্ধ মন্দির এবং বর্তমানে এটি কেগন সম্প্রদায়ের প্রধান কর্মকেন্দ্র। এই মন্দির সংলগ্ন

স্থানের পরিমাপ হচ্ছে ৩৮০০ একর। মন্দিরের হলঘরটি ছাড়াও এই চত্বরে রয়েছে দুটি কাষ্ঠনির্মিত পাচতলা প্যাগোডা এবং আরও অনেকগুলি সুদৃশ্য কাষ্ঠভবন। আদি মন্দির ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দু-দুবার সর্বগ্রাসী অনলদেব মূর্তিসহ মন্দিরটিকে গ্রাস করেন। এগুলিকে আবার নতুন করে নির্মাণ করানো হয় যথাক্রমে ১৬৯২ সালে এবং ১৭০৮ সালে। মন্দিরের প্রধান হলঘরটিতে রয়েছে যোগাসনে বসা ভৈরোচনা (Vairochana) ভঙ্গিমায় বুদ্ধের বিরাট এক ব্রোঞ্জের মূর্তি। মাশা জানালেন আদি মূর্তিটির উচ্চতা ছিল ৭২ ফিট। বর্তমান মূর্তিটি এবং মন্দির ভবনটি মৌলিক মূর্তি ও মন্দির ভবনের চেয়ে ৪০ শতাংশ ছোট, তথাপি আজও এই মূর্তিকে এবং মন্দির ভবনকে বিশ্বের বৃহদাকার কাষ্ঠ ভবন বলে গণ্য করা হয়।

এরপর মিসেস মাশা আমাদের শোনালেন মূর্তির মাপজোপ : এটি উচ্চতায় ১৬·২ মিটার বা ৫৩·২৮ ফিট, মুখমণ্ডল ৪·৮৪ মিটার বা ১৫·৯১ ফিট, চোখ— ১·৮১ মিটার বা ৩·৮৮ ফিট, নাক—০.৪৮ মিটার বা ১·৫৯ ফিট, কান—২·৫৮ মিটার বা ৮·৪৬ ফিট এবং হাতের বুড়ো আঙুল—১·৬৪ মিটার বা ৫·৩৭ ফিট। একবার অনুমান করুন কী বিরাট এই মূর্তি।

ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির দু'পাশে রয়েছে আরও দুটি বিরাটাকার মূর্তি। এঁরা হচ্ছেন বুদ্ধদেবের প্রহরী। এঁরা বুদ্ধদেবকে অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এই বুদ্ধমূর্তির জাপানী নাম হচ্ছে নারা-নো-দাইবুৎসু (Nara-No-Daibutsu) বা বৃহত্তম বুদ্ধ। কেগন ধর্মসম্প্রদায়ের বক্তব্য হচ্ছে—সারা বিশ্ব যেমন সূর্যের আলোকে আলোকিত, আমাদের এই বুদ্ধদেবও তেমনি সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন।

মন্দির ভবনের উত্তর-পশ্চিম দিকে আর একটি তালাবন্ধ গৃহ দেখিয়ে মাশা বললেন—এটি শোসোইন (Shosoin) অর্থাৎ মূল্যবান ধনসম্পদের ভাণ্ডার। এর ভেতরে আছে কোন এক সম্রাটের দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা নানা রকম চারুকলা, ললিতকলা ইত্যাদি সামগ্রী। আর রয়েছে সম্রাটের গৃহস্থালির ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিসপত্র।

এই মন্দির চত্বরের গৃহগুলির মধ্যে নিগাৎসুডো হল (Nigatsudo Hall) এবং সঙ্গাৎসুডো হল (Sangatsudo Hall) উল্লেখযোগ্য। এই হলঘর দুটিতে রয়েছে বুদ্ধের নানা ভঙ্গিমার অসংখ্য মূর্তি। এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে এই মন্দিরের ঘণ্টাঘর।

কাসুগা শ্রাইন (Kasuga Shrine) :—ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা পায়ে হেঁটে একটা টিলার ওপরে উঠছি। সেখানে মন্দির। বেলে পাথরের নুড়ি ফেলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেশ প্রশস্ত পথ তৈরি করা হয়েছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে কানে ভেসে আসছে নানা রকম পাখির কলরব। পথের দু'ধারে পাথরের তৈরি অসংখ্য লণ্ঠন ঝুলছে। এই লণ্ঠনগুলির কথা মাশার কাছে জানতে চাওয়াতে তিনি জানালেন যে এগুলি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মন্দির দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে ৮০০ বছরের পুরনো কিছু লণ্ঠনও আছে।

অনেকটা পথ উঠে আমরা জঙ্গলের ভেতর কাঠের তৈরি একতলা একটা মন্দিরের কাছে এলাম। মন্দিরের আশেপাশে আরও অনেকগুলি কাঠের ঘর রয়েছে। এর মধ্যে একটি কার্যালয়, বাকীগুলি পুরোহিতদের থাকবার ঘর। মন্দিরটি এবং ঘরগুলি টকটকে লাল রং করা ও বার্নিশ করা এবং নানা রকম কারুকার্য করা। ঘন সবুজ রঙের কাঠের নীচু রেলিং দিয়ে সমস্ত চত্বরটি ঘেরা। মন্দিরের পিছনে রয়েছে ছোট একটা পাহাড়। অপূর্ব রঙের পার্থক্য দেখানো হয়েছে এই মন্দির এবং ঘরগুলিতে। এখানেও দর-দালানের ছাদের প্রান্তভাগে ঝুলতে দেখা যাচ্ছে পাথরের তৈরি অসংখ্য লণ্ঠন।

মাশা আমাদের শোনালেন এই মন্দিরের ইতিহাস। এটি অতি পুরাতন একটি শিন্তো মন্দির। এর অভ্যন্তরে রয়েছে ফুজিয়ারা গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি। তাঁরা অভিভাবক দেবতারূপে এই মন্দিরে পূজা পান। এই ফুজিয়ারা বংশ অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জাপানের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তারপর পাথরের তৈরি লণ্ঠনগুলি দেখিয়ে বললেন—পথের ধারের লণ্ঠনগুলি এবং এই মন্দির সংলগ্ন লণ্ঠনগুলি সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ লণ্ঠন আছে এখানে।

মাশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লণ্ঠনগুলি কি প্রতি সন্ধ্যায় জ্বালানো হয়?

মাশা জানালেন, না। সামান্য কিছু আলো জ্বালানো হয় প্রতি সন্ধ্যায়। সমস্ত আলো জ্বালানো হয় কেবলমাত্র সেৎসুবুন (Setsubun) রাতে। শীতকালের শেষ দিনকে জাপানী ভাষায় বলা হয় সেৎসুবুন। চান্দ্র মাসিক পঞ্জিকা অনুযায়ী এই দিনটি পড়ে ফেব্রুয়ারী মাসের ৩ কিম্বা ৪ তারিখে। সেদিন সমগ্র জাপানে এবং এখানেও বিরাট উৎসব হয়। সেই উৎসবে কল্পিত শয়তানের উদ্দেশ্যে শিম বা বীন (Bean) ছোড়া হয় আর চিৎকার করে বলা হয়—দুরাত্মা দূর হও, শুভাত্মা ফিরে এসো। সেদিন সারা রাত ধরে চলে নাচ গান এবং উৎসব। এই উৎসবকে বলা হয় দীপান্বিতা উৎসব কিংবা শিম ক্ষেপণ করা উৎসব।

এ ছাড়া ১৭ই ডিসেম্বরে এখানে আর একটি উৎসব হয়, তাকে বলে মাৎসুরি (Matsuri) উৎসব। নারী ও পুরুষেরা বিচিত্র সব মুখোশ পরে এবং প্রাচীন কালের সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে এখানে এসে সমবেত হয়। তারপর নাচ-গান এবং হাস্য-কৌতুক করতে করতে মিছিল করে পথ পরিক্রমা করে।

আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হয়েছে। মাশা জিজ্ঞাসা করলেন, কী খানা খাবে তোমরা—জাপানী খানা না পাশ্চাত্য খানা?

সমবেত কণ্ঠে আমরা জানালাম, পাশ্চাত্য খানা।

মাশার নির্দেশমত ড্রাইভার আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল। অগণিত টকটকে লাল রঙের টোরী (Torii) গেটের নীচ দিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছে। সাহাদা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই পথ দিয়ে যাবেন?

ড্রাইভার জানাল—না। এগুলি বিভিন্ন জাপানী পরিবার নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। এগুলি হচ্ছে তাঁদের পরিবারের কোন স্মরণীয় ঘটনাবলির নিদর্শন।

একটা বাঁকের কাছে এসে ড্রাইভার আঙুল দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল—ঐ যে কাঠের বাড়িটা দেখছেন ওটা হচ্ছে ফুশিমি মোনোয়ামা ক্যাস্‌ল্ (Fushimi Monoyama Castle)। ওখান থেকে সমগ্র নারা এবং কিয়েতো শহর দেখা যায়। তারপর খাদের দিকে আঙুল দিয়ে আর একটি মন্দির দেখিয়ে জানাল—ওটি হচ্ছে ফুশিমি শ্রাইন (Fushimi Shrine)।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল ফুশিমি ইনারি শ্রাইনের ফটকের সামনে। ড্রাইভার আমাদের মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গেল দেবদাসী নৃত্য দেখাবার জন্য। এটি একটি স্মৃতিমন্দির। দেখি বিরাট একটা হলঘরের মধ্যে টকটকে লাল নাচের পোশাকে জাপানী যুবতীরা নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গী করে নাচছে।

ড্রাইভার জানাল এরা সকলেই মন্দিরের সেবাদাসী এবং কুমারী।

মিনিট পাঁচেক নাচ দেখে আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। আমাদের গাড়ি নারা হোটেলের সামনে এসে থামল।

মিসেস মাশা আমাদের নিয়ে ঢুকলেন নারা হোটেলের রেস্তোরাঁতে। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার যোগাড়, তাই চারজন বাদ প্রায় সকলে প্রথমেই বিয়ারের ফরমাশ করল। এ খরচা কিন্তু হিজ-হিজ হুজ-হুজ (His His, Whose Whose) অর্থাৎ যার যার তার তার। সাহাদা, মুখার্জীদা, সিং এবং আমি ফরমাশ করলাম চার বোতল সাকুরা বিয়ার। জাপানীরা চেরি ফুলকে সাকুরা

বলে। এরপর কোম্পানির খরচায় এলো টম্যাটো স্যুপ, পাঁউরুটি, মাখন, সাদা মোটা ভাত, ব্যাঙের ছাতা, বাঁশের অঙ্কুরের তরকারি, গ্রেভি চিকেন ও আইসক্রীম।

উদরানলে কিছু আহুতি দিয়ে গদাই লস্করী চালে বেরিয়ে এলাম। মুখার্জীদা ওদের সকলকে মুক্ত হস্তে বিড়ি বিতরণ করছেন এবং ওদের সঙ্গে বেশ রসিকতাও করছেন। আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এসে পড়লাম নারা পার্কের কাছে। পার্কে প্রবেশ পথের দু'পাশে পসারিণীরা নানা রকম পসরা সাজিয়ে বসেছে। এখান থেকে মাশা এক প্যাকেট বিস্কুট এবং কিছু গম কিনে নিলেন।

নারা পার্ক (Nara Park) :—১২৫০ একর পাহাড়ী জমির ওপর গড়ে উঠেছে ঝোপঝাড় সম্বলিত এই মনোরম উদ্যানটি। এটিকে মৃগোদ্যানও বলা হয়। কারণ একদা কাসুগা শ্রাইনের পুরোহিতরা বিশেষ ধরণের এবং নানা জাতের কিছু হরিণ শাবক ছেড়েছিলেন এই উদ্যানে। বংশবৃদ্ধি পেয়ে এখন তারা সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে হাজারের ওপর। জাপানীরা হরিণগুলিকে দেবতার পবিত্র দূত হিসাবে গণ্য করেন। উদ্যানে প্রবেশ করা মাত্র হরিণের দল আমাদের পিছু নিল। মাশা তাঁর বিস্কুটের প্যাকেট খুলে হরিণগুলিকে দিতে দিতে চললেন। তারাও চলল আমাদের পিছু পিছু। তারপর বিস্কুটের প্যাকেট শেষ হতে তারা আবার অন্য লোকের পিছু নিল। কিছু দূর যাবার পর আমাদের ছেঁকে ধরল একঝাঁক পায়রা। মাশা একমুঠো গম নিয়ে মুঠোটা মেলে ধরলেন পায়রাদের সামনে। তারা মাশার হাতে, কাঁধে এবং মাথার ওপরে বসে নির্ভয়ে খেতে লাগল ঐ গম। এদের মতে এই উদ্যানের হরিণ এবং পায়রাদের খাওয়ানো পুণ্য কর্ম। এই পায়রাদের খাইয়ে পুণ্য অর্জন প্রথা ভেনিসেও প্রচলিত আছে। এই উদ্যানের এদিকে ওদিকে আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অতীত দিনের বহু ঐতিহাসিক স্মারক।

কোফুকুজি টেম্পল্ (Kofukuji Temple) :—এটি হচ্ছে ফুজিয়ারা জাতির (Fujiwara Clan's) বংশ পরম্পরাগত রক্ষণাবেক্ষণকারী দেবতার মন্দির। এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ৭১০ সালে। এর অবস্থিতি নারা পার্কের পশ্চিম দিকে। একদা এই মন্দির সংলগ্ন স্থানে ১৭৫-টিরও অধিক ঘরবাড়ি ছিল। মধ্যযুগের কোন এক সময় এই ঘর-বাড়িগুলিতে থাকত হাজার হাজার মঠবাসী সন্ন্যাসী যোদ্ধার দল এবং তৎকালীন ফুজিয়ারা বংশের সম্রাটগণ এখান থেকেই নিকটস্থ প্রদেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু

বারবার বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে এর অধিকাংশ বাড়ি-ঘর বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন যেগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলি সব পুনর্নির্মিত। মুখ্য কাঠামো যেগুলি পুনর্নির্মিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে :—একটি তিনতলা কাঠের প্যাগোডা, পুনর্নির্মিত হয় ১১৪৩ সালে। ১২০৮ সালে পুনর্নির্মাণ করা হয় হকুএন্দো (Hokuendo) নামে একটি কাষ্ঠভবন। এর পুবদিকের কারুকার্যমণ্ডিত প্রধান হলঘরটি পুনর্নির্মাণ করা হয় ১৪১৫ সালে। এই হলঘরের মধ্যে রয়েছে কতকগুলি প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তি। এগুলিকে এরা জাতীয় সম্পদ করে রেখেছে। আর ১৪২৬ সালে পুনর্নির্মিত হয় এর দর্শনীয় পাঁচতলা কাঠের প্যাগোডাটি। এই প্যাগোডাটির সামনে সরুসায়া (Sarusawa) নামে বিরাট এক সরোবর রয়েছে। সেখানে নানা রকমের রঙীন মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সরোবরের স্থির স্বচ্ছ জলে প্যাগোডাটির প্রতিবিম্ব পড়েছে। আসলে নকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

হোরিয়ুজি টেম্পল্ (**Horiyuji Temple**) :—মাশা জানালেন এইটিই আজকে আমাদের শেষ দ্রষ্টব্য স্থান। তারপর তিনি এই মন্দির সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন—এটি হচ্ছে, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রণ শিল্প সামগ্রীর এক অত্যুৎকৃষ্ট ভাণ্ডার। ৬০৭ সালে এই মন্দিরটি নির্মাণ করান শাসনকর্ত্রী সম্রাজ্ঞী সুয়িকোর (Suiko) বিশেষ প্রতিনিধি যুবরাজ শোতোকু (Shotoku)। ইনি ছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচার আন্দোলনের একজন প্রবীণ সহায়ক। এই মন্দির দু'ভাগে বিভক্ত। তোইন (Toin) অর্থাৎ পুব-মন্দির এবং সাই-ইন (Sai-in) অর্থাৎ পশ্চিম-মন্দির। এই মন্দির সংলগ্ন স্থানে প্রায় চল্লিশটি কাষ্ঠগৃহ আছে। এর মধ্যে কতকগুলিকে বিশ্বের প্রাচীনতম কাষ্ঠগৃহ বলে নির্ণয় করা হয়।

এই হরিয়ুজি ভবনগুলির মধ্যে দর্শনীয় দক্ষিণদিকের বিরাট কাঠের দরজা, যার জাপানী নাম নানদাইমোন (Nandaimon)। কান্দো (Kando) হচ্ছে প্রধান হলঘর। এর ভেতরে রয়েছে শাক্য (Sakya) বুদ্ধের একটি ব্রোঞ্জের বিখ্যাত ত্রয়ী (Trinity) মূর্তি। ত্রয়ী মূর্তি হচ্ছে ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র এবং পরমাত্মার মিলনের মূর্তি। আরও রয়েছে অমূল্য কলাবিদ্যা সামগ্রী। শোরিয়োইন (Shoryoin) : এটি হচ্ছে পবিত্র আত্মাদের হলঘর এখানেও একটি পাঁচতলা কাঠের প্যাগোডা আছে। এটি নির্মিত হয়েছে ৬০৭ সালে বিশেষ ধরণের গাছের গুঁড়ি দিয়ে। আর যুমেদোনো (Yumedono) : এটি হচ্ছে স্বপ্ন-দেখার হলঘর, এটি তৈরি হয়েছে ৭৩৯ সালে। এর কারুকার্যমণ্ডিত সুদৃশ্য

আটকোণা কাষ্ঠগৃহটি না দেখলে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান অদেখা রয়ে যাবে। এটি উৎসর্গ করা হয়েছে যুবরাজ শোতোকুর নামে। সব শেষে যে ঘরটা দেখলাম তার নাম কোদো (Kodo) বা বক্তৃতা ঘর। বিরাট হলঘর, প্রায় হাজার খানেক লোক ধরে এর ভেতরে। এখানে কোন মাইকের বালাই নেই। ঘরটি এমন ভাবে তৈরি যে বক্তার বক্তৃতা বিনা মাইকে শোনা যায় শেষ সারি পর্যন্ত। এটি নির্মিত হয়েছে ৯৯০ সালে।

জাপানের টোকিও শহর দেখে হতাশ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জাপান বুঝি তার নিজস্ব ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মন ভরে গেল কিয়োতো এবং নারা শহর দেখে। আমার ভুল ভাঙল, সার্থক হল আমার জাপান সফর। আমার কল্পনার রূপের সঙ্গে বাস্তবের রূপ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এই তো পুরুষদের পরণে তাদের নিজস্ব সাবেকী পরিচ্ছদ যুকাতা (Yukata) এবং মহিলাদের পরনে কিমোনো ও কোমরে ওবি বাঁধা রয়েছে। আর জাপানের ঐতিহ্যময় সেই কাঠের বাড়ি ঘর। তাও তো কিয়োতোতে দেখেছি এবং এখানেও দেখছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমগ্র জাপানই বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছিল, হয়নি কেবলমাত্র দুটি শহর। তার একটি হচ্ছে নারা এবং অপরটি কিয়োতো। জাপানের পুরাতন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই দুটি শহরকে খোলা নগরী (Open City) বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাই এই দুটি শহরের ওপর বোমা বর্ষণ করা হয়নি। তবে হুতাশনের ক্রোধানলে পড়ে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই দুটি শহর।

এবার আমরা পাতাল রেলে চেপে চলেছি ওসাকা শহর দেখতে। এতে কোন সংরক্ষিত আসন নেই, তাই আমরা একই কামরায় যে যেখানে পেরেছি বসেছি। এক দম্পতি তাদের পাশে আমায় বসবার মত একটু ঠাঁই করে দিল। ভদ্রলোক নিজে থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করল এবং নিজের পরিচয় দিল মার্কিণী বলে, নাম রবার্ট ম্যাকডোনার্ড, তার স্ত্রী জাপানী, নাম ওকুনি ফুজিয়ারা। দুজনেই মধ্যবয়সী। স্ত্রীটি একটু চঞ্চলা, তবে সদাহাস্যময়ী। ফুজিয়ারা জানতে চাইল আমার পরিচয়। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে ম্যাককে প্রশ্ন করলাম —তোমার সঙ্গে এই ফুজিয়ারার আলাপ হল কি করে? এবং তোমার দেশে এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে তুমি একজন জাপানী মেয়েকে বিয়ে করলে কেন?

ম্যাক উত্তর দিল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি আমেরিকান সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য হই। সেই সময়ে একটি বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ (Colonel) হয়ে আমি

ভারতবর্ষে যাই। সেখানে বহুদিন ছিলাম, তাই সুযোগ পেয়েছিলাম ভারতের নানা জায়গায় ঘোরার এবং বহু ভারতীয় পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করার। তখন দেখেছি ভারতীয় মহিলাদের স্বামীসেবা, পুত্র-কন্যাদের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং তাঁদের গৃহস্থালির কাজকর্ম। তাই মনে মনে স্থির করেছিলাম যে যদি সুযোগ পাই তাহলে কোন ভারতীয় নারীকে বিবাহ করে দেশে নিয়ে যাব।

তারপর ১৯৪৫ সালে যখন জাপান আত্মসমর্পণ করল, তখন আমি বদলি হয়ে এলাম এই জাপানে। এখানেও প্রায় বছরখানেক ছিলাম। তখন জাপানের চরম দুর্দিন, তাই দলে দলে জাপানী ছেলেমেয়েরা আমাদের শিবিরে আসতে লাগল সাহায্যের প্রত্যাশায়। আমরাও সুযোগ পেলাম এদের সঙ্গে মেলামেশা করার। দেখলাম এখানকার মেয়েরা ভারতীয় মেয়েদের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাই আমার মত বহু আমেরিকান সৈনিকই এদের ভালবাসল, সাহায্য করল এবং তাদের বিয়ে করে দেশে নিয়ে গেল।

এরপর ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কেন স্বদেশের ছেলে ছেড়ে একজন বিদেশীকে বিয়ে করলে?

ফুজিয়ারা উত্তর দিল—তখন প্রায় সমগ্র জাপানই বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত। দেশের অধিকাংশ যুবকই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, নেই কোন বাসস্থান। বেঁচে থাকাটাই হয়ে দাঁড়াল একটা বড় রকমের সমস্যা। তাই কিশোরী যুবতীরা তো বটেই, এমন কি মধ্যবয়সী মহিলারাও দলে দলে ছুটল সেনা শিবিরে, কিছু খাদ্য, বস্ত্র এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য। কেউ কেউ ভিক্ষা করে আবার কেউ কেউ বা দেহ বিক্রি করে কিছু উপার্জন করল। আমিও ঐ দলে যোগ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আমার দুই ভাই যুদ্ধে নিহত, আর বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা-মাতা অভুক্ত। আমার কপাল ভাল, তাই আমার ভাগ্যে জুটল এই মহানুভব ম্যাক।

আমাদের কথা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা স্টেশনে এসে আমাদের গাড়ি থামল। ম্যাক এবং ফুজিয়ারা দুজনেই উঠে দাঁড়াল নামবার জন্য। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি স্টেশনটির গায়ে জাপানী এবং ইংরাজীতে নাম লেখা রয়েছে নাকাৎসু (Nakatsu)।

মাশা বললে—আমাদেরও এখানে নামতে হবে। আমরা ওসাকায় এসে গেছি। নারা থেকে জাপান ন্যাশন্যাল রেলের কাসুগা এক্সপ্রেস ট্রেনে করে এখানে আসতে সময় লাগল মাত্র ৪০ মিনিট।

ওসাকা Osaka)

আমরা হোটেলের দিকে চলেছি পাতাল পথ দিয়ে। এই পাতাল পথে কোন গাড়ি ঘোড়া চলে না। সমস্ত পথ ফ্লুরেসেণ্ট লাইট দিয়ে দিনের মত আলোকিত করে রাখা হয়েছে। পথের দু'পাশে রয়েছে সুসজ্জিত বিপণি, বার, রেস্তোরাঁ এবং ছোট ছোট দু-চারটি সিনেমা-হল ও ডান্সিং হল। অফিসের ছুটি হয়েছে, তাই পথ জনাকীর্ণ। দোকান-পাট দেখতে দেখতে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আমরা এসে পেঁৗছলাম আমাদের হোটেলের লবিতে।

আমরা উঠেছি পাঁচ তারা-যুক্ত হোটেল টয়ো (Toyo) তে। এটি কুড়িতলা বিশিষ্ট বাড়ি। এর তিনটি তলা ভূগর্ভে। এর একতলায় রয়েছে সাউনা বাথ (Sauna Bath) অর্থাৎ স্নান ঘর। ঘরটি জাপানী প্রথায় সুসজ্জিত। দোতলায় গ্যারেজ, আর তিনতলায় বার, রেস্তোরাঁ এবং আর্কেড। আর্কেড হচ্ছে অর্ধগোলাকার ছাদযুক্ত পথ, যার উভয় পার্শ্বে আছে দোকান-বাজার প্রভৃতি। চারতলাটা হচ্ছে সমতল ভূমির ওপরে। সেখানে রয়েছে লবি, লাউঞ্জ এবং রিসেপশন অফিস। পাঁচতলায় ব্যাংকোয়েট হল্ এবং ওয়েডিং হল। একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত হেঁটে ওঠবার সিঁড়ি তো আছেই, তাছাড়া একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত এবং তিনতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত দুটি চলন্ত সিঁড়িও আছে। কুড়িতলায় রয়েছে পারিষদবর্গ নিয়ে থাকার জন্য কয়েকটি স্যুট এবং একটি টাওয়ার। এই টাওয়ারে একটি রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে বসে খেতে খেতে পক্ষীর দৃষ্টিতে সমস্ত শহরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়। আর বাকী তলাগুলিতে আছে পর্যটকদের থাকার ঘর।

সাহাদা, মুখার্জীদা এবং আমার আস্তানা মিলেছে ষোলতলায় একটা ঘরে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, বাথরুম সংযুক্ত ঘর। পাঁচ তারা-যুক্ত হোটেলের একটি ঘরে যা যা উপকরণ থাকা দরকার তার সবই আছে এই ঘরে। ঘরে ঢুকেই বিছানাতে দেহ এলিয়ে দিলাম।

মুখার্জীদা জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল বোসদা, শুয়ে পড়লেন কেন? প্রায় সাতটা বাজে, এখুনি তো তৈরি হয়ে আমাদের খাবার ঘরে যেতে হবে।

আমি উত্তর দিলাম, আজ বিকেলে চা খাওয়া হয়নি তো তাই শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে, আর মাথাটাও একটু ধরেছে। সাহাদাও আমার সুরে সুরে মেলালেন।

কুছ পরোয়া নেহি, আভি সব কোইকো চাঙ্গা কর দেঙ্গে—এই বলে মুখার্জীদা তাঁর হাতব্যাগের চেনটা টেনে ব্যাগের মুখটা খুলেই হায় হায় করে উঠলেন, সর্বনাশ হয়েছে, ওষুধের বোতলটা যে নারাতে ফেলে এসেছি! কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং করিডরের স্লট্-মেসিনে নির্দিষ্ট ইয়েন ফেলে এক বোতল স্কচ হুয়িস্কি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তিনজনে সবে গেলাসে ঠোঁট ঠেকিয়েছি এমন সময় সিং-এর প্রবেশ। তাকেও বঞ্চিত করা হল না।

জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং কর্মমুখর নগরী ওসাকা পশ্চিম জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। একে বলা হয় প্রাচ্যের ভেনিস। যোডো (Yodo) নদী, বিয়া হ্রদ (Biwa Lake) থেকে নির্গত হয়ে তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এই নগরীর বক্ষ ছিন্নভিন্ন করে বয়ে চলেছে চারিদিক থেকে। এই বিয়া হ্রদ হচ্ছে জাপানের সর্ববৃহৎ হ্রদ। ভূমিকম্প এখানে সৃষ্টি করেছে সুন্দর এক প্রাকৃতিক বন্দর।

চতুর্থ শতাব্দী থেকে নারা এবং কিয়োতো ছিল জাপানের প্রাচীন রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি হিদেয়োশি তয়োতোমি (Hideyoshi Toyotomi) নামে একজন সামন্ত সেনাপতি এখানে তাঁর দুর্গ-প্রাসাদ নির্মাণ করান এবং এই ওসাকাকে জাপানের বৃহত্তম শিল্পনগরী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। তিনি সরকারি কাজকর্ম সব এই দুর্গ-প্রাসাদ থেকেই পরিচালনা করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তয়োতোমি সরকারের পতন ঘটার পর সমস্ত সরকারি দপ্তর চলে গেল টোকিওতে, কিন্তু বাণিজ্য দপ্তর এখানেই রইল। বর্তমান জাপানের প্রধান চারিটি বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে ওসাকা অন্যতম। এখানকার প্রধান শিল্প চাউল, রাসায়নিক পদার্থ এবং তাঁতশিল্প। এখানকার ব্যবসায়ীরা খুব রসিক এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাই জাপানের সবচেয়ে বেশী রাজস্ব সংগৃহীত হয় এই ওসাকা থেকে। এটা বণিক প্রধান শহর, তাই প্রথম সাক্ষাতে প্রথম সম্ভাষণ হচ্ছে—'তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন চলছে'?

এখনই আমরা মাশার সঙ্গে যাব গেইশা-গৃহ দেখতে। তাই নৈশ-ভোজটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হল। ভোজন কক্ষ থেকে বেরিয়েই লাউঞ্জে দেখা হল ম্যাক ও ফুজিয়ারার সঙ্গে। ওরাও নাকি এই হোটেলেই উঠেছে। ফুজিয়ারা জানতে চাইল—আমাদের আগামীকালের প্রোগ্রাম কী? উত্তরে জানালাম—এখানে আমাদের নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রাম নেই। ম্যাক বলল—ভালই হল,

আগামীকাল আমি ও ফুজিয়ারা একটা কাজে টোবা (Toba) যাচ্ছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে ওখানকার কাজ শেষ করে, যাব পার্ল আইল্যাণ্ড দেখতে। তোমাকেও আমাদের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আমি ওদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ঠিক হল যে আগামীকাল ভোর ছয়টায় আমরা এই লাউঞ্জে মিলিত হব।

মাশা আমাদের নিয়ে চলেছেন নির্জন বনপথ দিয়ে। নিস্তব্ধ নিঝুম পথ। নির্জন পথে দু-চারজন পথচারিণীকে বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে শ্লথ গতিতে এদিকে ওদিকে বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। ওদের পরণে কিমোনো। কিমোনোর কাঁধের কাছটা খোলা এবং বুকের কাছটাতে একটা বড় রকমের ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে পীতবর্ণ স্তনের কিয়দাংশ। মাশাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—এককালে ওরা গেইশা ছিল। এখন ভ্রষ্টা। ওদেরকে বলা হয় মাকুরা গেইশা (Makura Geisha)। জাপানীরা পাশবালিশকে বলে 'মাকুরা'। সুতরাং মাকুরা গেইশার অর্থ সহজেই অনুমেয়। ওরা বেরিয়েছে শিকারের সন্ধানে।

গেইশা হোম (Geisha Home) :—লতাকুঞ্জের মাঝে মাঝে কারুকার্য করা সুন্দর সুন্দর একতলা কাঠের বাড়ি। বাড়ির ঢালু ছাদগুলি গাছের ছাল দিয়ে আচ্ছাদিত। মনে পড়ে গেল ওমর খৈয়ামের একটি রুবাই—

'সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়'।

আমরা একটা বাড়ির ৪।৫টা ধাপ ওঠার পর পেলাম কাঠের বারান্দা। বারান্দার মেঝেতে সুন্দর কারুকার্য করা টাটামি পাতা রয়েছে আর ছাদের কড়ি-বরগাতে ঝুলছে কাগজের তৈরি লালরঙের লণ্ঠন। বারান্দার কুলুঙ্গিতে রয়েছে ইকেবানা। দু-চারটি আরামকেদারাও পাতা রয়েছে। আমাদের পদশব্দ শোনামাত্র ঘরের ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দুজন মধ্যবয়সী মহিলা এবং তাদের সঙ্গে চার-পাঁচজন তরুণী। কারণ মাশা আগেই ওদেরকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল আমাদের আগমন বার্তা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না, এরা মোমের পুতুল না মানবী? তরুণীরা হাঁটু গেড়ে বসে আমাদের পা থেকে খুলে দিল বাইরের জুতা এবং পরিয়ে দিল তাদের দেওয়া দড়ির জুতা। তারপর আমাদের

সাদরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মাশা এক এক করে আমাদের সকলের সঙ্গে ওদের পরিচয় করে দিলেন।

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো ঘর। ঘরের মেঝেতে টাটামির ওপর পাতা রয়েছে বিচিত্র কারুকাজ করা বেশ মোটা গাল্‌চে। তার ওপরে রয়েছে সোফা, কৌচ, ডিভান ইত্যাদি। ঘরের মাঝখানে সেণ্টার টেবিলের ওপরে একটা বড় ট্রেতে নানা রকমের লতাপাতা দিয়ে নানা রকমের ফুল সাজানো। ঘরের এক কোণে একটা শো-কেসের ভেতরে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন রকমের জাপানী পুতুল। ঘরের চারটি দেওয়াল এবং সীলিংয়ে ফুল আঁকা রঙীন কাগজ আঁটা। ঘরের তিনদিকের দেওয়ালে ঝুলছে তিনটি সরু কাঠির মাদুর। একটিতে আঁকা আছে প্রাকৃতিক দৃশ্য, দ্বিতীয়টিতে একটা ফলন্ত চেরি গাছ এবং তৃতীয়টিতে আঁকা আছে ইকেবানা। ঘরের সীলিংয়ে ঝুলছে কাগজের তৈরি লালরঙের বিরাট একটি ঝাড়লণ্ঠন। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোতে ঘরটি হয়ে উঠেছে একটি স্বপ্নপুরী। এরপর ওরা সেক্ (মদ) ও কিছু খাদ্য পরিবেশন করে এবং শ্যামিসেন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে জাপানী সঙ্গীত শুনিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করল।

এবার আমাদের হোটেলে ফেরার পালা। ফেরার পথে মিসেস্ মাশা বললেন—জাপান সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে গেইশাদের কথাও কিছু বলা দরকার। কারণ পর্যটকরা গেইশাদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে দেশে ফিরে যান।

গেইশা এবং মেইকো (Geisha and Maiko) :—গেইশাদের সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকদের ধারণা এরা নাকি দেহপসারিণী, বারবণিতা, অঙ্কশায়িনী ইত্যাদি। কিন্তু মোটেই তা নয়। গেইশা শব্দের অর্থ 'সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী মহিলা'। এই গেইশা বৃত্তি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে জাপানে। প্রকৃত পক্ষে এরা অতিথি সেবিকা। এরা বারবণিতাদের মত রূপ ও যৌবনের পসরা নিয়ে বেসাতি করে না। এদের দীর্ঘদিন ধরে রীতিমত হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কেবলমাত্র নাচ-গান আর বাজনাই নয়, আলাপ, সহবত, অতিথি আপ্যায়ণ, বিভিন্ন ভাষা, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম-আলোচনা, লোককথা, লোকগাথা এবং চা, কফি ও সেক্ পরিবেশন ইত্যাদি সব কিছুই শিখতে হয়। ইকেবানাও শিখতে হবে এদের, শিখতে হবে অতিথি আগমনের প্রতীক্ষায় কি ভাবে দোরগোড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং কি ভাবে তাদের পাশে বসতে হবে

এক কথায় বলতে গেলে এদের হতে হবে সবজান্তা। গেইশারা কখনও কারো কাছে নিজেদের আসল নাম প্রকাশ করে না।

শিক্ষানবিশী গেইশাদের বলে মেইকো (Maiko)। সাধারণত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছয়-সাত বছরের স্বাস্থ্যবতী ও রূপবতী মেয়েরা মেইকো হয়ে গেইশাদের কাছে আসে শিক্ষাগ্রহণের জন্য। এর মধ্যে গেইশাদের মেয়েরাও যে নেই তা নয়। মেইকোদের কিমোনো পরার, ওবি বাঁধার এবং চুল বাঁধার ধরণও অন্য রকমের। তা থেকে বোঝা যায় যে এরা স্নাতোকোত্তর গেইশা নয়, এরা শিক্ষানবিশী মেইকো। শিক্ষানবিশী কালে গেইশাদের সঙ্গে থেকে হাতেনাতে কাজকর্ম করে এদের শিখতে হয় গেইশা বৃত্তির সব রকম কলা-কৌশল। শিক্ষান্তে ১৭।১৮ বছর বয়সে পুলিসের অনুমতি নিয়ে এরা গেইশা সংস্থায় প্রবেশাধিকার লাভ করে। তখন এরা ইচ্ছামত ছদ্মনাম নেয়। গেইশাদের বিভিন্ন সংস্থা আছে। গেইশা ভাড়া করতে হলে তা করতে হয় ওদের সংস্থার মাধ্যমে।

জাপানীদের সমাজব্যবস্থা হচ্ছে পুরুষ-কেন্দ্রিক, তাই নারীদের কোন অধিকার নেই স্বামীর কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করার। যখন কোন বিত্তবান ভদ্রলোক পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করে গেইশা পার্টি দেন, তখন সেই অনুষ্ঠানটি তিনি স্বগৃহে না করে করেন কোন হোটেলে বা ক্লাবে। এই পার্টিতে কেবলমাত্র পুরুষেরাই নিমন্ত্রিত হন। তাই এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের ভূমিকা গ্রহণ করে গেইশারা। সমগ্র বিশ্বে বোধ হয় জাপানই একমাত্র দেশ, যেখানে নিমন্ত্রণ-কর্তা যে কোন সময়ে পার্টি ত্যাগ করে গেলেও তা অশোভন বলে গণ্য করা হয় না। অতিথি আপ্যায়ণের সমস্ত দায়দায়িত্ব হচ্ছে গেইশাদের। ওরা ধীরে ধীরে মোহের মায়াজাল বিস্তার করে তাতে আবদ্ধ করে অতিথিদের। অতিথিরা শিবনেত্র হয়ে ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে পড়েন কুহকিনীদের মায়াজালে। ওঁরা হিতাহিত জ্ঞান হারাবার আগেই গেইশারা কৌশলে সরে পড়ে অন্তরালে। সত্যিকারের গেইশারা কখনও অতিথিদের শয্যাসঙ্গিনী হয় না বা তাদের দেহও স্পর্শ করতে দেয় না।

সমর জিজ্ঞাসা করল, সমাজে গেইশাদের স্থান কোথায়? উত্তরে মাশা জানালেন, গেইশা মহিলাদের অধিকাংশই এসেছে সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। কেউ কেউ আবার গেইশা সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে সংসার-ধর্ম পালন করে। তবে এ কথাও ঠিক যে কাগজে-কলমে ওরা ধোয়া তুলসীপাতা হলেও ওদের মধ্যে কেউ কেউ গোপনে বাঁকা পথেও কিছু কিছু রোজগার করে।

এ কথা প্রকাশ হয়ে গেলে ওরা গেইশা সংস্থা থেকে বিতাড়িত হয়। তখন তারা আর সমাজে ঠাঁই পায় না, অন্যত্র ডেরা বেঁধে নিজেদের গেইশা বলে পতিতা-বৃত্তি চালায়। এইসব দলচ্যুতাদের বলা হয় মাকুরা গেইশা। বহু বিদেশী এই সব মাকুরা গেইশাদের সান্নিধ্যে এসে আসল গেইশাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে দেশে ফিরে যান।

হোটেলে ফেরার পথে সাহাদা জানালেন যে আগামীকাল তিনি ও মুখার্জীদা পরমাণু বোমার প্রথম বলি হিরোশিমা (Hiroshima) দেখতে যাবার মনস্থ করেছেন। আমাকেও ওঁদের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। উত্তরে সাহাদাকে জানালাম যে, তাঁরা যদি আমাকে কিছু কর্জ দেন তাহলে যেতে পারি। উভয়ের কাছেই উদ্বৃত্ত ডলার থাকা সত্বেও ওঁরা নীরব রইলেন। অগত্যা সিংকে জানালাম আমার আগামীকালের প্রোগ্রামের কথা এবং ওকে অনুরোধ করলাম আমাদের সঙ্গী হবার জন্য। এক কথায় সিং রাজী হল। অতঃপর মিসেস্ লালকাকার কাছে দরবার করলাম যে আগামীকাল সিং ও আমি মধ্যাহ্ন ভোজ করব না, সুতরাং সেই বাবাদ আমাদের দুজনের প্রত্যেককে যদি ২৪০০ ইয়েন বা ৮ ডলার করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হব।

মিসেস্ লালকাকা মিসেস্ মাশার সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মত হলেন। সেই সঙ্গে মাশা জানালেন—আগামী কাল বৈকালে আমার বাসায় আপনাদের সকলের চায়ের নিমন্ত্রণ রইল, সুতরাং যে যেখানেই থাকুন বিকেল পাঁচটার মধ্যে সকলে নিশ্চয়ই হোটেল ফিরে এসে মিলিত হবেন।

রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হয়েছে, তাই ভোর সাড়ে চারটেয় বিছানা পরিত্যাগ করতে কোন অসুবিধা হল না। যথা সময়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে সিং এবং আমি এসে হাজির হলাম কুড়িতলায় কাচের ঘরে স্কাইরুম রেস্তোরাঁতে। রেস্তোরাঁর ঘর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে। রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেসরা এখনও কেউ আসেনি, কেবলমাত্র মালিক এসেছেন। তাঁকে অনুরোধ করাতে তিনি আমাদের মামুলী ধরণের ছোট-হাজরি পরিবেশন করলেন।

এখন সকাল সাতটা। ফুজিয়ারা, ম্যাক, সিং এবং আমি স্টেশনে এসেছি। আমাদের ট্রেন ছাড়তে এখনও দশ মিনিট দেরী আছে। এখানে টিকিট বিক্রির জন্য কোন কাউণ্টার নেই। নেই টিকিট চেকিং-এর কোন বালাই। ফুজিয়ারা একটা স্লট-মেশিনের ফোঁকরে নির্ধারিত ইয়েন ফেলে নির্দিষ্ট বোতাম টিপে আমাদের গন্তব্যস্থলে যাবার চারখানা টিকিট কিনে নিয়ে এলো।

ঠিক সময়ে আমাদের ট্রেন ছাড়ল। আমরা টোবা স্টেশনে পৌছলাম ১০-২০ মিনিটের সময়। কেউ আমাদের টিকিট দেখতে চাইল না। ম্যাক একটা জাপানী অফিসে ঢুকে অল্পক্ষণের মধ্যে তার যাবতীয় কাজকর্ম সেরে নিল তারপর আমরা গেলাম একটা ফেরি ঘাটে—উঠলাম হাঁসের মত দেখতে একটা মোটর বোটে। মোটর বোটটা উপসাগরের বক্ষ তোলপাড় করে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের পৌছে দিল মিকিমোতো দ্বীপে।

মিকিমোতো পার্ল আইল্যাণ্ড (**Mikimoto Pearl Island**) :— আজ ফুজিয়ারা আমাদের গাইড। ফুজিয়ারা আমাদের বলতে শুরু করল— কোকিচি মিকিমোতো (Kokichi Mikimoto) নামে একজন জাপানী বিজ্ঞানী কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদনের জন্য এই উপসাগরে শুক্তির চাষ শুরু করেন এবং এই দ্বীপে শুরু করেন তাঁর গবেষণার কাজকর্ম।' ১৮৯৩ সালে তিনি তাঁর গবেষণায় সাফল্য লাভ করলেন। তিনিই হলেন বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুতকারক। তাঁরই নামানুসারে এই দ্বীপটির নাম রাখা হয়েছে মিকিমোতো পার্ল আইল্যাণ্ড।

নীল উপসাগরকে দেখাচ্ছে বিরাট একখণ্ড টলটলে নীলকান্তমণির মত। এরই গর্ভে লুকিয়ে আছে জগৎ প্রসিদ্ধ মুক্তার ক্ষেত। এদেশে সমুদ্র-গর্ভ থেকে শুক্তি আহরণ করে মেয়েরা। একদল মেয়ে ডুবুরীর পোশাক পরে তৈরি হয়েই ছিল, সূর্যমামা প্রসন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রত্যেকেই একটা করে প্লাস্টিকের গামলা কোমরে বেঁধে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল উপসাগরের অতলে। কিছুক্ষণ পরে ওরা গামলাতে শুক্তি আহরণ করে ওপরে উঠে এলো এবং আর একদল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই সব মেয়ে ডাইভারদের এরা বলে আমা (Ama)। ফুজিয়ারা জানাল যে কোন মেয়ে-ডুবুরীই চার-পাঁচ মিনিটের বেশী সময় জলের তলায় থাকতে পারে না।

আমরা এসেছি এই দ্বীপের একটা মিউজিয়ামে। এখানে রয়েছে শুক্তি আহরণের নানা রকম মডেল এবং নানা রকম মুক্তার নমুনা। একজন প্রদর্শক আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে সব বোঝাচ্ছেন। এবার যে মডেলটার কাছে আমরা দাঁড়িয়েছি, সেটা হচ্ছে সমুদ্র-গর্ভে শুক্তি চাষের একটা ক্ষেত। ফলন্ত আঙ্গুর গাছে যেমন থোকা থোকা আঙ্গুর ফলে থাকে, সমুদ্রের তলায় অজস্র ডুবো পাহাড়ের গায়ে তেমনি লেগে রয়েছে মৌচাকের মত অজস্র শুক্তির চাষ। এদের গর্ভে জন্মায় রাশি রাশি মুক্তা। শুক্তি হচ্ছে গেঁড়ি,

গুগলি, শাঁখ, ঝিনুক ও কড়ি জাতীয় একপ্রকার প্রাণী। প্রদর্শক ভদ্রলোক জানালেন, মুক্তা নানা আকার এবং নানা রঙের হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকারের মুক্তা দেখিয়ে তিনি তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ছোট মার্বেলের আকারের সুগোল মসৃণ একটা মুক্তা দেখিয়ে বললেন, এটার নাম হচ্ছে 'প্যারাগন'। ওর চেয়ে আকারে ছোট কিন্তু নিখুঁত গোলাকার ওটাকে বলে 'রাউণ্ড'। আর ঐ যে ওপরের দিকটা ডুমো এবং নীচের দিকটা চ্যাপ্টা মত ওটাকে বলে 'বাটন'। এগুলি ছাড়াও নাসপাতির মত ডিম্বাকৃতি, ঝরে পড়া জলবিন্দুর মত ঈষৎ লম্বাটে ইত্যাদি নানা আকারের মুক্তা দেখিয়ে ঐগুলির নামও বললেন।

মুক্তার আকারে যেমন, রঙেও তেমনি বহু বৈচিত্র্য আছে। কোনটা গোলাপী, কোনটা গাঢ় ক্রীম রঙের, কোনটা বা ধূসর সাদা, আবার কোনটা বা ব্রোঞ্জের রং। নীল, সবুজ, কমলালেবু, এমন কি বাদামী রঙের মুক্তাও দেখালেন। উনি আরও এক জাতের মুক্তা দেখালেন যার রং পালিশ করা ঝকঝকে কালো। প্রদর্শক মহোদয় জানালেন যে, এই কালো রঙের মুক্তা দুষ্প্রাপ্য, সহজে মেলে না, তাই এটি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু প্যারাগন মুক্তা হচ্ছে সবার সেরা। এর গা থেকে নানা রঙের ছটা বেরোয়। সত্যিই এ যেন একটি প্যারাগন-অফ-বিউটি।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, শ্রাবণী পূর্ণিমার রাতে স্বাতী নক্ষত্র থেকে ঝিরঝির করে যে বৃষ্টি ঝরে তা মানুষের মাথায় পড়লে সে হয় ধনপতি, হাতীর মাথায় পড়লে তা জমাট বেঁধে হয় গজমতি, আর সমুদ্রের ওপর পড়লে সেই বৃষ্টি বিন্দুর একটি একটি করে পান করে সমুদ্র গর্ভের প্রত্যেকটি শুক্তি। সেই জলবিন্দুগুলিই শুক্তিদের গর্ভে জমাট বেঁধে রূপ নেয় মুক্তাতে।

এবার এসেছি ওদের ল্যাবরেটরীতে। একজন বিজ্ঞানীর কাছে জানতে চাইলাম মুক্তা উৎপত্তির বৃত্তান্ত। তিনি যা জানালেন তা এই রকম—শুক্তি হচ্ছে মলাস্ক (Mollusc) অর্থাৎ শম্বুক জাতীয় একপ্রকার কোমলাঙ্গ অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের দেহের ওপরে শক্ত খোলার আবরণী। ভেতরে নরম মাংস। এর আবরণী দুটি কব্জায় আটকানো দুটি ডালার মত। এই ডালা দুটির ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের জল অনবরত এদের দেহের অভ্যন্তরে ঢুকছে আর বার হচ্ছে। সেই জলের সঙ্গে যদি বালির কণা অথবা ঐ রকম কোন কঠিন পদার্থ এদের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে, তাহলে শুক্তি আর সেটিকে দেহের বাইরে বার করতে পারে না। সেটা শুক্তির দেহাভ্যন্তরের নরম মাংসে আটকে যায় এবং ঘষাঘষিতে একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য শুক্তির দেহের কোষগুলি থেকে এক রকম

রস নির্গত হতে থাকে। এই রসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চূণ জাতীয় পদার্থ থাকে। সেটা জমে গিয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর উৎপত্তি হয়। ক্রমশঃ সেই বিন্দুটির ওপর জমতে থাকে স্তরের পর স্তর। প্রত্যেকটি স্তরকে শক্ত করে জমিয়ে রাখে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ, যাকে বলা হয় কঞ্জিলেশন (Congelation) অর্থাৎ ঘনীকরণ। এবং ধীরে ধীরে সেটা মুক্তায় পরিণত হয়।

এইবার তিনি শুরু করলেন কৃত্রিম মুক্তার বৃত্তান্ত—সমুদ্র-গর্ভ থেকে শুক্তি তুলে এনে ছুঁচের সাহায্যে ওদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এক রকম অতি সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থ। তারপর পুনরায় ওগুলিকে রেখে আসা হয় ওদের সমুদ্র গর্ভের ডেরায়। এরপর প্রক্রিয়া অনুসারে ধীরে ধীরে ওদের গর্ভে মুক্তা জন্মলাভ করে। এই সব শুক্তির গর্ভস্থ মুক্তাকে বলা হয় কৃত্রিম মুক্তা। তারপর উনি আমাদের নিয়ে গেলেন ওঁদের প্রক্রিয়া কক্ষে (Processing room)। সেখানে দেখলাম যন্ত্রের সাহায্যে শুক্তিগুলির খোসা ছাড়িয়ে মাংসপিণ্ডগুলি রাখা হচ্ছে একটা বড় ড্রামের মধ্যে। তারপর সেই ড্রামের মধ্যে জল দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপিণ্ডগুলি বেশ করে চটকানো হল এরপর জলটাকে থিতিয়ে নিয়ে মাংসপিণ্ডগুলিকে আলাদা করে রেখে ড্রামের মধ্যে থেকে বের করে আনা হল মুক্তাগুলিকে। এরপর এই মুক্তাগুলিকে কাটছাঁট এবং পালিশ করে বাজারে ছাড়া হবে বিক্রির জন্য। পর্যটকরা এখান থেকেও বিনা শুল্কে মুক্তা ক্রয় করতে রারেন।

মোটর বোটে করে আমরা টোবাতে ফিরে এলাম। ঢুকলাম টোবা ইণ্টার-ন্যাশানাল হোটেলে বড় হাজরি সারতে। ম্যাক ফরমাশ করল—আশাহি বীয়ার, চিকেন স্যুপ, চিকেন স্যাণ্ডউয়িচ, ফিশ ফ্রাই, চিকেন রোস্ট এবং পেস্তা-বাদাম মিশ্রিত আইসক্রীম। উপরন্তু ওরা দিল পাঁউরুটি, মাখন, পটেটো-চিপস্, স্যালাড এবং জ্যাম ও জেলি। খাওয়ার পর সিং এবং আমি বিল মেটাতে গেলাম, বাধা দিল ম্যাক এবং ফুজিয়ারা। ফুজিয়ারা বলল, তোমরা আমাদের দেশ দেখতে এসেছ সুতরাং তোমরা আমাদের অতিথি। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তোমাদের সেবা করা। অতএব বিলের টাকা তোমাদের দেওয়া চলবে না। ভোজনান্তে আমরা ওসাকাতে ফিরে এলাম এবং দেখতে চললাম ওসাকার দুর্গ-প্রাসাদ।

ওসাকা-ক্যাসল্ (Osaka Castle) :—বিরাট এক প্রাঙ্গনের মধ্যে এই দুর্গ-প্রাসাদটি পরিখা বেষ্টিত এবং পাথরের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অনেকগুলি ফটক পেরিয়ে এই দুর্গে প্রবেশ করতে হয়। ফুজিয়ারা শুরু করল

এই দুর্গ-প্রাসাদের ইতিহাস—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তারা চূড়ান্ত ক্ষমতার লোভে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত এবং দেশ ক্ষত-বিক্ষত, তখন বীর সেনাপতি হিদেয়োশি তয়োতোমি (Hideyòshi Toyotomi) যুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করে দেশে পুনরায় ঐক্য এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি ঐ সব পরাজিত শাসনকর্তাদের বাধ্য করেন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে এবং তাঁর দুর্গ-প্রাসাদ নির্মাণের কাজে তাঁকে সহায়তা করতে। প্রায় ত্রিশ হাজার থেকে এক লক্ষ কর্মীর তিন বছর দিবা-রাত্রি পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠল দুর্গ-প্রাসাদ। এর নির্মাণ কার্য শেষ হল ১৫৮৬ সালে। এটি জাপানের সামন্ততান্ত্রিক যুগের বীরত্ব এবং ঐশ্বর্যের প্রতিভূ। এই প্রাসাদটির ধবধবে সাদা দেওয়ালগুলির জন্য একে বলা হয় হেরন ক্যাসল্ (Heron Castle) বা ধবল সারস দুর্গ-প্রাসাদ।

হিদেয়োশি তয়োতোমির রাজত্বকাল হচ্ছে ১৫৩৭ সাল থেকে ১৫৯৮ সাল পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিন্তু ১৬১৪ সালে তোকুগাওয়ার পরিবারবর্গের সঙ্গে ওদের যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধে পরাজিত হল তয়োতোমির বংশধররা। সমগ্র শহর ধ্বংস হল, ধ্বংস হল ওসাকা ক্যাসল্। ক্ষমতাসীন হলেন তোকুগাওয়ার পরিবারের লোকেরা। এবার এঁরা মনোনিবেশ করলেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে। এই শহর এবং দুর্গ-প্রাসাদ পুনর্নির্মাণ করতে দশ বছর সময় লাগল ১৬২৯ সালে দুর্গ-প্রাসাদ, তার পাথরের পাঁচিল, তার দরজা, তার মধ্যযুগীয় কারাগার (Donjon) ইত্যাদি পুনরায় ফিরে পেল তাদের অতীত দিনের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য।

এই দুর্গের ওপর শেষ এবং চূড়ান্ত আঘাত এলো ১৮৬৮ সালে মেইজি (Meiji) বংশের পুনরুত্থানের সময়। আবার গৃহযুদ্ধ বাধল। ছারখার হয়ে গেল ওসাকা শহর এবং দুর্গ-প্রাসাদ। তারপর যুদ্ধান্তে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে জনসাধারণের অর্থে এবং সাহায্যে ১৯৩১ সালে এই দুর্গ-প্রাসাদ পুনর্নির্মিত হল এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল তার প্রাচীন ঐতিহ্য। এর ঐতিহ্যময় মধ্যযুগীয় পাঁচিলের ফটকগুলি এবং কারাগারের প্রতীকগুলি আধুনিক ওসাকা শহরের গর্বের বস্তু।

পাথরে নির্মিত বিরাট একটা ফটকের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ফুজিয়ারা বলল, পূর্বে এই দুর্গে প্রবেশ করতে হলে অনেকগুলি ফটক পেরিয়ে আসতে হত কিন্তু বর্তমানে মাত্র তিনটি ফটক অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, অবশিষ্টগুলির সব ভগ্নদশা। এটি হচ্ছে প্রবেশ পথের প্রথম ফটক। এই ফটকের

নাম হচ্ছে ওতেমোন-গেট (Otemon Gate)। এর আদিম কাঠামোটিকেই রক্ষা করা হয়েছে। কালো শ্লেট পাথরে তৈরি এর বিরাট কপাট দুটিতে নানা রকম নক্সা খোদাই করা রয়েছে। এবার আমরা এসে দাঁড়ালাম দ্বিতীয় ফটকের সামনে! ফুজিয়ারা বলল, এই ফটকটার নাম হচ্ছে সাকুরা গেট বা চেরি গেট (Sakura or Cherry Gate)। এই ফটকের দর্শনীয় বস্তু হচ্ছে চারখণ্ড বিরাট শ্বেতপাথর। দ্বারের বাইরের দিকের ডানপাশের পাথরটার নাম হচ্ছে রিয়ু-ইশি (Ryu Ishi) বা ড্র্যাগন স্টোন আর বাঁপাশের পাথরটার নাম হচ্ছে তোরা-ইশি (Tora-Ishi) বা টাইগার স্টোন। এই ফটকের ভেতরের দিকে দু'পাশে রয়েছে ওসাকা ক্যাসলের সর্ববৃহৎ এবং তৃতীয় বৃহৎ পাথর দুটি। প্রথমটিকে বলা হয় তাকো-ইশি (Tako-Ishi) বা অক্টোপাস্ স্টোন, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ফিউরিসোদে-ইশি (Furisode-Ishi) বা লং স্লীভস্ স্টোন। আর ধূসর রঙের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাথরটি নাম হচ্ছে হাইগো স্টোন (Higo Stone)। এটি রয়েছে তৃতীয় ফটকে, যার নাম হচ্ছে কিয়োবাশি গেট (Kyobashi Gate)। এই পাথরটি আনা হয়েছে সেতো (Seto) উপসাগরের শোদোশিমা (Shodoshima) দ্বীপ থেকে। এটির পরিমাপ ৮০ স্কোয়্যার মিটার। অদ্ভুত এবং অপূর্ব দেখতে এই বৃহদাকার পাথরগুলি।

এই দুর্গ-প্রাঙ্গনের উঁচু দেওয়ালের ওপরে বিন্দুর মত চারপাশে রয়েছে চারটি তিনতলা বিশিষ্ট গম্বুজ। এই গম্বুজকে জাপানী ভাষায় বলে ইয়াগুরা (Yagura)। এই গম্বুজগুলির নাম হচ্ছে ইনুয়ি ইয়াগুরা (Inui Yagura), ইচিবান ইয়াগুরা (Ichiban Yagura), সেঙ্গান ইয়াগুরা (Sengan Yagura) এবং তামন ইয়াগুরা (Tamon Yagura)। ইনুয়ি এবং সেঙ্গান নির্মিত হয় ১৬২০ সালে। ১৬৬৮ সালে নির্মিত হয় ইচিবান এবং সবশেষে নির্মিত হয় এই তামন গম্বুজটি। ফুজিয়ারা জানাল যে চতুর্থ বৃহদাকার গ্র্যানিট পাথরটি রয়েছে এই তামন ইয়াগুরাতে। এর পরিমাপ হচ্ছে ৪৮ স্কোয়্যার মিটার। মূলতঃ কুড়িটিরও অধিক গম্বুজ ছিল এই দেওয়ালের ওপরে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আঘাতে অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে, কেবলমাত্র অবশিষ্ট এই চারটি গম্বুজই এখনও সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই গম্বুজগুলিকে ওয়াচ-টাওয়ারও বলা যেতে পারে। শান্তির সময়ে এই গম্বুজ গৃহগুলিতে থাকে বন্দুক, কামান, গোলা, বারুদ এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। আর যুদ্ধের সময়ে এগুলিকে প্রতিরক্ষার ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করা হয়।

রথের মত দেখতে এর সাততলা শ্বেতপাথরের প্রাসাদ ভবনটি ওসাকার একটি গর্বের বস্তু। সারসের মত এর ধবধবে সাদা দেওয়াল এবং নীল রঙের ঢালু ছাদগুলি দর্শকদের মন হরণ করবেই। এই ভবনে একটি মিউজিয়াম আছে। সেখানে রাখা হয়েছে সম্রাটদের সাবেকী পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, হীরা-জহরত, মণি-মুক্তা এবং অলঙ্কার ইত্যাদি। এই প্রাসাদের মধ্যে দুটি এলিভেটর আছে, তার যে কোন একটিতে করে যাওয়া যায় সাততলার মানমন্দিরে। সেখান থেকে দেখা যায় ওসাকা শহরের অপূর্ব দৃশ্য।

বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে। এবার আমাদের ফেরার পালা। অদূরে কারাগৃহের সামনে একটা চালার তলায় দেখি বেশ ভিড়। ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? ফুজিয়ারা জানালো যে ওখানে একটি কূয়া আছে। ঐ কূয়ার জল খুব সুস্বাদু। ঐ জলপান করার জন্য ওখানে লাইন পড়ে গেছে। আমরাও তৃষ্ণার্ত, তাই গেলাম ঐ কূয়োর কাছে। কূয়াটা বেশ বড় এবং গভীর। ওর চারপাশ চৌবাচ্চার মত করে বাঁধানো। চৌবাচ্চার গায়ে জাপানী ভাষায় লেখা রয়েছে কিনমেইস্যুই (Kinmeisui) এবং ইংরেজীতে তার ব্যাখ্যা করা রয়েছে—গোল্ডেন ওয়েল।

ফুজিয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর নাম গোল্ডেন ওয়েল রাখা হল কেন?

উত্তরে ফুজিয়ারা জানালো—সম্রাট হিদেয়োশি তয়োতোমি এই জলকে সুস্বাদু করার জন্য এই কূয়ার মধ্যে অনেকগুলি সোনার পাত ফেলেছিলেন। সেই থেকে এর নাম হয়েছে গোল্ডেন ওয়েল বা সোনার ইঁদারা।

আমাদের হোটেলে ফিরতে একটু দেরি হওয়াতে দেখি দলের সবাই সাজগোজ করে উদগ্রীব হয়ে লাউঞ্জে বসে আছেন আমাদের প্রতীক্ষায়। কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে সিং এবং আমি সোজা চলে গেলাম যে যার ঘরে। অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ পরিবর্তন করে আমরা এসে দলের সঙ্গে মিলিত হলাম এবং মাশার সঙ্গে চললাম তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে গেলাম মাশার বাড়ির দোরগোড়ায়। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তিনি অন্তঃপুরে চলে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গৃহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলেন গৃহকর্তা এবং কয়েকজন মহিলা। মহিলারা আমাদের পায়ের জুতা খুলে দিয়ে পরিয়ে দিলেন তাঁদের দেওয়া দড়ির জুতা। এরপর গৃহকর্তা সাদরে আমাদের গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন এবং বসতে অনুরোধ করলেন। মিসেস মাশা, ওঁর স্বামী, মেয়ে-জামাই এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের

সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিস্টার মাশাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে তাঁর একটি পা নেই। সেখানে লাগানো রয়েছে একটি নকল পা। মিসেস মাশা তাঁর মেয়ে এবং অন্যান্য মহিলাদের ডেকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

মুখার্জীদা মিস্টার মাশাকে জাপানের চা-পর্ব অনুষ্ঠানের ইতিহাস এবং তার রীতি-নীতি সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। মিস্টার মাশা তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন—অষ্টম শতাব্দীতে যখন নারা শহরে প্রথম স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হল সেই সময়ে চীন থেকে চায়ের প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটল এই জাপানে। এর বহু পূর্বে চীনদেশে এই চায়ের প্রচলন হয় হান বংশের (Han Dynasty) রাজত্বকালের শেষভাগে অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে। চীনে এই চাকে বলে মাৎচা (Matcha)। মাৎচা হচ্ছে গুঁড়ো সবুজ চা। কুড়ি থেকে সত্তর বছরের পুরানো চা গাছের পাতা গুঁড়িয়ে তৈরি করা হয় সবুজ গুঁড়ো চা।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই চা পান সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র জেন-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (Zen Buddhist) ধর্মযাজকদের মধ্যে। এর কারণ হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ ধ্যান করার সময় যাতে তাঁরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে না পড়েন, সেইজন্য। ওঁরা এই চা আমদানি করতেন চীনের সাং রাজবংশের (Sung Dynasty) কাছ থেকে। এই চা-পান জাপানে জনপ্রিয়তা লাভ করল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। সেই সময়ে চীন দেশের অনুকরণে জাপানেও প্রবর্তন করা হল চা-পান প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাকে এরা বলে তোচা (Tocha)। এতে প্রতিযোগীদের বিভিন্ন প্রদেশের উৎপন্ন চা পান করতে দেওয়া হত। এই চা আস্বাদন করে যিনি সঠিক বলতে পারতেন কোন্ প্রদেশের চা সর্বোত্তম, তিনিই পুরস্কার লাভ করতেন। এর প্রচলন ছড়িয়ে পড়ল সামুরাইদের মধ্যে। ওঁরা নিজেরাও নিত্য চা পান করতেন, উপরন্তু অতিথি-অভ্যাগতরা এলে তাঁদেরও চা পরিবেশন করে আপ্যায়িত করতে লাগলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুরাতা জুকো (Murata Juko) নামে এক ভদ্রলোক নিয়ম ভিত্তিক রীতিতে এই চা-পান অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন। জাপানী ভাষায় এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় চানোয়ু (Chanoyu)। এরপর জনসাধারণের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসার ঘটল। ষোড়শ শতাব্দীতে এঁরই এক সাকরেদ তাকেনো জো-ও (Takeno Jo-o) নীতিগত নিয়ম-কানুন তৈরি করলেন। অবশেষে জেন-বৌদ্ধ ধর্মযাজক সেন রিকিয়ু (Sen Rikyu) সামরিক শাসনকর্তা হিদেয়োশি

তয়োতোমির সহায়তায় প্রচলিত আইন-কানুনের কিছু কিছু সংশোধন করে চালু করলেন একটি নতুন আইন। সেইটি হল চা-পান অনুষ্ঠানের মৌলনীতি, যাকে জাপানী ভাষায় বলে ওয়াবি (Wabi)। ওয়াবি শব্দের অর্থ সরলতা, শালীনতা এবং নির্মলতা। এর সুন্দর একটি প্রবচন আছে, যথা—Aestheticism of austeve simplicity and refined poverty অর্থাৎ অতি দীনভাবে একান্ত ধৈর্য সহকারে এবং সরল মনে এই অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বিজ্ঞান উপভোগ করা। জেন-বৌদ্ধদের মতে চা পান হচ্ছে প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে নিজের চিত্ত শুদ্ধি করা। এই সবুজ চা যে জাপানীরা কেবলমাত্র পানীয় হিসাবেই ব্যবহার করে তা নয়, ওষুধ হিসাবেও ব্যবহার করে।

মিস্টার মাশাকে অনুরোধ করলাম জাপানী চা-গৃহ সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। তিনি বলতে শুরু করলেন :—

চা-গৃহ (Tea-House) :—চা-গৃহ হচ্ছে জাপানী ঐতিহ্যগত ভাব-ধারার একটা বিকাশ। এই চা-গৃহ হবে বাগানের কোন প্রান্তে বিশেষভাবে নির্মিত একটি ঝোপের মধ্যে। এর অন্ততঃ ২০ ফিট লম্বা একটি সুন্দর প্রবেশ পথ থাকবে। এই প্রবেশ পথকে জাপানী ভাষায় বলা হয় রোজি (Roji)। এই পথের ধারে হয় একটি পুকুর নয়তো একটি বেসিন থাকবে। চা-গৃহে প্রবেশ করার আগে অতিথিরা এখানে হাত-মুখ ধুয়ে শুদ্ধ হবেন। চা-গৃহকে জাপানীরা বলে সুকিয়া (Sukiya)। চা-গৃহে অন্তত পক্ষে তিনটি কামরা থাকবে। একটি বৈঠকখানা, একে বলা হয় যোরিৎসুকি (Yoritsuki), একটি চা তৈরির ঘর, তাকে বলা হয় মিজু-য়া (Mizu-ya) এবং তৃতীয়টি হচ্ছে চা-পানের ঘর, তার নাম হচ্ছে চা-শিৎসু (Cha-Shitsu)।

বড় বড় অনুষ্ঠানে প্রথা অনুযায়ী নিমন্ত্রণকারীদের পুরুষেরা পরবেন গাঢ় একরঙা সিল্কের যুকাতা (Yukata)। তাতে লাগানো থাকবে বংশানুক্রমিক পারিবারিক কুলচিহ্নগুলি। এ থেকে বোঝা যাবে যে ওঁরা কত পুরুষ ধরে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছেন। আর মহিলারা পরবেন বিচিত্র রঙের সিল্কের কিমোনো। কি পুরুষ আর কি মহিলা উভয়েরই পায়ে থাকবে সাদা রঙের টাবি (Tabi) অর্থাৎ মোজা। অতিথিরা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন একটি ভাঁজ করা হাত-পাখা এবং একটি কাইশি (Kaishi)-র প্যাড, অর্থাৎ কাগজের তৈরি ছোট তোয়ালে। তাঁরা এসে প্রথমে বসবেন হয় নিমন্ত্রণকারীর বাগানে অথবা বৈঠকখানায়। নিয়ম হচ্ছে, সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে মন এবং

শরীরকে সংযত করা এবং নিরাসক্ত ও প্রশান্ত মনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করা। সৌন্দর্যের গভীরতায় নিজেকে মগ্ন করে দেওয়াটাই হচ্ছে চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। আমরা সকলেই বেশ মশগুল হয়ে শুনছি মিস্টার মাশার কথা, এমন সময়ে মাশা-কন্যা ঘরে প্রবেশ করে সবিনয়ে আমাদের অনুরোধ জানাল, তার সঙ্গে যাবার জন্য।

মাশা কন্যার পিছু পিছু আমরা চললাম। আমাদের সঙ্গে চললেন ওঁদেরই নিমন্ত্রিত আরও কয়েকজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। বারান্দার বেসিনের কলে মুখ-হাত ধুয়ে শুচি হয়ে আমরা ঢুকলাম একটা বড় হলঘরে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে দুটি ঘরের মধ্যবর্তী কাঠের পার্টিশন্‌টা সরিয়ে দিয়ে দুটি ঘরকে একত্রিত করে এই হলঘরে পরিণত করা হয়েছে। ঘরের মেঝে জুড়ে টাটামি পাতা হয়েছে এবং ঘরের মাঝখানে টাটামির ওপরে পাতা রয়েছে হাত দেড়েক উঁচু লম্বা একটা টেবিল। টেবিলটার আগাপাছতলা একটা সাদা চাদরে ঢাকা। চাদরের কিছুটা অংশ টেবিলের বাইরের দিকে ঝুলছে। টেবিলের চারপাশে টাটামির ওপরে বসবার জন্য আসন পাতা। মাশা-কন্যা আমাদের দু'পাশের আসনগুলিতে বসবার জন্য অনুরোধ করল। আমরা সকলে শান্তির জল নেবার ভঙ্গিমায় চাদরের প্রান্ত দিয়ে পা ঢেকে, পা মুড়ে বসে পড়লাম আসনগুলিতে। স্থানীয় অতিথিদের বসানো হল টেবিলের সামনের দিকে আর আমরা বসলাম টেবিলের পিছন দিকে। কারণ আমরা অনুকরণ করব ওঁদের চা পানের আদব-কায়দা।

কিছুক্ষণ পরে মিস্টার এবং মিসেস্ মাশা বেশ পরিবর্তন করে এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে। মিস্টার মাশা পরেছেন গোলাপী রঙের সিল্কের য়ুকাতা আর মিসেস্ মাশা পরেছেন কারুকার্য করা সিল্কের রঙীন কিমোনো।

ঘরটি বেশ ছিমছাম করে সাজানো। ঘরের একটা তোকোনামাতে বা কুলুঙ্গিতে রয়েছে সজ্জিত পুষ্প। ঘরের দু'পাশের দেওয়ালে ঝুলছে নক্সাকাটা দুটো সরু কাঠির মাদুর। তার একটাতে আঁকা আছে ফলে-ফুলে ভরা একটা চেরি গাছ, আর অপরটাতে আছে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য। চা পানের টেবিলের ওপরেও রাখা হয়েছে ফুলসজ্জিত একটা ট্রে।

চানোয়ু (Chanoyu—Tea Cermony) :—চা পান অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বকে এঁরা বলেন কাইসেকি (Kaiseki) অর্থাৎ হাল্কা ধরণের খাদ্য পরিবেশন। মাশা কন্যা আমাদের খাবার টেবিলের ওপরে চারটি ট্রেতে করে রেখে গেল কিছু

হাল্কা খাদ্য। যথা—কিছু নোন্‌তা এবং মিষ্টি বিস্কুট, কয়েক রকমের আমিষ এবং নিরামিষ স্যাণ্ডউয়িচ, কয়েক রকমের কেক এবং ঘরে তৈরি কিছু জাপানী পিঠা। আমরা মিসেস্ মাশাকে অনুরোধ করলাম খাওয়া শুরু করার জন্য, কিন্তু মিস্টার মাশা বাধা দিলেন। তিনি মৃদু হেসে জানালেন যে, আমাদের নিয়ম অনুযায়ী অতিথিরাই প্রথম আহার গ্রহণ করেন। সুতরাং আমরাই যে যার ইচ্ছামত খাবার তুলে নিলাম নিজ নিজ প্লেটে। শুরু হল খাওয়া পর্ব। আমরা খেতে লাগলাম চামচের সাহায্যে আর মিস্টার ও মিসেস্ মাশা এবং ওঁদের দেশোয়ালী অতিথিরা খেতে লাগলেন চপ স্টিকস্ অর্থাৎ দুটি কাঠির সাহায্যে।

দ্বিতীয় পর্বকে জাপানী ভাষায় বলা হয় **নাকাদাচি** (**Nakadachi**) অর্থাৎ ক্ষণিক বিরাম। এই সময়টা হচ্ছে চা প্রস্তুত করার সময়। মাশাদের চা প্রস্তুত করার জন্য আলাদা কোন ঘর না থাকাতে ওঁদের কন্যা তার বান্ধবীদের সহায়তায় এই ঘরেই চা প্রস্তুত করতে শুরু করল। চা প্রস্তুত করার আগে পাত্রগুলিকে গরম জলে ভাল করে ধুয়ে, সেগুলিকে পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে বেশ পরিপাটি করে মুছে নেওয়া হল। তারপর একটা কেটলিতে করে জল ফুটিয়ে তাতে বাঁশের তৈরি চামচে করে পরিমাণ মত গুঁড়ো সবুজ চা ঢেলে দিল। জাপানী ভাষায় এই চামচকে বলা হয় চা-শাকু (Cha-Shaku)। এরপর এতে পরিমাণ মত নুন দিয়ে, দাড়ি কামাবার ব্রাশের মত দেখতে একটা বাঁশের তৈরি ব্রাশ দিয়ে ঐ লিকারটা বেশ করে গুলিয়ে নেওয়া হল। এই ব্রাশের জাপানী নাম হচ্ছে চা-সেন (Cha-Sen) একে ইংরাজীতে বলা হয় ব্যাম্বু টী হুয়িস্ক (Bamboo Tea Whisk)।

শুরু হল অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব গোজা-ইরি (Goza-Iri) অর্থাৎ সবুজ-চা পরিবেশন। কারুকার্য করা সুদৃশ্য চীনামাটির বাটিতে করে এই চা রাখা হল আমাদের খাবার টেবিলে। প্রথম অতিথি অতি সন্তর্পণে বাটিটা হাতে তুলে নিলেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ধীরে ধীরে তাতে ২।৩টি চুমুক দিলেন। এরপর পাত্রটি বাঁহাতে ধীর ন্যাপকিন দিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দেওয়া জায়গাটা মুছে সেটিকে এগিয়ে দিলেন পাশের অতিথির দিকে। এইভাবে শেষ তলানিটুকু পড়ল গৃহস্বামিনীর অর্থাৎ মিসেস মাশার ভাগ্যে। এইটিই হচ্ছে চা-পান অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ।

আর চতুর্থ পর্বকে বলা হয় উসুচা (Usucha)। এটি চা-পান অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব। এতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কাপে করে দুধ ও চিনি মিশ্রিত

আসল চা পরিবেশন করা হল। আসল চা বলতে যে চা আমরা নিত্য পান করে থাকি, সেই চা। পূর্ববৎ কাপটিকে সন্তর্পণে তুলে নিয়ে সেটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করে তার গঠন সৌকর্যের প্রশংসা করা হল এবং ধীরে ধীরে পেয়ালাতে চুমুক দেওয়া হল। প্রত্যেকটি পেয়ালাই কারুকলার এক একটি নিদর্শন। এই চা ধীরে সুস্থে বেশ মৌজ করে পান করাই রীতি। প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগল এই অনুষ্ঠান শেষ হতে। সমস্ত সময়টা একাগ্রচিত্তে স্থির হয়ে বসে থাকাটাই নিয়ম। আমরা ওঁদের স্থানীয় অতিথিদের অনুকরণ করলাম মাত্র। জানি না নিয়মমাফিক সব ঠিকঠাক করতে পারলাম কিনা। তবে বেশ ভাল লাগল এঁদের এই আচারনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা।

চা পর্ব শেষে মাশার জামাতা আমাদের আটকালেন আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার জন্য। নানা রকম কথাবার্তার পর উঠল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গ। আমি জানতে চাইলাম—কি করে জাপান সামরিক শক্তিতে এত শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং কেনই বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল?

উত্তর দিলেন মিস্টার মাশা—তাহলে জাপানের পূর্ব ইতিহাস কিছু বলা দরকার। এই বলে তিনি বলতে শুরু করলেন:—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহির্বিশ্বের কাছে জাপানের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য জাপানকে প্রবল চাপের সম্মুখীন হতে হল। জাপানের আভ্যন্তরীণ জীবনেও ইয়েয়াসুর প্রতিষ্ঠিত কঠোর সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর ওপরও অগ্রগতির চাপ আসতে লাগল। এমন সময়ে ১৮৫৪ সালে মার্কিন কমোডোর ম্যাথু সি পেরী জাপানের সমস্ত বাধা নিষেধ অমান্য করে কতকগুলি বাষ্পীয় পোত নিয়ে হাজির হলেন জাপানী দ্বীপপুঞ্জে। উদ্দেশ্য—জাপানের কাছ থেকে আমেরিকার অনুকূলে বন্ধুত্বের এক চুক্তিপত্র আদায় করা। এর আগে জাপানীরা কখনও বাষ্পীয় জলযান দেখেনি। তাই ওঁরা অবাক হলেন এবং সম্রাট চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। ঐ বছরেই জাপান অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করল অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সঙ্গেও।

১৮৬৮ সাল থেকে শুরু হল সম্রাট মেইজির যুগ। এই যুগকে বলা হয় 'জাপানের নবজাগরণের যুগ'। সম্রাট মেইজি এক প্রতিজ্ঞার সনদ প্রচার করলেন—সমগ্র বিশ্ব থেকে নব্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উপহার আহরণ করতে হবে এবং তাই দিয়ে সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। এরপর ১৯০২ সালের ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জাপান মিত্রশক্তির পক্ষ

নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হল এবং একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উন্নীত হল।

এদিকে জাপানের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। জাপানের আর এক ফোঁটাও জমি নেই চাষের বা বাসের জন্য, সুতরাং জাপানকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে তার রাজ্য বিস্তারের জন্য।

ওদিকে ব্রিটেন এশিয়ায় তার স্বার্থ রক্ষার্থে ঝুঁকল জাপানের দিকে। ১৯০২ সালে ব্রিটেনের সহযোগিতায় জাপানের গড়ে উঠল এক শক্তিশালী নৌ-বহর। জার্মানীও পিছিয়ে রইল না। তাদের প্রশিক্ষণে গড়ে উঠল জাপানের দুর্ধর্ষ স্থল ও বিমান বাহিনী।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর লাগল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ সালে জাপান যোগ দিল অক্ষশক্তির পক্ষে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্তে ভাগ বাঁটোয়ারায় জাপানের কপালে জুটেছিল ছিটেফোঁটা, সিংহ ভাগ নিয়েছিল ব্রিটেন এবং আমেরিকা।

ইটালী ও জার্মানীর পরাজয়ের পরে মিত্রশক্তির কাছ থেকে ঘন ঘন তারবার্তা আসতে লাগল জাপানের কাছে, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করার জন্য। কিন্তু জাপানী সৈন্যদের মনোবল অটুট রইল। তারা কিছুতেই বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। জাপান একক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে জাপানের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব বাধল। একদল চায় আত্মসমর্পণ করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে, আর অপর দল আত্মসমর্পণের বিপক্ষে।

এরপর জাপানের ওপর শনি ও রাহুর দৃষ্টি পড়ল। ঘটতে লাগল একের পর এক পরাজয়। এরপর ১৯৪৫ সালের ৫ই এপ্রিল সোভিয়েত সরকার রুশ-জাপান আক্রমণ চুক্তি বাতিল করে জাপান আক্রমণ করল।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস, টোকিওতে সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিলের সভা বসেছে। সেখানে আত্মসমর্পণের প্রশ্ন নিয়ে উচ্চতর মহলে চলেছে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা। এমন সময় খবর এলো মার্কিনরা হিরোশিমা দ্বীপে আণবিক বোমা ফেলেছে। হিরোশিমা দ্বীপ জাপানের মানচিত্র থেকে মুছে গেছে। ৯ই আগস্ট আবার তারবার্তা এলো দ্বিতীয় পরমাণু বোমা পড়েছে নাগাসাকিতে। সভাসদ্দের ধারণা হল এবার তৃতীয় বোমা পড়বে নির্ঘাত টোকিওর ওপরে।

১৯৪৫ সালের ১৩ই আগস্ট রাজপ্রাসাদের পাতাল-কক্ষে সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিলের জরুরী সভা বসেছে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। চরমপন্থী এবং নরমপন্থী উভয় দলের মধ্যে চলেছে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা। এমন সময় দেখা

গেল যে, সম্রাট তাঁর সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। যদিও বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার কোন অধিকার সম্রাটের নেই তথাপি তিনি ধীর এবং ভাবাবেগ কণ্ঠে জানালেন—আমি আমার নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছি না। কিন্তু প্রজাবৃন্দের এই দুঃখ-দুর্দশা এবং নৃশংস মৃত্যু আমি আর সহ্য করতে পারছি না। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার অর্থ হচ্ছে আরও লোকক্ষয় করা এবং আরও ধ্বংস ডেকে আনা। তাই স্বদেশ এবং বিদেশের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করে আমি যুদ্ধাবসানের সিদ্ধান্তই নিলাম।

অধিবেশনান্তে নিঃশব্দে এবং নত মস্তকে একে একে সকলেই বেরিয়ে গেলেন সভাকক্ষ ত্যাগ করে। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করল না যে, ঘরের এক কোণে দু'হাতে মুখ ঢেকে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে পড়ে রইলেন জাপানের বীর যোদ্ধা, যুদ্ধ-মন্ত্রী জেনারেল আনামি।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে হোটেলে ফিরে সোজা চলে গেলাম খাবার ঘরে। একটু রাত হয়ে গেছে, তাই খাবার ঘর নির্জন। খেতে বসে মুখার্জীদা বললেন—বোসদা, জাপানে অদ্যই আমাদের শেষ রজনী, সুতরাং এমন রজনীকে বৃথা যেতে দেওয়া উচিত হবে না। বলে, তিনি ওয়েট্রেসকে ডেকে সেকের (জাপানী মদ) ফরমাশ করলেন।

টেবিলে সেক এবং রাতের খাবার দুই এলো। সেক বিশ্বাসঘাতকতা করল না। মনটা হাল্কা হল, বেশ গোলাপী একটা নেশা ধরেছে এমন সময়ে সাহাদা অনুরোধ করলেন ওমর খৈয়ামের একটা বয়েত শোনাবার জন্য। সে তো আমার ঠোঁটের ডগায় গিজ গিজ করছে। আমি শোনালাম :—

"তখন ফিরে মুখটি চুমি
কাঁচের গড়া গেলাসটির,
সুধাই তারে রহস্যটার
অর্থ সে কি খুব গভীর ?
অধর পরে রাখতে অধর,
বাজল কানে অস্ফুট স্বর
যদ্দিন বাঁচো পান করে নাও,
ফিরবে না আর মরণ পর "।

একে সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে দেহ ও মন দুই ক্লান্ত, তার ওপরে সেকের কৃপায় বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম স্বপ্নরাজ্যে।

সকাল আটটার আগে আমরা কেউই বিছানার কোল ছাড়লাম না। আজ আর আমাদের ঘোরাঘুরির বালাই নেই, কারণ আজই আমাদের জাপান ছেড়ে চলে যেতে হবে। নিত্যকর্ম ও ব্রেকফাস্ট সেরে শুরু হল মুসাফিরদের তল্পিতল্পা গুটানোর পালা। দুপুর বারোটায় আমরা সদলে হাজির হলাম ওসাকায় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ইতামি (Itami)-তে।

এখানকার করণীয় যাবতীয় কাজকর্ম মিসেস মাশাই আমাদের হয়ে করে দিলেন। তারপর মিসেস মাশা একে একে আমাদের সবাইকেই জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে প্রত্যেকেরই কপালে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে দিলেন এক বিন্দু করে নয়নের জল। আমাদের বিমানে ওঠার ডাক পড়ল। মিসেস মাশা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় জানিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে ধীরে ধীরে গিয়ে উঠলেন টার্মিন্যাল ভবনের ছাদে। প্লেনের কাঁচের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মিসেস মাশা টার্মিন্যাল ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে, আমাদের পরিচিত সেই লাল নিশানটি নাড়িয়ে আমাদেরকে বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছেন।

আমাদের প্লেন গজরাতে গজরাতে দুপুর একটায় আকাশে উঠে পড়ল। বিদায় জাপান, বিদায়। আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হল। সাহাদা জিজ্ঞাসা করলেন—বোসদা, জাপান কেমন লাগল? উত্তরে জানালাম—অতুলনীয়। জাপান দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি এবং তার প্রেমে পড়ে গেছি। আমার কল্পনার জাপান বাস্তবের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। প্রাচ্যেও যে এত সুন্দর এবং আধুনিক দেশ আছে, তা নিজ চোখে না দেখলে কেউ কল্পনা করতে পারবে না। এরপর সাহাদাকে একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েক লাইন প্যারডি (Parody) শুনিয়ে দিলাম :—

"কে বলেরে—অসভ্য চীন, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয় ॥
আমি বলি—সুসভ্য চীন, সুসভ্য জাপান,
তারাই স্বাধীন, তারাই প্রধান,
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়" ॥

বিমান আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই বিমান-সেবিকারা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ নিয়ে এসে হাজির হল। খাদ্যগুলি বেশ মুখরোচক। সুতরাং আহারের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেল। এরপর বিকেল সাড়ে তিনটের সময়

আমাদের চা ও স্ন্যাকস্ দিয়ে গেল। মাশাগৃহের পর এই দ্বিতীয়বার আমরা বিকেলে পরম্পরাগত? চা পান করলাম।

হঠাৎ মাইক ঘোষণা করল—আপনারা যে যার সীট বেল্ট কোমরে বেঁধে নিন, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা হংকং-এর কাইটাক (Kaitak) বিমান বন্দরে অবতরণ করব।

নীচের দিকে তাকাতে দেখতে পেলাম পাহাড় ও সমুদ্রে ঘেরা সেই পরিচিত খুদে দ্বীপটিকে। তারপর আমাদের বিমান যথা সময়ে অর্থাৎ বিকেল সাড়ে চারটেয় নির্বিঘ্নে হংকং-এর ভূমি স্পর্শ করল। ওসাকা থেকে হংকং পর্যন্ত ২৬৩০ কিলোমিটার বা ১৬৩৪ মাইল আসতে আমাদের সময় লাগল সাড়ে তিন ঘণ্টা।

হংকং (Hong Kong)

শুল্ক বিভাগ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই এক চীনা তরুণী এগিয়ে এসে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বলল, আমি আপনাদের হংকং পরিভ্রমণের গাইড, আমার নাম তাই স্যাং (Tai Sang)।

মেয়েটি বেশ প্রগল্‌ভা। যদিও তার চ্যাপটা নাক এবং ছোট ছোট দুটি চোখ তা হলেও তাকে সুন্দরী বলা চলে। বাতানুকূল বাসে করে যেতে যেতে হাসতে হাসতে তাই স্যাং বলল, এই যে ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি বা উপনিবেশ, আজকের এই হংকং দেখছেন, এ কিন্তু এর প্রজন্মের জন্য আফিমের কাছে ঋণী। আজকের এই কোলাহল মুখর ও কর্মচঞ্চল হংকং হচ্ছে বণিক, ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের স্বর্গপুরী। পূর্বে এই পার্বত্য দ্বীপটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ অনুর্বর ভূখণ্ড এবং আফিম যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এটি ছিল পরিত্যক্ত একটি দ্বীপ। তৎকালীন ইংরেজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন ক্যান্টন থেকে। ক্যান্টনে কিন্তু বিদেশী মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। তাই ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের পুরুষরা থাকতেন এই ক্যান্টনে এবং তাদের পরিবারবর্গকে রাখা হত পর্তুগীজ অধিকৃত ম্যাকাউ দ্বীপে। এর মধ্যে

ব্রিটেনের উইলিয়াম জার্ডিন এবং জেমস্ ম্যাথেসন ছিলেন আফিম ব্যবসায় ধুরন্ধর। আর্থিক লেনদেন ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের দিক থেকে তারা ছিলেন খুবই সৎ এবং উদার। কিন্তু নিষিদ্ধ দ্রব্য ও সংজ্ঞাবিলোপকারী ঔষধাদি বিক্রির সময় নৈতিক দিক থেকে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা ধর্মযাজকদের মাধ্যমে চীনে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আফিমের গুণাগুণও প্রচার করতেন।

এই আফিম বিক্রয়জনিত লাভের একটা মোটা অংশ পেতেন চীনের সম্রাট। কিন্তু ১৮৩৯ সালে তাঁর টনক নড়ল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই আফিমের মাধ্যমে চীনের সমস্ত সোনা ও রুপো চলে যাচ্ছে ব্রিটেনে। ফলে তিনি এক আদেশ জারি করে চীনে আফিম সেবন নিষিদ্ধ করলেন। এই আদেশ কার্যকরী করার ভার দিলেন জেনারেল লিন্-ৎসে-হসু (Lin-Tse-Hsu)-কে। জেনারেল লিন্-ৎসে-হসু হুকুম জারি করলেন যার কাছে যত আফিম সেবনের পাইপ এবং আফিম মজুত আছে অবিলম্বে তা সরকারের কাছে সমর্পণ করতে হবে। যারা এই হুকুম অমান্য করবেন জনসমক্ষে তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই চীনের সমস্ত আফিম সেবনের পাইপ ও মজুত আফিম সংগৃহীত হল এবং সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত করা হল। সেইসঙ্গে চীনে আফিম প্রবেশও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এতে জার্ডিন এবং ম্যাথেসন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ জানালেন সৈন্যবাহিনী পাঠানোর জন্য। লর্ড নেপিয়ারের নেতৃত্বে একটি নৌবহর এলো। চতুর চীনারা তা জানতে পেরে নিমজ্জিত জাহাজ দিয়ে অবরোধ করল ক্যান্টনের প্রবেশ পথ। লর্ড নেপিয়ার ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তখন জেনারেল লিন্-ৎসে-হসু দাবী জানালেন ইংরাজদের জাহাজে ও ক্যান্টনের গুদাম ঘরগুলিতে যত আফিম মজুত আছে তা সব চীনা-বাহিনীর হাতে সমর্পণ করতে হবে এবং তারা ভবিষ্যতে আর কোন দিন চীনে আফিমের ব্যবসা করবে না এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে। ইংরাজরা এক হাজার বাক্স আফিম জমা দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু ধূর্ত জেনারেল লিন-ৎসে-হসু তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে ক্যান্টন দ্বীপটিকে অবরোধ করলেন এবং ইংরাজদের জাহাজ, কলকারখানা ও গুদাম ঘরগুলিতে তল্লাশী চালিয়ে উদ্ধার করলেন বিশ হাজার বাক্স আফিম। ইংরাজরা পরিত্রাণ পেল এই শর্তে যে সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া তারা ক্যান্টনে প্রবেশ করতে পারবে না।

মুক্তি পেয়ে ইংরাজরা ক্যান্টন ছেড়ে চলে গেলেন ম্যাকাউ দ্বীপে তাদের পরিবারবর্গের কাছে। সেখানে ইংরাজ ও চীনা খালাসীদের মধ্যে লাগল তুমুল

ঝগড়া। জেনারেল লিন-ৎসে-হ্সু দাবী জানালেন যে, সমস্ত ইংরাজ খালাসীকে চীনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন ইলিয়ট এতে রাজী না হওয়াতে জেনারেল লিন্ হুকুম দিলেন—কোন চীনা ভৃত্য যেন কোন ইংরাজের গৃহে কাজ না করে এবং ম্যাকাউয়ের পর্তুগীজ সরকারকে অনুরোধ জানালেন যে, তারা যেন কোন ইংরাজকে খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করেন। ক্যাপ্টেন ইলিয়টের নৌবাহিনীর সঙ্গে জেনারেল লিন্-এর নৌবাহিনীর সংঘর্ষ বাধল হংকং-এর কাছে। পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে দলবল নিয়ে পালালেন ক্যাপ্টেন ইলিয়ট।

জার্ডিন এবং ম্যাথেসনের অনুরোধে ১৮৪০ সালে লর্ড পামারস্টোনের নেতৃত্বে আবার এলো বিরাট এক নৌবাহিনীর সঙ্গে স্থলবাহিনীও। এবার এরা সংখ্যায় চীনাবাহিনীর দ্বিগুণ। জার্ডিন এবং ম্যাথেসনের কথা মত লর্ড পামারস্টোন তিনটি শর্ত জানিয়ে একটি দাবীপত্র পেশ করলেন চীনা সম্রাটের কাছে। শর্তগুলি হল :—(১) সম্রাটকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে ইংলণ্ডের রাণী এবং তাঁর সরকারের কাছে, (২) যে বিশ হাজার বাক্স আফিম ওরা জোর করে কেড়ে নিয়েছেন তার পুরো দাম দিতে হবে এবং (৩) একটি চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হতে হবে যাতে ক্যাণ্টন, সাংহাই, ফুচোউ (Foochow), নিংপো (Ningpo), এ্যাময় (Amoy) প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে ইংরেজরা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারে।

চীন সরকার নীরব রইলেন। চীন সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়াতে ক্যাপ্টেন ইলিয়ট তখন বোগ (Boogue)-এ প্রবেশের পথের চীনা-দুর্গ অবরোধ করলেন। আবার সংগ্রামে চীনের পরাজয় ঘটল। ক্যাপ্টেন ইলিয়ট হাজার হাজার নিরীহ দ্বীপবাসীকে নির্দ্বিধায় হত্যা করলেন। এতে লর্ড পামারস্টোন ইলিয়টের ওপর অত্যন্ত রুষ্ট হলেন এবং খানিকটা সদয় হলেন চীনের প্রতি। তিনটি শর্তের পরিবর্তে মাত্র একটি শর্ত পেশ করলেন চীন সম্রাটের দরবারে। শর্তটি হল—হয় ইংরেজকে চীনে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক নতুবা তাদের একটি দ্বীপ দেওয়া হোক, যেখানে তারা উপনিবেশ স্থাপন করে নিজস্ব পতাকা তলে স্বাধীন ভাবে বসবাস করবেন।

১৮৪১ সালের ২০শে জানুয়ারী চেন্‌পুই (Chenpui)-তে একটা ইঙ্গ-চীন চুক্তি সম্পাদিত হল। সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে ক্যাপ্টেন ইলিয়ট হংকং দ্বীপটি বেছে নিলেন। অচিরে ক্যাপ্টেন ইলিয়ট হংকং দ্বীপটিকে ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনী

বা উপনিবেশ বলে ঘোষণা করলেন এবং সেখানে ব্রিটিশ পতাকা ওড়ালেন। জুন মাস নাগাদ ইলিয়ট এই দ্বীপে জমি বিক্রি করতে শুরু করলেন। দ্বীপে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল বাড়ি-ঘর, শুরু হল বসবাস।

এবার আমাদের গাইড মিস্ তাই স্যাং হংকং-এর গঠন প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বিবরণ জানালেন—হংকং তিনভাগে বিভক্ত। হংকং দ্বীপ, কাউলুন উপদ্বীপ এবং কাউলুন সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ব্রিটিশ সরকারের নতুন উপনিবেশ 'নিউ টেরিটরি'। এই তিনটি অঞ্চলকে সামগ্রিকভাবে হংকং—ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি বলা হয়। ১৮৬০ সালে পিকিং সম্মেলনের সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী কাউলুন উপদ্বীপটি ব্রিটিশ সরকারের হস্তগত হয়েছিল, কিন্তু জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৮৯৮ সালে ব্রিটেন চীনের কাছ থেকে কাউলুন সংলগ্ন এই অঞ্চলটি ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নেন।

এই নিউ টেরিটরিকে নিয়ে বর্তমান হংকং-এর আয়তন ৪০০ বর্গমাইল। কাউলুন থেকে চীনের মূল ভূখণ্ড ক্যান্টন পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের জন্য একটি সড়ক পথ আছে। একটি রেলপথও আছে, তবে সেটি গিয়েছে নিউ টেরিটরি সীমান্ত স্টেশন লো উ (Lo Wu) পর্যন্ত। তারপর একটি নদীর ওপরের সেতু পেরিয়ে প্রবেশ করতে হয় চীনের মূল ভূখণ্ডের সীমান্তে। এই নদীটিই দুটি সীমান্তকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান এই দ্বীপটিকে অধিকার করে নেয়। তারপর ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পরে ব্রিটেন পুনরধিকার করে তার হারানো দ্বীপটি। ১৯৪৬ সালের ১লা মে এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় অসামরিক সরকার।

আমাদের বাস একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল। গাইড জানালো, এই সুড়ঙ্গ-পথের নাম ক্রস্ হারবার টানেল। কাউলুন এবং হংকং-এর মধ্যবর্তী তিন মাইল প্রশস্ত হংকং প্রণালীর নীচ দিয়ে গেছে। পূর্বে সমুদ্র-পথে ফেরি লঞ্চে দ্বীপ থেকে উপদ্বীপে যেতে সময় লাগত আধঘণ্টা, বর্তমানে এই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে মোটরে করে যেতে সময় লাগে মাত্র ৬।৭ মিনিট।

ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে একটি কবিতা পড়েছিলাম—

'উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর,
এর চেয়ে অপরূপ আছে কিবা আর।'

কিন্তু টেমস্ নদী দেখে হতাশ হয়েছিলাম। যদিও টেমস্ নদীর ওপর দিয়ে স্টীমার ও লঞ্চ চলাচল করে এবং তার নীচে দিয়ে নরও চলাচল করে, তথাপি

নদীটি প্রশস্তে এত ছোট যে তা দেখে মোটেই মন ভরে না। জাপানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাবার জন্য সমুদ্রের নীচ দিয়ে রেলপথও আছে, কিন্তু তাতে চড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। স্যাং আমাদের এই সুড়ঙ্গ-পথের বৃত্তান্ত শোনাতে শুরু করল :—

ক্রস্ হারবার টানেল (Cross Harbour Tunnel) :—হংকং উপসাগরের তলদেশ দিয়ে এই সুড়ঙ্গ-পথ বানানো হংকং গভর্ণমেণ্টের একটি কৃতিত্বের নিদর্শন। এটি বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ নিদর্শন। তৎকালীন গভর্ণর স্যার মারে ম্যাক্লে হোস এই সুড়ঙ্গ-পথটি উন্মুক্ত করেন ১৯৭২ সালের ২রা আগস্ট। ঐ সালের অক্টোবর মাসে প্রিন্সেস্ আলেকজাণ্ড্রা সরকারি সফরে হংকং-এ এসে এই সুড়ঙ্গ-পথের স্মারক ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। এই সুড়ঙ্গ-পথটি দৈর্ঘ্যে তিন মাইল। এতে যাতায়াতের জন্য দুটি ভিন্ন পথ আছে। দৈনিক প্রায় ২০ হাজার যানবাহন চলাচল করে এই পথ দিয়ে। আর ছুটির দিনে চলাচল করে প্রায় ৩০।৩৫ হাজার যানবাহন।

আমাদের গাড়ি হংকং দ্বীপে প্রবেশ করতেই গাইড জানালো যে, এটি একটি প্রাকৃতিক বন্দর। প্রকৃতি তৈরি করেছে এই বন্দরটিকে আর মানুষ করেছে এর সংস্কার। এর আসল চীনা নাম হচ্ছে হিউয়ং কং (Heung Kong) অর্থাৎ সুরভিত বন্দর, ইংরেজরা এর নাম দিয়েছেন হংকং। হংকং একটি পাহাড়ী দ্বীপ, তাই এর পথঘাট উঁচুনীচু। সূর্যমামা পাটে বসতে শুরু করেছেন এমন সময়ে আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের বাসস্থান চাইনীজ ইণ্টারন্যাশনাল ওয়াই এম্ সি এ (Chinese International Y. M. C. A.)-তে।

১৮ তলা বিশিষ্ট শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ভবন। এখানে প্রত্যেক ঘরই তিন শয্যাবিশিষ্ট। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গেই স্নানঘর ও পায়খানা যুক্ত। সাহাদা, মুখার্জীদা ও আমার থাকার জন্য ১২ তলার ওপরে রাস্তার ধারের একটা ঘর মিলেছে। আমাদের সামনের ঘরে আছে সিং, সমর ও বাসুদেব। হোটেলটি পাঁচতারা যুক্ত না হলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার দিক থেকে আমাদের কলকাতার গ্র্যাণ্ড বা গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

ঘরের কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সুদূর নীল আকাশের গায়ে একে একে ফুটে উঠছে রূপালী তারার দল। অদূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ি-ঘর দোকান-পাটগুলিতে জ্বলে উঠছে বিভিন্ন রঙের ফ্লুরেসেণ্ট আলো। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বেশ পরিবর্তন করে স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে করে নেমে

এলাম একতলায় এবং সোজা ভোজন-কক্ষে গিয়ে মিলিত হলাম আমাদের দলের অন্য সকলের সাথে। মিসেস লালকাকার মেন্নু অনুযায়ী খাদ্য পরিবেশন করা হল:—মাশরুম স্যুপ, পাঁউরুটি, চীজ্‌ড চিকেন্‌-চৌমিন চিলি-চিকেন্‌, ক্যারাম্যেল কাস্টার্ড পুডিং ও কফি।

খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। দলবদ্ধ হয়ে হেঁটে চলেছি নৈশ খোলা বাজার দেখতে। অপরূপ আলোকসজ্জায় সেজেছে হংকং নগরী। মনে হচ্ছে যেন দীপান্বিতা উৎসবে মেতে উঠেছে হংকং নগরী। রাতের প্যারী নগরী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, মুগ্ধ হলাম রাতের হংকং নগরী দেখেও।

রাত্রি ন'টা বেজে গেছে, এখনও দেখছি, পথে-ঘাটে লোকজন গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এর মধ্যে নিশাচর নিশাচরীর দলও আছে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানকার লোক আপনি এখানে দেখতে পাবেন না। জগৎ যদি কোথাও এসে কোলাকুলি করে থাকে তা হল এই হংকং-এর ভূমিতে। এ হল মহামিলনের একটি সাগরতীর। এ যেন হংকং-এর বারোয়ারি হাঁড়িতে যাকে বলে সব কিছু ঘেঁটেঘুঁটে খিচুড়ি হয়ে গেছে।

বাজার বসেছে রাস্তার ফুটপাথে ও খোলা ময়দানে। ইলেকট্রিক বাতি তো রয়েছেই, তাছাড়াও রয়েছে হ্যাজাক জাতীয় নানা রকম সব বাতি। বিরাট বাজার। লোকজনের ভিড়ও তেমনি। এমন জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ দোকানই হচ্ছে চীনা রমণীর, তবে হিন্দুস্থানী ও পাকিস্তানীদের দোকানও কিছু কম নয়। এখানকার জনসংখ্যার অধিকাংশই চীনা হলেও ইংরাজী হচ্ছে এখানকার সরকারী ভাষা। ক্যাণ্টনী ভাষারও প্রচলন আছে এখানে। আর হিন্দী বা উর্দু ভাষাও একেবারে অচল নয়। এখানকার দোকানীরা পর্যটকদের দেখলে অত্যন্ত চড়া দাম হাঁকে, তাই গাইড আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে যে, ওরা যা দাম বলবে, আমরা যেন তার অর্ধেক দাম বলি। এখানে দেখা হল সিং-এর এক পাকিস্তানী বন্ধুর সঙ্গে। নাম রফিক। দেশ লাহোরে। এখানে ওঁর ব্যবসা আছে। সঙ্গে রয়েছেন ওঁর স্ত্রী। তিনি ইশারায় এখান থেকে কোন জিনিস কিনতে নিষেধ করলেন এবং বললেন কোন ডিপার্ট-মেণ্টাল স্টোরস্‌ থেকে জিনিসপত্র কেনাই শ্রেয়। এরপর ওঁরা দুজনেই একদিন ওঁদের গৃহে যাবার জন্য আমাদের অনুরোধ জানালেন।

রাত বারোটায় শুরু হল সব দোকান-পাটের ঝাঁপ ফেলার পালা। সেই সঙ্গে একে একে নিভতে লাগল দোকান-পাটের আলোগুলি। আমরাও পা

বাড়ালাম হোটেলাভিমুখে। রাস্তার ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেছে, ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রেতা বিক্রেতাদের কোলাহল। পথের এদিকে ওদিকে তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবলমাত্র তারাই, যাদের তখনও কোন শিকার জোটেনি।

পরদিন সকালে মুখার্জীদা আমাকে আট মার্কিন ডলার কর্জ দিলেন। আটটায় ছোট হাজরি সেরে সংরক্ষিত বাসে করে আমরা চললাম হংকংয়ের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে। টিপ টিপ করে মুক্তার দানার মত বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের গাইড তাই স্যাং বলতে শুরু করল—যদিও সমগ্র ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনিটিকে তিনভাগে বিভক্ত বলা হয়, আসলে কিন্তু এটি চারভাগে বিভক্ত, যথা :—হংকং (৩০ বর্গমাইল), কাউলুন (৫ বর্গমাইল), নিউ-কাউলুন (১২ বর্গমাইল) এবং নিউ-টেরিটরি (৩৫৩ বর্গমাইল)।

আমাদের বাস এসে দাঁড়াল একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড়ে ওঠার একটা প্রবেশ দ্বার রয়েছে। অশ্বখুরাকৃতি একটি ফলকে লেখা রয়েছে 'টাইগার বাম'। গাইড জানালো এটি একটি উদ্যানের নাম।

উদ্যানে ওঠার পথের দু'পাশে সারিবদ্ধ ভাবে রয়েছে সুন্দর সুন্দর বিপণী। দোকানদারী করছে চীনা রমণীরা। এর মধ্যে স্বল্প মূল্যের লোভনীয় যে বস্তুগুলি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে পলিথিন কাগজের রঙিন ছাতা, ভেল্‌ভেটের তৈরি মহিলাদের হাতব্যাগ, চটি-জুতা এবং কাপড়ের তৈরি পুতুল। এছাড়া নানা রকম খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁ ও পানীয়র দোকানও রয়েছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তাই ৫০ হংকং সেণ্ট অর্থাৎ ভারতীয় এক টাকা দিয়ে একটা পলিথিনের রঙিন ছাতা কিনলাম এবং তা দিয়ে মাথা ঢেকে পাহাড়ের ওপরের উদ্যানে এলাম।

টাইগার বাম (**Tiger Balm**) :—কাশ্মীরের মুঘল উদ্যানগুলির মত এটিও ধাপ কাটা কাটা, অর্থাৎ স্তরে স্তরে ফল, ফুল, পাতাবাহারী প্রভৃতি নান রকম গাছপালা শোভিত, সাজানো-গুছানো সুন্দর একটি উদ্যান : এই উদ্যানের মাঝে মাঝে রয়েছে গুহার অনুকরণে নির্মিত অনেকগুলি ঘর ও মণ্ডপ। এই গুহা এবং মণ্ডপগুলির মধ্যে রয়েছে চীনাদের নানা রকম দেব-দেবী, লোককাহিনী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মানুষ সমান প্রতিমূর্তি। এই উদ্যানের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট কৃত্রিম হ্রদও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রঙ-বেরঙের গগনচুম্বী কিছু বাড়ি-ঘর। কোনটা আমেরিকান ধরণের আবার কোনটা বা চীনাদের প্যাগোডা ধরণের। এই উদ্যানের মাঝখানকার জেড্

ভবনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ভবনের মধ্যে রয়েছে সারা বিশ্ব থেকে সংগৃহীত নানা রকম মূল্যবান জেড্ পাথরের এক প্রদর্শনী।

বাগান থেকে নেমে আসার পথে গাইড আমাদের শোনাল এই বাগানের বৃত্তান্ত। আমাদের দেশে যেমন অম্রুতাঞ্জন, হিলিং বাম ইত্যাদি শিরঃপীড়ার নানারকম মলম আছে, টাইগার বামও সেই জাতীয় একপ্রকার মলম। অ (Aw) নামে এক ভদ্রলোক এবং তাঁর ভাই মিলে এই মলমের ব্যবসা করতেন। এই ব্যবসায় ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। সেই অ-ভ্রাতৃবৃন্দই ১৯৩৫ সালে এক কোটি ষাট লক্ষ হংকং ডলার ব্যয়ে ৮ একর বা ২৩ বিঘা জমির ওপর এই উদ্যানটি নির্মাণ করান। এক হংকং ডলার আমাদের ভারতীয় ২ টাকার সমান। সেই মলমের নাম অনুসারেই এই বাগানটির নাম রাখেন টাইগার বাম।

আমাদের বাস চলেছে, গাইড মাইকে মুখ রেখে বলে চলেছেন—এই হংকং দ্বীপে বসবাস করে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনেরা। এখানে ধনী পরিবারের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। কাউলুন হচ্ছে অভিজাত পল্লী, আর শ্রমিকশ্রেণী এবং চাষী সম্প্রদায় বসবাস করে যথাক্রমে। নিউ কাউলুন এবং নিউ টেরিটরিতে। তবে জেনারেল পোস্ট অফিস, পুরনো রাজপ্রাসাদ ও গভর্ণমেণ্ট হাউস ইত্যাদি এখনও এই হংকং দ্বীপেই বিদ্যমান। আমাদের বাস রাজভবনের সামনে আসতে গাইড রাজভবনের বিপরীত দিকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ একটি ভবন দেখাল। এই ভবনটির নাম 'হেলেনা মে ইনস্টিটিউট'। তৎকালীন গভর্ণরের পত্নী দ্বারা নির্মিত এটি কর্মরত মহিলাদের আবাস। এরপর আমাদের বাস এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া পীকের পাদদেশে। গাইড জানালো যে এই পাহাড়ের চূড়ায় হয় পায়ে হেঁটে, নতুবা তারের রজ্জুচালিত ট্রামগাড়ি করে উঠতে হয়।

পীক্ ট্রাম (Peak Tram):—গাইড আমাদের জন্য ট্রামের টিকিট কিনে আনল। এক পিঠের ভাড়া ৬৩ হংকং ডলার। গাড়িতে ৭২টি বসবার আসন আছে। আসনগুলিতে গদি আঁটা এবং সেগুলি বেশ আরামদায়ক। গাইড জানালো—তারের কাছি দিয়ে টানা, খাড়াই পাহাড়ে ওঠার মজার এক গাড়ি বলে সারা বিশ্বে এর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এই গাড়ি চলাচল করে লাইনের ওপর দিয়ে এবং এর ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দুটি গাড়িকে একই সঙ্গে চালানো হয়। একটি গাড়ি ওপরে ওঠে এবং অপরটি নীচের দিকে নামে। যে কাছি

দিয়ে এই গাড়ি দুটি চালানো হয়, সেটি দৈর্ঘ্যে ৫০০০ ফিট। মধ্যেকার একটি স্টেশনে এসে দুটি গাড়ি একসঙ্গে মিলিত হয়।

এইবার গাইড বলতে শুরু করল এই ট্রামগাড়ির ইতিকথা—এই পাহাড়টির উচ্চতা হচ্ছে ১৮০৯ ফিট কিন্তু এই ট্রামলাইনটি গিয়েছে ১৩০৫ ফিট পর্যন্ত। এই পাহাড়ের ওপরে জনবসতি আছে ও তাদের কাজ-কারবারও আছে এবং তৎকালীন রাজ্যপালও এখানে বাস করতেন। তাঁকে প্রায় সমতল ভূমিতে আসতে হত এবং তাতে তাঁর যথেষ্ট অসুবিধা হত। তাই ১৮৮৮ সালে তিনি এই ট্রামলাইন চালু করেন। তখন অবশ্য এই লাইনের ওপর দিয়ে চলত ঢাকা চেয়ার গাড়ি (Sedan Chair Car) এবং এটি ব্যবহার করতেন কেবলমাত্র রাজ্যপাল ও তাঁর অনুচরবর্গ। ১৯২৫ সালে পুরনো গাড়িটি নবরূপে রূপান্তরিত করে জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। প্রতি ১০ মিনিট অন্তর এই ট্রামগাড়ি চলাচল করে।

আমরা এসে নামলাম ১৩০৫ ফিট ওপরে একটি উপত্যকাতে। এই উপত্যকাটি আড়াই মাইল দীর্ঘ পথ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই উপত্যকায় রয়েছে সুন্দর সুন্দর বাড়ি-ঘর ও একটি পুলিস স্টেশন। চড়াই ভেঙে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। এখানে নবনির্মিত একটি টাওয়ার ভবনের মধ্যে ৩।৪-টি সুন্দর রেস্তোরাঁ রয়েছে। মুখার্জীদা, সাহাদা, সিং ও আমি ঢুকলাম পীক্ কাফে নামে একটি রেস্তোরাঁতে। এক তরুণী চীনা ওয়েট্রেস এসে হাসিমুখে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং আমাদের ফরমাশ মত পটেটো চিপ্‌স্‌, ক্রীমরোল ও গরম দুধ নিয়ে এসে আমাদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘন কুয়াশায় আশপাশের চারিদিক ঢাকা পড়ে গেছে। ঘরের কাচের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করছি। কুয়াশার আবরণ মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে, আর সেই ফাঁকে ফাঁকে তরুণীটি আমাদের দেখাচ্ছে নিউ টেরিটরি ও তার পর্বতশ্রেণী, চীনের মূল ভূখণ্ড ও তার পর্বতমালা, কাউলুন উপদ্বীপ, কাটার উপদ্বীপ, ম্যাকাউ, ফুটো, নিংপো, এ্যাময় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের প্যানারমিক ভিউ।

এরপর তরুণীটি জানতে চাইল, আমরা কোন্ দেশের লোক।

উত্তরে জানালাম, আমরা ইণ্ডিয়ান।

আমাদের উত্তর শুনে হঠাৎ তরুণীটির মুখের ভাব পরিবর্তন হল এবং সে গম্ভীর হয়ে গেল। আমরা এর কোন হেতু খুঁজে পেলাম না।

ভিক্টোরিয়া পীক্ থেকে নেমে আমরা বাসে উঠে বসতেই আকাশ ভেঙে পড়ল। তাই চলন্ত বাস থেকেই আমাদের দেখত হল ডীপ ওয়াটার বে, বিগ ওয়েভ বে, রকি বে, পিকনিক বে ইত্যাদি। গাইড জানালো এখানে দু-বার বর্ষা নামে, একবার জুন-জুলাই আর একবার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে। আর সেপ্টেম্বর অক্টোবার মাস হচ্ছে হ্যারিকেন বা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মাস। তবে এই ঝড়-বৃষ্টি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

রিপাল্‌স্ বে (Repulse Bay) :—গাইড জানালো যে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'রিপাল্‌সের' নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয়েছে রিপাল্‌স্ বে। এর অশ্বখুরাকৃতি সৈকতের তিনটি দিক পাহাড়ে ঘেরা। এটি হংকং দ্বীপের একটি মনোরম উপভোগ্য স্নানের স্থান। এখানে দেখি স্নানার্থী মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই অর্ধনগ্ন অবস্থায়। এর মধ্যে কেউ সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, আবার কেউ বা যুগলবন্দী হয়ে বালুতটে প্রেমালাপে মগ্ন। বালুচরের ওপরে রংবেরঙের ছোট বড় তাঁবু রয়েছে। এখানে কাপড়-জামা রাখা হয়, ভাড়া পাঁচ থেকে দশ হংকং ডলার। আর মিঠে জলে স্নান করার জন্য তীরের ওপরে রয়েছে শাওয়ার যুক্ত ছোট ছোট কন্‌ক্রীটের ঘর। এর ভাড়া এক হংকং ডলার। বৃষ্টি থেমে গেছে। আমাদের বাস এসে থামল একটি বন্দরের কাছে।

অ্যাবার্ডীন (Abardeen) :—বাস থেকে নামতেই গাইড তার বক্তৃতা শুরু করল—এটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও শুল্কমুক্ত একটি প্রাকৃতিক বন্দর। বহির্গামী বহু বিদেশী জাহাজ পানীয় জল সংগ্রহ করে এই বন্দরের নিকটস্থ ঝরণা থেকে। এই বন্দরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন লর্ড অ্যাবার্ডীন, তাই তাঁর নামানুসারেই এর নাম রাখা হয়েছে অ্যাবার্ডীন।

মৎস্যজীবীদের প্রাণকেন্দ্র এই এলাকাতে প্রায় দেড়লক্ষ লোক বসবাস করে। তার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ হচ্ছে মৎস্যজীবী। এই মৎস্যজীবীদের প্রায় ৫০ শতাংশ বাস করে নৌকায়, ৩০ শতাংশ বন্দরের উপসাগরে আর ২০ শতাংশ থাকে খাল, বিল ও নদীতে। আর অবশিষ্ট লোকজনেরা বাস করে নিউ ওয়া ফু হাউসিং এস্টেট্ কলোনিতে। এই ফ্ল্যাটগুলির ভাড়া অল্প হলেও আধুনিক সুখ-সুবিধার দিকে থেকে এর বাসিন্দারা কোন রকম বঞ্চিত হয়নি।

সাহাদা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ঘূর্ণিঝড় এবং তুফানের সময়ও কি এরা এই নৌকোতেই থাকে?

গাইড উত্তর দিল, না, তার জন্য গভর্ণমেণ্ট নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন, ইয়াউমাতি টাইফুন শেণ্টার (Yaumati Typhoon Shelter)। আমরা দেখলাম এই বিরাট আশ্রয়স্থলটি। গাইড জানালো যে এই রকম আশ্রয়স্থল আর একটি আছে কজওয়ে বেতে। তার নাম কজওয়ে বে টাইফুন শেণ্টার (Causeway Bay Typhoon Shelter)।

মাঝদরিয়ায় ভাসছে ফিশিং ফ্লীট অর্থাৎ মাছ ধরার জাহাজসমূহ (Trawlers), তীরে নোঙর করা রয়েছে অসংখ্য হাউস বোট। এগুলিতে মৎস্যজীবীরা বাস করে। পর্যটকদের থাকার জন্য সুন্দর ও সুসজ্জিত বিলাসবহুল বাতানুকুল করা হাউস বোটও রয়েছে। আবার কোন কোন হাউস বোটকে বার এবং রেস্তোরাঁ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

স্যাম্পান **(Sampan)** :—চীনদেশীয় তলা চ্যাপ্টা একপ্রকার ছোট নৌকাকে স্যাম্পান বলে। এই সব স্যাম্পানে করে বিক্রি করা হয় ফল-ফুল, তরি-তরকারি, শাক-সবজি, মাছ-মাংস তো বটেই এমন কি ঘড়ি, পেন, ক্যামেরা, টেপ্-রেকর্ডার, ট্রান্‌জিস্টার, পারফিউম ইত্যাদিও পাওয়া যায়। এই স্যাম্পানে করে কম খরচে উপসাগর পরিভ্রমণও করা যায়।

চাইনীজ জাঙ্ক **(Chinese Junk)** :—উপসাগরের অদূরে নোঙর করা রয়েছে অনেকগুলি বড় বড় পাল তোলা নৌকা। এগুলিকে বলা হয় চাইনীজ জাঙ্ক। খ্রীস্টোফার কলম্বাস-এর সাণ্টা মারিয়া নামের পালতোলা নৌকার অনুকরণে এর প্রথম কাঠামো তৈরি হয়। পরে বিভিন্ন রকম সংস্কারের দ্বারা বর্তমানের রূপে আনা হয়। স্যাম্পানের মত এরও তলদেশ চ্যাপ্টা। এতে তিনটি পাল আছে। মাঝখানের পালটি বেশ বড়, আর সামনে ও পিছনের পাল দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মাঝখান থেকে পিছন পর্যন্ত বসবার স্থানটিতে আরামদায়ক গদি পাতা এবং ছই দিয়ে ঢাকা। পাটাতনের তলদেশে মালপত্র রাখবার স্থান। এগুলিকে প্রধানত উপসাগরে অপেক্ষমান জাহাজগুলিতে মাল বোঝাই ও মাল খালাসের কাজে ব্যবহার করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাঙ্কে থাকে ভিন্ন ভিন্ন রঙের পাল।

গাইড জানালো—আপনি যদি আরও আরামে প্রমোদ ভ্রমণ করতে চান তাহলে তার জন্য রয়েছে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত লঞ্চ এবং স্টীমার। এই সব স্টীমারে নাইট ক্লাবও আছে। সেগুলিতে করে নাচ-গান উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে উপসাগর পরিভ্রমণ করা যায়।

এরপর গাইড আমাদের নিয়ে এলো অ্যাবার্ডীন পল্লীর পিছনে একটি পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল এক সমাধিক্ষেত্রে। এটি হচ্ছে চীনা মৎস্যজীবীদের কবরস্থান। যদিও এদের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহাদি হয় জলে, কিন্তু মৃত্যুর পর এদের ঠাঁই হয় ডাঙ্গার এই কবরস্থানে।

চিং মিং ফেস্টিভ্যাল (Ching Ming Festival) :—এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এখানে হয় চিং মিং উৎসব। ঐ সময়ে মৃতের আত্মীয়-পরিজনরা এখানে এসে কবরের ঘাস ও আবর্জনা পরিষ্কার করে দীপ জ্বালিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এরপর কাগজের টাকা জ্বালিয়ে মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করে।

হাংগ্রি গোস্ট ফেস্টিভ্যাল (Hungry Ghost Festival) :—সপ্তম চান্দ্রমাসের দ্বিতীয়াতে অর্থাৎ আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় মৃতের ক্ষুধিত আত্মার তুষ্টি সাধন উৎসব। আমরা যেমন পিতৃপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ করি এবং পিণ্ডদান করি, এটিও সেই রকম। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মৃত পূর্বপুরুষদের ক্ষুধিত আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য নিবেদন করা। সেই সঙ্গে এখানে বনভোজনেরও আয়োজন করা হয়।

খিদেয় জঠরানল জ্বলছে। দুপুর দেড়টায় হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে সমর ও বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে সিং গেল তার বন্ধু রফিকের কাছে। আর সাহাদা, মুখার্জীদা এবং আমি কিছু কেনাকাটা করার জন্য এখানকার দোকানপাট দেখতে বেরুলাম।

দেখলাম দোকানপাটগুলির মালিকানা কেবলমাত্র যে চীনাদেরই এক-চেটিয়া তা নয়—সিন্ধী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী, শিখ ও পাকিস্তানীদেরও দোকানপাট রয়েছে। অধিকাংশ দোকানেই দোকানদারি করছে মহিলারা। বিশেষ করে চীনা দোকানগুলিতে।

হোটেলে ফিরে সবে একটু বিশ্রাম করছি, এমন সময় হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল সিং। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করতে সিং জানালো সুখবর আছে, আমার বন্ধু মিস্টার ও মিসেস রফিক আজ সন্ধ্যায় আমাদের সকলকে ওদের গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে। সাহাদা ও মুখার্জীদার গুপ্তর সঙ্গে অন্যত্র যাবার কথা থাকাতে ওঁরা নিমন্ত্রণ বাতিল করে দিলেন, আর সমর ও বাসুদেব যেতে নারাজ, সুতরাং আমি একাই যেতে রাজী হলাম। সিং ফোনে রফিককে জানিয়ে দিল আমাদের দুজনের যাবার কথা।

বিলাতী পোশাকের পরিবর্তে পরলাম আমার দেশীয় পোশাক, অর্থাৎ ধুতি ও পাঞ্জাবী, সিংও পরেছে পায়জামা ও পাঞ্জাবী। সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা এসে হাজির হলাম মিস্টার রফিকের দোতলার ফ্ল্যাটে। দরজার কলিংবেল টিপতেই এক ভৃত্য বেরিয়ে এসে আমাদের দুজনকে নিয়ে গেল অন্তঃপুরের বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে মিস্টার ও মিসেস রফিক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, আমরা ঘরে প্রবেশ করতেই ওরা আমাদের বসার জন্য অনুরোধ করল। ওদের পাশে দেখি দুটি আধফোটা গোলাপ অর্থাৎ ওদের পুত্র ও কন্যা। মনে হচ্ছে যেন দুটি মোমের পুতুল। মিস্টার বেশ সুপুরুষ এবং দশাসই চেহারার মানুষ। আর মিসেস যেন অনন্তযৌবনা। বেশ আঁটসাঁট নিটোল দেহ, টানা টানা চোখ, পাতলা ঠোঁট, গাল দুটি থেকে গোলাপী আভা বেরুচ্ছে। আর দেহের রং যাকে বলে ফেটে পড়ছে। কমনীয়তা দেখে বয়স অনুমান করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে যৌবন যেন যাই যাই করেও যেতে পারছে না।

সিং ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি হচ্ছেন মিস্টার রফিক, আমার বন্ধু। ইংলণ্ডে থাকা কালে আমরা একই কামরায় ছিলাম। ইনি মিসেস রফিক। মিস্টার বলে উঠলেন, নাম রাবেয়া। তারপর বাচ্চা দুটিকে দেখিয়ে সিং বলল, মাস্টার এবং মিস রফিক। এরপর সিং আমার পরিচয় দিল—ইনি মিস্টার বোস। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় প্লেনে উঠে, ইনি আমার সহযাত্রী।

আমাদের পরিচয়ের পালা শেষ হলে খাঁটি বাংলা ভাষায় রাবেয়া আমাকে বলল, দাদা, চলুন এবার আমরা পাশের ঘরে গিয়ে চায়ের টেবিলে বসি।

একজন পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলার মুখে এ রকম পরিষ্কার বাংলা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কৌতূহল বশতঃ আমি জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, একজন পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলীম মহিলা হয়ে তুমি এত পরিষ্কার বাংলা কথা শিখলে কি করে? আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে, একটু মুচকি হেসে রাবেয়া অন্য প্রসঙ্গে কথার মোড় ঘোরাল।

চায়ের টেবিলে চা এবং স্ন্যাক্স্-এর সঙ্গে ইংরাজী, উর্দু এবং হিন্দীতে চলতে লাগল আমাদের নানা প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। এক সময় সিং বলল, বোস, এবার ওঠা যাক, আমাদের নৈশভোজের সময় হয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম, সত্যিই তো, এবার আমাদের উঠতে হয়।

রফিক দম্পতি জানতে চাইল—আমাদের আগামীকালের প্রোগ্রাম কী?

সিং উত্তর দিল, আগামীকাল হচ্ছে আমাদের ফ্রী ডে, অর্থাৎ নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করে যে যার ইচ্ছামত যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো।

রাবেয়া জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কাউলুন এবং নিউ টেরিটরি দেখেছ? উত্তরে আমরা জানালাম যে, না।

মিস্টার রফিক বলল, আগামীকাল রবিবার, সুতরাং আমার ছুটি। চল, আগামীকাল আমার গাড়ি করে আমরা তোমাদের দুজনকে কাউলুন এবং নিউ টেরিটরি ঘুরিয়ে আনব। বলে আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় ওদের এখানে আসার অনুরোধ জানিয়ে ওরা আমাদের বিদায় জানাল।

রাবেয়া আমাদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে চুপিচুপি আমার কানে কানে বলল, দাদা, তোমার কৌতূহল দূর করার জন্য জানাচ্ছি যে, আমি খাঁটি বাঙালীর মেয়ে, জাতে ব্রাহ্মণ!

আমার কৌতূহল দূর হওয়া দূরে থাকুক, উল্টে কৌতূহল আরও বেড়েই গেল। তবু সেই কৌতূহল দমন করেই হোটেলে ফিরে আসতে হল।

পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি এবং প্রাতরাশ সেরে সিং ও আমি বেরুলাম রফিকদের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। সকাল ন'টায় আমরা দুজনে পৌঁছলাম রফিকদের ফ্ল্যাটে। রফিক এবং রাবেয়া গাড়িতে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তাই আমরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই রফিক গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি চালাচ্ছে রফিক নিজে, তার পাশে বসেছে সিং। আর রাবেয়া ও আমি বসেছি গাড়ির পিছনের সীটে। অনন্তযৌবনা রাবেয়া প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজ সেজেছে হরিৎবর্ণের সাজে। রাবেয়া কচি খুকির মত মুখরা হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পরই আমরা এসে পড়লাম হংকং দ্বীপ এবং কাউলুন উপদ্বীপের সংযোগ রক্ষাকারী সুড়ঙ্গ ক্রস্ হারবার টানেলে। রফিক পাঁচ হংকং ডলার পথ মাশুল দিতে আমাদের গাড়িকে এই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। পায়ে হেঁটে গেলে অবশ্য কোন মাশুল লাগে না। মিনিট ৫।৬-এর মধ্যে সুড়ঙ্গ-পথ অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছলাম কাউলুন উপদ্বীপে।

কাউলুন (Kowloon) :—রফিক আমাদের বোঝাতে লাগল—নয়টি পাহাড়ের সমষ্টি নিয়ে গঠিত এই কাউলুন শহর। কাউ (Kow)-এর অর্থ নাইন বা নয়, আর লুন (Loon)-এর অর্থ হচ্ছে ড্র্যাগন অর্থাৎ নয়টি ড্র্যাগন। এখানকার চীনা অধিবাসীদের বিশ্বাস প্রত্যেকটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি করে ড্র্যাগন

আছে। কিংবদন্তি হচ্ছে যে নয়জন মৃত সম্রাট ড্র্যাগনের রূপ পরিগ্রহণ করে এই নয়টি পাহাড়ের চূড়ায় অধিষ্ঠান করছেন। এর আয়তন হচ্ছে পাঁচ বর্গ মাইল। এর বিস্তৃতি দক্ষিণে কাউলুন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত বন্দর থেকে উত্তরে নিউ কাউলুনের সীমারেখা বাউণ্ডারী স্ট্রীট পর্যন্ত। দূরত্ব দু' মাইল। এই কাউলুন উপদ্বীপ হচ্ছে একটি অভিজাত পল্লী।

আমরা প্রথমে এলাম কাউলুন পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত প্রাকৃতিক বন্দর দেখতে। নীল সাগরের বক্ষ ভেদ করে উঠেছে এই পর্বতমালা। বন্দরে নোঙর করা আছে দেশ-বিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ। বিভিন্ন দেশের জাহাজের মাস্তুলে উড়ছে বিভিন্ন রঙের পতাকা। জাহাজগুলির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে গাংচিলের দল। ক্রাঙ্কে করে জাহাজে মাল ওঠানো, নামানোর কাজ চলছে। আর রং-বেরঙের স্যাম্প্যানগুলি সমুদ্রবক্ষের এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

রফিক জানালো, এই কাউলুন হচ্ছে সমগ্র হংকং দ্বীপ এবং উপদ্বীপগুলির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে রয়েছে বড় বড় অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, কোর্ট-কাছারি, দোকানপাট, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, লাইব্রেরি, অভিজাত হোটেল, টুরিস্ট-লজ, বার, রেস্তোরাঁ এবং অভিজাত ব্যক্তিদের গগনচুম্বী অট্টালিকা। এখানে কতকগুলি বইয়ের ব্যাঙ্কও নজরে পড়ল।

এখন আমরা চলেছি কাউলুন-ক্যাণ্টন রেলওয়ে স্টেশন দেখতে। রাবেয়া জানালো—আজ ছুটির দিন বলে রাস্তায় লোকজনের ভিড় কম।

আজ দু'দিন ধরে পথে-ঘাটে যত পুলিশ দেখছি তারা কেউই এদেশীয় নয়। তাই রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, এই হংকং-এ বা কাউলুনে, একটিও দেশীয় পুলিস দেখছি না কেন?

উত্তরে রাবেয়া জানালো—যদিও এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ৯০ ভাগ হচ্ছে চীনা বংশোদ্ভুত, তবুও পুলিশ বাহিনী কিম্বা সৈন্যবিভাগে একটিও স্থানীয় লোক নিয়োগ করা হয়নি, কারণ ব্রিটিশরা চীনাদের মোটেই বিশ্বাস করে না। সেনাবিভাগে বা পুলিস বাহিনীতে কোন চীনাকে নিয়োগ করে ওঁরা কোন রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ, তাই এখানকার পুলিস বাহিনী এবং সেনাবিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে হিন্দুস্থানী এবং পাকিস্তানীদের। এর কারণ হচ্ছে সেই ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতি—অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি কর এবং দেশ শাসন কর।

কাউলুন-ক্যাণ্টন রেলওয়ে স্টেশন (Kowloon-Canton Rly. Stn.) :—স্টেশন ভবনটি দোতলা এবং বেশ বড়। এর ছাদে রয়েছে চারকোণা

একটি টাওয়ার। টাওয়ারের চূড়ার চারধারে রয়েছে চারটি ঘড়ি। আমরা স্টেশনের ভেতরে ঢুকলাম। স্টেশনটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ছিমছাম করে সাজানো-গোছানো। স্টেশন ভবনের ভেতরে রয়েছে রেস্তোরাঁ, বার এবং লোভনীয় পণ্যসামগ্রীর সুসজ্জিত ও শুল্কমুক্ত বিপণি।

আমরা ঢুকলাম প্ল্যাটফর্মের ভেতরে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাত্রী ভর্তি একটি ট্রেন। ট্রেনের বগিগুলির রং নীল। তার গায়ে লেখা রয়েছে কাউলুন-ক্যাণ্টন-রেলওয়ে। রফিক জানালো যে, যদিও এর গায়ে কাউলুন-ক্যাণ্টন লেখা রয়েছে, কিন্তু এটি যাতায়াত করে কাউলুন স্টেশন থেকে বাইশ মাইল পথ নিউ টেরিটরির শেষ সীমানা লোউ (Lowu) স্টেশন পর্যন্ত। লোউ স্টেশনে ব্রিটিশ সিকিউরিটি পুলিসকে পাস্‌পোর্ট এবং চীনের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের ভিসা দেখিয়ে তাদের বিশেষ অনুমতি নিয়ে পায়ে হেঁটে পার হতে হবে শামচুন (Shumchun) নদীর পুল। এই পুলটি হচ্ছে 'নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড'। পুলের অপর পারে চীন সীমানায় প্রবেশ করে সেখানকার সিকিউরিটি পুলিসকে যথারীতি কাগজপত্র দেখিয়ে পর্যটকদের উঠতে হবে অপেক্ষমান ক্যাণ্টনগামী ট্রেনে। ইউরোপ ভ্রমণের জন্য ট্র্যান্স-সাইবেরিয়ান রেল অপেক্ষা করে ওখানে। হংকং পর্যটনকারীদের যেতে দেওয়া হয় লোউ স্টেশনের আগের স্টেশন শেউঙ্গ শুই (Sheung Shui) স্টেশন পর্যন্ত।

লাই চি কক্ অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক (Lai Chi Kok Amusement Park) :—রফিক জানালো, সমগ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপগুলির মধ্যে এটি হচ্ছে একটি বৃহৎ ও প্রধান প্রমোদ উদ্যান। সমস্ত রকম আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে এই উদ্যানে।

রাবেয়া বললে—আজ রবিবার ছুটির দিন, তাই সন্ধ্যায় এই উদ্যানটিকে আলোক মালায় সজ্জিত করা হবে। তখন এখানে তিল ধারণের স্থান থাকবে না। এখানকার স্থানীয় লোকেরা কীভাবে আনন্দ উপভোগ করে তা দেখার ও জানার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে এই উদ্যানটি।

নিউ কাউলুন (New Kowloon) :—নিউ টেরিটরির দক্ষিণাংশের বারো মাইল জমি কেটে নিয়ে গঠিত হয়েছে নিউ কাউলুন উপনগরী। এটি হচ্ছে শ্রমজীবীদের পল্লী। রফিক জানালো যে, আমরা চলেছি দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূল ধরে। মাইল আষ্টেক পথ আসার পর আমরা একটি ছোট নগরীতে প্রবেশ করলাম।

ৎসুয়েন্ ওয়ান্ (Tsuen Wan) :—রফিক বলতে শুরু করল এই নগরীর ইতিহাস—পূর্বে এখানে বসবাস করত নিম্ন শ্রেণীর গরীব লোকেরা। এখানে ছিল বস্তি, কুঁড়েঘর ইত্যাদি। বর্তমানে সরকার এটিকে শ্রমশিল্প নগরীতে পরিণত করেছেন। এখানে ৪০০ একর বা ১৪০০ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট কলকারখানা। বিভিন্ন রকম কলকারখানার মধ্যে এখানকার কাপড়ের কারখানায় উৎপন্ন ৫০ শতাংশ কাপড় বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কতকগুলি সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত গগনচুম্বী ফ্ল্যাট বাড়ি দেখিয়ে রফিক বলল, এই ফ্ল্যাটগুলিতে থাকেন কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, আর ওদিককার সাধারণ ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে থাকে সাধারণ কর্মচারীরা। আর অনতিদূরে ঐ যে বৃহৎ বৃহৎ ফ্ল্যাট বাড়িগুলি দেখছেন, ওগুলিতে থাকে শ্রমিক, বস্তীবাসী এবং চীন থেকে আগত উদ্বাস্তুরা। এগুলি সবই নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর। সাধারণ কর্মচারী, শ্রমিক এবং উদ্বাস্তুরা এই সব ফ্ল্যাট বাড়িতে অতি অল্প ভাড়ায় সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। প্রায় দু' লক্ষ লোক বাস করে এই কলোনিতে।

লাই চেঙ্ উক্ টুম্ব্ (Li Cheng Uk Tomb) : আমরা এগিয়ে গেলাম পুনর্বাসন কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রের মধ্যস্থলে কারুকার্যমণ্ডিত সুন্দর একটা উঁচু ঢিপি দেখিয়ে রফিক জানালো যে এটি হচ্ছে লাই চেঙ্ উক্ নামে এক মহাপুরুষের সমাধিস্তম্ভ। তাঁর কবরের ওপর এই স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর ২০০ বছর পরে। এটি কিন্তু মাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে পুনর্বাসনের গৃহ নির্মাণের জন্য যখন এই ভূমিকে সমতল করা হচ্ছিল, তখন এটা পুনরাবিষ্কৃত হয়। সমাধিস্তম্ভের কারুকার্যগুলি প্রাচীন চীনা ভাস্কর্যের নিদর্শন। এরপর মাথাপিছু ৩০ হংকং সেণ্ট দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম সমাধিস্তম্ভ সংলগ্ন যাদুঘরে, সেখানে রয়েছে চীনের ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের বিরাট এক প্রদর্শনী।

আমরা এবার এসেছি সরকার পরিচালিত একটি পোলট্রি-ফার্ম দেখতে। বিরাট এলাকা জুড়ে এই ফার্মটিতে রয়েছে দেশী, বিদেশী নানা জাতের হাঁস-মুরগি। এখানে এই রকম আরও কয়েকটি পোলট্রি-ফার্ম আছে। এই ফার্ম কয়টিতে যে ডিম এবং মাংস পাওয়া যায় তাতে সারা দেশের চাহিদা মিটিয়েও কিছু মাল নিকটস্থ দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়।

নিউ টেরিটরি (New Territory) : নিউ কাউলুন অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করলাম নিউ টেরিটরিতে। পূর্বে এই নিউ টেরিটরির আয়তন

ছিল ৩৬৫ বর্গ মাইল কিন্তু এর দক্ষিণাংশের ১২ বর্গ মাইল জমি কেটে নিয়ে নিউ কাউলুন উপনগরী গড়াতে বর্তমানে এর আয়তন দাঁড়িয়েছে ৩৫৩ বর্গ মাইল। এটি হচ্ছে প্রধানত চাষী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের পল্লী। এছাড়া অনেক উদ্বাস্তুদেরও বাস আছে এখানে।

একটি অত্যুচ্চ পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় রাবেয়া বলল, সমগ্র হংকং দ্বীপ এবং উপদ্বীপগুলির মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ পাহাড়। এর নাম তাইমোশ্যান পর্বত (Taimoshan Mountain)। এটি উচ্চতায় ৩১৪৪ ফিট্। আমাদের গাড়ি প্রবেশ করল সরকার পরিচালিত একটি শূকর প্রতিপালন ক্ষেত্রে।

এখানকার অবধায়ক (Caretaker) আমাদের শূকর প্রতিপালন ক্ষেত্রটি দেখাতে নিয়ে গেলেন। এই এলাকাটিও আয়তনে বেশ বড়। প্রত্যেক শূকরেরই আলাদা আলাদা নাম আছে এবং তা করা হয়েছে বিখ্যাত চিত্রতারকা কিম্বা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নাম অনুসারে। অবধায়ক এক একটি শূকরের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, আর ওরাও সুবোধ বালকের মত একে একে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। আহা, জীবগুলির কি নধরকান্তি এবং সুকোমল দেহ। শূকরীরা কেউ কেউ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে, আবার কেউ কেউ রোদে শুয়ে শুয়ে বাচ্চাদের স্তন্যপান করাচ্ছে।

আবার আমরা চলতে শুরু করলাম। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রাচীর বেষ্টিত ছোট একটি গ্রামের ফটকের সামনে। রফিক জানালো যে এই গ্রামে প্রবেশ এবং নির্গমনের এটিই একমাত্র ফটক। ফটকটি রট্ আয়রন্ (Wrought Iron) অর্থাৎ যে লোহায় মরিচা ধরে না সেই লোহা দিয়ে তৈরি। চৈনিক কারুকার্য করা এই ফটকটি যে কোন যাদুঘরের শোভা বর্ধন করতে পারে। শুভ্র কেশ, লোলচর্ম, কুঞ্চিত গাল, কোটরগত চক্ষু অশীতিবর্ষীয় এক বৃদ্ধ হচ্ছেন এই দ্বারের রক্ষী। তাঁর হাতে আমাদের চারজনের জন্য এক হংকং ডলার দিতে তিনি আমাদের ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। রফিক জানালো গ্রাম উন্নয়নের কাজের জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

ক্যাম্ তিন্ ওয়াল্‌ড্ ভিলেজ (Kam Tin Walled Village): রফিক এই গ্রামের বর্ণনা দিতে শুরু করল—এটি একটি অতি পুরাতন গ্রাম। নাম ক্যাম্ তিন (Kam Tin)। ব্রিটিশ সরকার নিউ টেরিটরি ইজারা নেবার বহু পূর্বে প্রায় ১৬০০ শতকে খাস চীন থেকে একদল ট্যাঙ্গ উপজাতি (Tang Clan) এখানে এসে বসবাস শুরু করে। সমস্ত গ্রামটি খাস চীনের মত প্রাচীর

দ্বারা বেষ্টিত তাই একে বলা হয় ক্যাম্ তিন ওয়াল্ড্ ভিলেজ। প্রাচীর ছাড়াও গ্রামটি দুর্গের ন্যায় পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ট্যাঙ্গ উপজাতিদের পরে অন্যান্য চীনা উপজাতিরাও এসে বাসা বাঁধল এই নিউ টেরিটরির নানা স্থানে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাক্কা (Hakka) সম্প্রদায়, যাদের পেশা হচ্ছে চাষ আবাদ করা। উপজাতিরা সকলেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করে।

আমরা গাড়িতে করে গ্রাম পরিভ্রমণ করতে লাগলাম। অত্যন্ত নোংরা গ্রাম। সাবেকী ধরণের ছোট ছোট সব চালাবাড়ি। তার কোন কোনটা আবার ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। গ্রামে প্রবেশ করার সময় গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে এরা যে মাশুল সংগ্রহ করে তা দিয়ে এরা গ্রামের কোন উন্নতি সাধন করে না। গ্রামের ভেতরে রয়েছে এদের নিজস্ব বাজার-হাট, দোকান-পাট ইত্যাদি। শহরের দোকানগুলির চেয়েও এখানে অনেক সস্তা দামে জিনিস পাওয়া যায়। শতায়ু ২।৪ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারও সাক্ষাৎ পেলাম। তাদের পরণে সাবেকী ধরণের কালো রঙের ঢল্‌ঢলে পায়জামা এবং হাঁটু অবধি ঝুল কালো কামিজ। সেগুলির অতি জীর্ণ দশা। বৃদ্ধদের মাথায় রয়েছে খড়ের তৈরি বড় বড় টুপি আর বৃদ্ধাদের খালি মাথা। বৃদ্ধাদের পায়ের পাতা ক্ষুদে ক্ষুদে। যুবক-যুবতীদের পরণে অবিশ্যি আধুনিক সাজ-পোশাক রয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি এত জীর্ণ এবং মলিন যে তা থেকে দৈন্যের ছাপ ফুটে বেরুচ্ছে।

রফিক গাড়ি দাঁড় করালো এক গৃহস্থ পরিবারের অঙ্গনের কাছে। সেখানে দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে একমনে চাটাই বুনছেন লোলচর্ম, কুঞ্চিত মুখ, শুভ্র-কেশিন এক বৃদ্ধা। দাওয়ার এক পাশে একটা টুলের ওপরে বসে এক বৃদ্ধ মুদ্রিত নয়নে বিভোর হয়ে চণ্ডু না চরস কি যেন একটা সেবন করছেন। ইনি হচ্ছেন ঐ বৃদ্ধার পতি দেবতা। আর অনতিদূরে একপাল কাচ্চাবাচ্চা দিগম্বর দিগম্বরী হয়ে মনের আনন্দে খেলা করছে। এরা হচ্ছে ওদের নাতি-নাতনীর দল। এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। কিন্তু আমাদের প্রতি ওদের কারুরই কোন রকম ভ্রুক্ষেপ নেই। বিপর্যয় ঘটল যেই ক্যামেরা বের করেছি। দাওয়া ছেড়ে সকলেই ছুটে পালালো অন্তঃপুরের দিকে। বৃদ্ধার ছোট পায়ের পাতার জন্য তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। আমরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ব্যাপার কি ?

সুবেশধারী মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জানালেন যে, এরা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

এদের বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে এই যে, ক্যামেরায় ছবি তুললে না কি আত্মার কিয়দংশ অপহরণ করা হয়। এতে আয়ুক্ষয় হয়। তাই এরা ছবি তোলাতে ভয় পায়। তবে এই ক্ষতি স্বীকার করতে এরা রাজী আছে, যদি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এদের কিছু অর্থ দেওয়া হয়। আমি কিছু দক্ষিণা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে ভদ্রলোক সে-কথা গৃহকর্তাকে জানিয়ে দিলেন। তখন গৃহকর্তা একটি শর্তে রাজী হলেন যে আমি কেবলমাত্র ওদের কর্তা ও গিন্নী ছাড়া আর কারও ছবি নিতে পারব না। তথাস্তু।

নিউ টেরিটরির পশ্চিমাংশের সমুদ্রোপকূল ধরে উঁচু-নিচু সর্পিল পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি উত্তরদিকে। সূর্যমামা ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছেন। কিন্তু পবনচাচার আনুকূল্যে তিনি আমাদের ওপর তাঁর প্রভাব বিশেষ বিস্তার করতে পারছেন না। সমুদ্র আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কোথাও বা টুকি বলে উঁকি মারছে আবার কোথাও বা পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে।

তাই ইউয়েন ফিশারি গার্ডেন (Tai-Yuen Fishery Garden) : একটা বিরাট জলাধারের কাছে এসে রফিক গাড়ি থামালো, আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। রফিক জানালো যে এটি একটি কৃত্রিম হ্রদ। এটি নির্মিত হয়েছে সরকারী খরচে। সরকারের পরিচালনায় এখানে মাছের চাষ করা হয়। হ্রদের চারধারে সুন্দর ফুলের বাগান। কি স্বচ্ছ এই হ্রদের জল। সেখানে যে রুই, কাৎলার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ রবিবার ছুটির দিন, তাই অনেক নারী-পুরুষই ছিপ ফেলে মৎস্য শিকারে বসে গেছেন। এক মহিলার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি খেঁকিয়ে বলে উঠলেন—যান না অফিস ঘরে, সেখানে ৪ হংকং ডলার জমা দিলে একটা ছিপ ভাড়া পাবেন এবং এক ঘণ্টার জন্য মাছ ধরার অনুমতিও পাবেন।

রফিক তাড়া দিল—আর সময় নষ্ট করা চলবে না। আমরা প্রস্থান করলাম।

লোক মা চাউ (Lok Ma Chau) :—আমাদের গাড়ি একটা পাহাড়ের বিরাট উপত্যকার ওপর উঠে এলো এবং থামল গিয়ে একটা পুলিস ফাঁড়ির কাছে। রফিক জানালো যে এই স্থানটি হচ্ছে ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনির প্রায় শেষপ্রান্ত। গাড়ি থেকে নেমে রফিক থানার ভেতরে ঢুকল বড়কর্তার সন্ধানে।

কিছুক্ষণ পরে থানার লালমুখো বড়কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে রফিক বেরিয়ে এলো। বড়কর্তা আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে 'হাউ ডু ইউ ডু' বলে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন এবং আমাদের সঙ্গে নিয়ে উঠলেন থানার চিলেকোঠায়। সেখানে

একটি টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের একটি নদী দেখিয়ে তিনি জানালেন যে, ঐ নদীটি হচ্ছে চীনের মূল ভূখণ্ড এবং ব্রিটিশ উপনিবেশের সীমারেখা। নদীটির নাম শামচুন (Shumchun)। এপারে ব্রিটিশ উপনিবেশের সীমানা, আর নদীর ওপারে কমিউনিস্ট চীনের মূল ভূখণ্ড। তারপর নদীর ওপরে একটি সেতু দেখিয়ে তিনি বললেন, ঐ সেতুটি ছুটি রাষ্ট্রের সংযোগ রক্ষাকারী সেতু। ঐ সেতুটি হচ্ছে 'নো ম্যান্স্ ল্যাণ্ড' অর্থাৎ ব্রিটিশ বা কমিউনিস্ট চীন কারও অধিকারভুক্ত নয়। টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি লোক চলাচলের দৃশ্য। ওদের মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যাই বেশি বলে মনে হচ্ছে। ওপারে দেখতে পাচ্ছি কমিউনিস্ট চীনের সীমান্ত শহর, সেখানকার পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, যানবাহন এবং লোকজন চলাচলের দৃশ্য।

ধানক্ষেত ঃ এবার আমরা এদের ধানক্ষেত দেখতে এসেছি। রফিক জানালো এই ব্রিটিশ উপনিবেশের যা কিছু ধান উৎপন্ন হয়, তার সবই হয় এই নিউ টেরিটরিতে। ধান কাটার সময় হয়ে এসেছে, তাই ধানগাছগুলি সোনার বর্ণ ধারণ করেছে। ধানগাছের মাথাগুলি ফলভারে নুয়ে পড়েছে। সেগুলি বাতাসে দুলছে। যে সব মহিলারা ক্ষেতে কাজ করছে, তাদের দেখিয়ে রফিক বলল, এরাই হচ্ছে হাক্কা (Hakka) রমণী, এদেরই আমরা দেখে এসেছি ক্যাম্ তিন গ্রামে। অন্যান্য চীনা রমণীদের অপেক্ষা এরা বেশ লম্বা এবং স্বাস্থ্যবতী। এদের পায়ে রয়েছে গামবুট। পরনে কালো রঙের ঢলঢলে পায়জামা। পায়জামার নীচের অংশ উরু পর্যন্ত গুটানো। গায়ে কালো রঙের ঢিলে পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীরও হাত গুটানো। আর মাথায় রয়েছে কালো কাপড়ে ঢাকা, খড়ের তৈরি পরাতের মত চ্যাপ্টা ও গোল বড় টুপি। টুপির ওপরের দিকটা মোচাকৃতি। দু-চারজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকেও চাষের কাজ করতে দেখতে পেলাম। তারাও বেশ কর্মঠ এবং বলিষ্ঠ।

এরা এখনও সেই সাবেক পদ্ধতিতে অর্থাৎ জমি চষার কাজে সেই সাবেকী কাঠের লাঙ্গলই ব্যবহার করে। জমি চষা এবং বীজ বপনের কাজ করে এদের পুরুষরা। আর নারী পুরুষ উভয়েই চারা রোপণ এবং ধান কাটার কাজ করে। বীজ বপনের কাজ কিন্তু এরা আধুনিক পদ্ধতিতেই করে। বীজ বপনের জন্য এদের আলাদা নার্সারি আছে। বাজ বপনের ৪০ দিন পরে নার্সারি থেকে অঙ্কুরগুলি তুলে এনে সেগুলিকে রোপণ করা হয় লাঙ্গল-চষা জমিতে। আর ফসল কাটা শুরু হয় চারা রোপণের ৬০।৭০ দিন পর থেকে। এখানে বছরে দু'বার ফসল হয়। আর আবাদী জমির ৫০ ভাগ ব্যবহৃত হয় ধান চাষের কাজে।

সিং প্রশ্ন করল, আচ্ছা, শুনেছি যে এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই অন্নভোজী। এই উৎপাদনে কি এদের সারা বছরের চাহিদা মেটে?

উত্তরে রফিক জানালো, না, তা মেটে না। এতে মাত্র ৫০ শতাংশ লোকের চাহিদা মেটে। ঘাটতি পূরণ করতে হয় কমিউনিস্ট চীন কিংবা থাইল্যাণ্ড থেকে চাল আমদানি করে।

এবার আমাদের নীচে নামার পালা। আমরা নামছি নিউ টেরিটরির পূর্বাঞ্চল দিয়ে। শুরু হয়েছে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের লুকোচুরি খেলা। সূর্যমামা রুষ্ট হয়েছেন। পথের দু'পাশের বড় বড় গাছগুলি তাদের ছায়া ফেলে আমাদের সূর্যমামার রোষ থেকে রক্ষা করছে। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল তাই পো (Tai Po) বাজারের কাছে একটি সমুদ্র বন্দরের ধারে। সেখানে দেখি তীরে বাঁধা রয়েছে রঙ-বেরঙের নৌকা। রফিক জানালো যে, প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এখানে নৌ-চালনা প্রতিযোগিতা হয়। এই বলে রফিক শুরু করল নৌ প্রতিযোগিতার ইতিকথা বলতে।

ড্র্যাগন বোট রেস্ (Dragon Boat Race) :—এটি এদের একটি বাৎসরিক বড় উৎসব। এই দিনটিকে সারা হংকং-এ ছুটির দিন বলে গণ্য করা হয়। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল নৌ-চালনা প্রতিযোগিতা। নৌকাগুলিকে ড্র্যাগনের মত বা সাপের মত করে সজ্জিত করা হয়। এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিজেতাগণকে পুরস্কার প্রদান করে উৎসাহিত করা হয় তিনটি বন্দরে, যথা :— তাই পো (Tai Po), ইয়াউমাতি (Yaumati) এবং অ্যাবার্ডিন (Abardeen)। এই উৎসব পালিত হয় চীনা রীতি অনুযায়ী পঞ্চম চান্দ্র মাসের পঞ্চম দিনে। এই দিনটি ইংরাজী মে মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পড়ে। চীনাদের বছর গণনা করা হয় চান্দ্র মাস ধরে। ওদের নববর্ষ শুরু হয় প্রথম চান্দ্র মাসের প্রথম দিন থেকে। সাধারণত এই দিনটি পড়ে ইংরাজী মাসের ২১শে জানুয়ারি থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে।

আমরা আবার চলা শুরু করেছি। আমাদের গাড়ি যাচ্ছে পূর্বদিক থেকে দক্ষিণ দিকে। পথে যেতে যেতে বিরাট অঙ্গনে ঘেরা চুং চি কলেজ (Chung Chi College) দেখলাম। গাড়ি না থামিয়েই রফিক জানালো যে, ওটি হচ্ছে ইউনিভার্সিটির একটি অংশ। ওখানে চীনাভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। একটা পোতাশ্রয়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে রফিক জানালো যে এটার নাম হচ্ছে টোলো হারবার (Tolo Harbour)। বন্দরে নোঙর করা রয়েছে বিভিন্ন রঙের

পতাকা তোলা বিভিন্ন দেশের কতকগুলি বাণিজ্যপোত। টোলো হারবারকে পিছনে ফেলে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর অপর পারে দেখতে পেলাম সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে ওঠা একটা পাহাড়। রফিক জানালো যে চীনাভাষায় ঐ পাহাড়টাকে বলে মা অন শ্যান্ (Ma on Shan) অর্থাৎ লোহার পাহাড়। ঐ পাহাড়ের গর্ভে আছে বিরাট এক লৌহখনি। এরপর আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি জলাধারের কাছে। জলাধারটির তিনদিক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত।

জুবিলী রিজার্ভয়ার্ (Jubile Reservoir) :—জলাধারের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব জানালেন এই বিশাল জলাধারটি আসলে একটি ক্ষুদ্র উপসাগরের অংশ বিশেষ, যাকে ইংরেজীতে কোভ (Cove) বলে। উপসাগরের তিনটি দিক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, আর খোলা দিকটা অর্থাৎ যেখান দিয়ে এর মধ্যে সমুদ্রের নোনা জল প্রবেশ করে, সেই প্রবেশ পথটাকে কন্‌ক্রাটের উঁচু বাঁধ দিয়ে বেঁধে পাম্পের সাহায্যে নোনা জল বের করে দিয়ে এটিকে মিঠে জলাধারে পরিণত করা হয়েছে। এর মধ্যে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। তাছাড়া আশেপাশের পাহাড়গুলির গায়ে ছোট ছোট নালা কাটা রয়েছে, ঐ নালাগুলি দিয়ে পাহাড়ের ওপরকার বৃষ্টির জল ঝর্ণার মত নেমে এসে জমা হয় এই জলাধারে। সেই জল পরিশ্রুত করে পাইপের মাধ্যমে পাঠানো হয় শহরে এবং গ্রামে।

জলাধারটি দেখি আগাছায় ভর্তি এবং সেখানে ছোট বড় নানা জাতীয় মাছের দল ঝাঁক বেঁধে খেলে বেড়াচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব জানালেন যে, এই আগাছাগুলি হচ্ছে মাছেদের খাদ্য এবং এগুলি জলকেও স্বচ্ছ রাখে। আর এই মাছগুলি জলের কীট নাশ করে জলকে জীবাণুমুক্ত রাখে।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা শাতিন উপত্যকা (Shatin Valley) তে এলাম। রাবেয়া বলল, চল, আমরা দশহাজারী বুদ্ধের মন্যাস্ট্রিটা আগে দেখে আসি। রফিক আমাদের গাড়ি এনে দাঁড় করাল একটি পাহাড়ের পাদদেশে গগনচুম্বী এক প্যাগোডার সামনে। একজন চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আমাদের দশহাজারী বুদ্ধ মন্যাস্ট্রি দেখাবার দায়িত্ব নিলেন।

শাতিন প্যাগোডা (Shatin Pagoda) :—তিনি আমাদের প্রথমে প্যাগোডাটি দেখিয়ে তার ইতিকথা বলতে শুরু করলেন—এই যে বহুতল বিশিষ্ট গগনচুম্বী প্যাগোডাটি দেখছেন এটির নাম হচ্ছে শাতিন প্যাগোডা। এর রং পাটল বর্ণ বলে একে অনেকে পিঙ্ক প্যাগোডাও বলে। এটি নির্মিত হয় ১৯৫০

সালে য়ুয়েৎ কাই (Yuet Kai) নামে এক চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অনুপ্রেরণায়, তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে। তিনি ১৯৬৫ সালে ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। এই সূক্ষ্মাগ্র চূড়াবিশিষ্ট প্যাগোডার কার্নিসগুলি ভাস্কর্যমণ্ডিত।

পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। সেই আঁকাবাঁকা সিঁড়ি দিয়ে আমরা পাহাড়ের ওপরে উঠছি তো উঠছিই। তবু সিঁড়ির আর শেষ নেই। এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যমামার উত্তাপও বেড়েছে, সেই সঙ্গে পাহাড়ও তেতে উঠেছে। গলদঘর্ম হয়ে রাবেয়া ও আমি মাঝে মাঝে বসে পড়ছি কোন ঝোপঝাড়ের ছায়াতে। ওপর থেকে সিং এবং রফিক আমাদের উৎসাহিত করছে—কষ্ট করে আর একটু উঠে এসো, এই বাঁকটা পেরোলেই আমরা পেঁাছে যাব মন্দির প্রাঙ্গণে। যাক্, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত এসে পেঁাছলাম মন্দির প্রাঙ্গণে।

দশহাজারী বুদ্ধ মনাস্ট্রি (10000 Buddha Monastery) :— সন্ন্যাসী তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন—এটি একটি মঠ। এর মধ্যে সন্ন্যাসীদের আবাস কক্ষ, উপাসনা কক্ষ এবং একটি মন্দির আছে। তিনি প্রথমে আমাদের মূল মন্দিরের চত্বর ঘুরিয়ে দেখালেন। সেখানে মানুষ সমান উঁচু কতকগুলি ভীতি সঞ্চারক মূর্তি দেখিয়ে সন্ন্যাসী বললেন যে, উপাসনার সময় এরা নানা রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে। সেই ভীতিকে জয় করতে পারলেই উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।

মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দু'পাশের থামের ওপরে এবং থাম দুটির ওপরের খিলানের ওপরে ক্ষোদিত রয়েছে তিনটি করে যুক্ত চক্র। চক্রগুলির মধ্যস্থলে রয়েছে আধফোটা পদ্মের কুঁড়ি। সেই চক্রগুলি দেখিয়ে সন্ন্যাসী বললেন—এগুলি হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের প্রতীক, যার অর্থ হচ্ছে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি এবং সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমে যজ্ঞশালা দেখতে গেলাম। ঘরের মাঝখানে যজ্ঞবেদী। সেটি যজ্ঞভস্মে পূর্ণ। ভস্মস্তূপের মধ্যে তখনও ধিক্ ধিক্ করে আগুন জ্বলছে। সন্ন্যাসী বললেন, এ আগুন কখনও নেভে না। বেদীর মাথার ওপরে ঝুলছে লাল ব্রোকেডের সামিয়ানা। আর চারপাশে জ্বলছে বড় বড় চীনা ধূপছড়ি। এই ধূপের সৌরভে সারা ঘর সুরভিত। আমরা চারজনেও বেদীর চারপাশে চারটে ধূপছড়ি জ্বেলে দিলাম। সন্ন্যাসী আমাদের কপালে পরিয়ে দিলেন যজ্ঞভস্মের তিলক।

এরপর আমরা মূল মন্দির কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখি হলুদ, সোনালী, বেগুনী, লাল আর কমলা রঙের ছড়াছড়ি। কক্ষের চারপাশের দেওয়ালে রয়েছে অসংখ্য তাক। তাকগুলিতে থরে থরে বসানো রয়েছে সোনালী গিল্‌টি করা অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি। সন্ন্যাসী বললেন, এই মূর্তিগুলির সংখ্যা দশহাজার। তাই এই মন্দিরের নাম হয়েছে দশহাজারী বুদ্ধমন্দির। ঘরের মধ্যস্থল অলঙ্কৃত করে বসে আছেন্ সোনালী গিল্‌টি করা যোগমুদ্রায় উপবিষ্ট বিরাট এক বুদ্ধমূর্তি। তাঁর একটি হাত ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে। মূর্তির মাথার ওপরে টাঙানো রয়েছে সোনালী ব্রোকেডের সামিয়ানা। ঘরের ভিতর দিকের ছাদে ঝুলছে রঙীন কাগজের তৈরি বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন। যে বেদীটির ওপর মূর্তিটি বসানো রয়েছে তার চারকোণায় রয়েছে ফুলভর্তি চারটি ফুলদানি। বেদীর চারধারে ধূপদানিতে জ্বলছে সুগন্ধি চীনা ধূপছড়ি। বৃহৎ মূর্তিটির পায়ের কাছে রয়েছে চীনামাটির তৈরি ছোট একটি বুদ্ধমূর্তি। সন্ন্যাসী বললেন, এই বৃহৎ মূর্তিটির নিত্য পূজা হয়, আর বাকি মূর্তিগুলির পূজা হয় কেবলমাত্র বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। বেদীর সামনে একটা টেবিলের ওপরে রয়েছে প্রসাদী ফুল, ফল এবং কিছু বিস্কুট। আমরা কিছু দক্ষিণা দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলাম।

তারপর আমরা গেলাম মূল মন্দিরের দু'পাশে অবস্থিত দুটি উপাসনা কক্ষ দেখতে। দুটি কক্ষই ধূপ-ধুনার গন্ধে ভরপুর। ওখানে বসে উপাসনা করার জন্য ঘরের মেঝেতে সারি সারি ল্যাভেণ্ডার রঙের গদির আসন পাতা রয়েছে। দুটি ঘরেরই ভিতর দিকের ছাদে এবং দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে কমলা এবং লাল কাপড়ের তৈরি পতাকা। তাতে চীনাভাষায় বুদ্ধের বাণী লেখা রয়েছে।

এরপর বেশ কিছু ধাপ ভেঙে আমরা উঠে এলাম পাহাড়ের চূড়ায়। এখান থেকে পক্ষীর দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি নীচের শাতিন উপত্যকা। দেখতে পাচ্ছি সেখানকার চাষবাসের জমি, বাড়িঘর, দোকানপাট, যানবাহন এবং লোকজনের চলাচলের দৃশ্য। অদূরে দেখতে পাচ্ছি হংকং, কাউলুন এবং অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ ও উপদ্বীপ। সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জাহাজ এবং নৌকাগুলিও দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে কোন নিপুণ শিল্পীর পটে আঁকা এক অপূর্ব ছবি দেখছি।

ম্যান ফ্যাট টেম্পল (Man Fat Temple) : এটি দেখতে অবিকল নীচের বুদ্ধমন্দিরটির মত। এখানেও দেখলাম সেই হলুদ, সোনালী, বেগুনী, লাল এবং কমলা রঙের অপূর্ব সমাবেশ। ঘরের ভেতর দিকের ছাদে ঝুলছে সেই রঙীন কাগজের তৈরি বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে বুদ্ধের

বাণী সম্বলিত কমলা এবং লাল কাপড়ের তৈরি পতাকা। ঘরটি ধূপ-ধুনার সৌরভে সুরভিত। ঘরের মাঝখানে একটি বেদীর ওপরে রয়েছে একটি কাচের আধার। তার মধ্যে রয়েছে সন্ন্যাসী য়ুয়েৎ কাইয়ের মরদেহ। আমাদের গাইড সন্ন্যাসী জানালেন যে এই মরদেহে একপ্রকার আরক প্রয়োগ করে এটিকে পচনহীন করা হয়েছে এবং একে অক্ষত রাখার জন্য এটিকে স্বর্ণপাতে মণ্ডিত করে রাখা হয়েছে। দর্শকরা যাতে এই দেহটি স্পর্শ করতে না পারেন সেইজন্য এটিকে রাখা হয়েছে এই কাচের আধারের মধ্যে। তাঁর নশ্বর দেহের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলাম।

আমা রক্ (Amah Rock):—এবার আমরা উঠেছি দশহাজারী বুদ্ধ মন্যাস্ট্রি পাহাড়ের উল্টোদিকে, সমুদ্রের কোল ঘেঁষা অপর একটি পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড়টি উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত ছোট বলে এর ওপরে উঠতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হল না। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। রফিক জানালো যে, এই পাহাড়টির নাম হচ্ছে আমা রক্ (Amah Rock)। তারপর চূড়ার একপ্রান্তে দণ্ডায়মান একটি বড় ও একটি ছোট শিলা দেখিয়ে রফিক বলল—এই শিলা দুটি হচ্ছে এক ধীবর রমণী ও তার শিশুপুত্রের প্রস্তরীভূত দেহ। তারপর রফিক শোনাল এর ইতিকথা—এক ধীবর প্রায়ই তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে গভীর সমুদ্রে যেত মাছ ধরার জন্য। ওদের ফিরে আসার সময় হলে ঐ ধীবরের স্ত্রী তার শিশুপুত্রের হাত ধরে এইখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকত তার স্বামীর নির্বিঘ্নে ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। একদিন সবাই ফিরল, ফিরল না কেবল উক্ত ধীবরীর স্বামী। অন্যান্য ধীবররা ঐ ধীবরীকে জানালো যে তার স্বামীকে সমুদ্রে গ্রাস করেছে। ধীবরী এ কথা বিশ্বাস করল না, তাই প্রতিদিন অপরাহ্নে সে তার শিশুপুত্রের হাত ধরে এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, তার স্বামীর নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায়। এইভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর কেটে যায়, কিন্তু ধীবরীর স্বামী আর ঘরে ফিরে আসে না। করুণাময় ঈশ্বরের একদিন করুণা হল ওদের প্রতি। সেদিন অপরাহ্নে অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। করুণাময় ঈশ্বর করুণা করে বাজ হানলেন ওদের উভয়ের শিরে। ধীবরী সপুত্র মিলিত হল পরলোকগত স্বামীর সঙ্গে। আর ধীবরীর স্বামীর প্রতি আনুগত্যের প্রতীক স্বরূপ ওদের দুজনের মরদেহ শিলীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এইখানে।

বেশ বেলা হয়েছে। সিং এবং আমাকে রফিক জিজ্ঞাসা করল—এখন আমরা কি সোজা ফিরে যাব, না ক্লীয়ার ওয়াটার বে (Clear Water Bay) দেখে ফিরব? তবে ক্লীয়ার ওয়াটার বে দেখে হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। একে ক্লান্ত, তায় জঠরানল জ্বলছে। সুতরাং আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়ারই সাব্যস্ত করলাম।

ফেরার পথে আমাদের গাড়ি একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল। রাবেয়া জানালো, এই সুড়ঙ্গটার নাম হচ্ছে লায়ন রক টানেল (Lion Rock Tunnel)। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আমরা এসে পড়লাম আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই কাউলুনের পথে। এক ফাঁকে চুপি চুপি রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম – বোনটি! তুমি কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কি করে একজন পাকিস্তানী মুসলমানের ঘরণী হলে তা জানার জন্য আমি বড় উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছি।

উত্তরে রাবেয়া জানালো, দাদা! আমিও কাউকে সে কাহিনী শোনানোর জন্য উৎসুক হয়ে আছি। যথা সময়ে আমি সব কথাই বলব।

আমরা এসে গেছি আমাদের হোটেলের দোরগোড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে রফিককে অনুরোধ করলাম দু-চারটে ছোট-খাটো নাইট ক্লাবের নাম ও ঠিকানা বলার জন্য। উত্তরে রফিক বলল, বিকেলে আমাদের ফ্ল্যাটে চলে এসো। ওখানে চা পান করে আমরা চারজনে একসঙ্গে যাব কোন নাইট ক্লাবে এবং সেখানেই সারব রাত্রের খানাপিনা।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ বুজে গেল। বিকেল সাড়ে চারটেয় সিংয়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। মুখ-হাত ধুয়ে, কোট-প্যাণ্টের পরিবর্তে পরলাম ধুতি ও পাঞ্জাবী। সিংও পরল পায়জামা এবং পাঞ্জাবী। আমরা দুজনে মিসেস্ লালকাকার ঘরে ঢুকে আমাদের আর্জি পেশ করলাম—আজ রাত্রে আমরা দুজনে এখানে বড়-হাজরি সারব না, সুতরাং সেই বাবদ সে যদি আমাদের দুজনকে ৮ ডলার করে ১৬টি মার্কিন ডলার দিয়ে দেয় তাহলে আমরা তার কাছে বাধিত থাকব। লালকাকা খুশ মেজাজে ছিল তাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনের নৈশভোজের জন্য ১৬ আমেরিকান ডলার দিয়ে দিল। আমরাও রফিকদের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

যদিও আমাদের হোটেল থেকে রফিকদের ফ্ল্যাট-বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েই দেখি যে আমাদের সামনে দিয়ে একটা রিক্‌শা যাচ্ছে। সেই যে বলে না 'ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়', তাই। আমরা চড়ে বসলাম

রিক্শা গাড়িতে। আমাদের দেশের মতই মানুষে টানা রিক্শা। তবে এর চাকা দুটি আকারে বেশ বড় এবং তাতে লাগানো রয়েছে সাইকেলের মত রবারের টায়ার টিউব। নরম গদি আঁটা এর বসবার আসনটি বেশ আরামদায়ক এবং প্রশস্ত। তাতে দুজন তো বেশ আরামেই বসা যায়, তিনজন বসলেও কোন অসুবিধা হয় না। এখানে গাড়ি-ভাড়া নিয়ে দরদস্তুর করার কোন বালাই নেই। দূরত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া।

ট্রামে অথবা বাসে করেও রফিকদের বাড়িতে যাওয়া যায়। এখানকার ট্রাম বাসের একটা বিশেষত্ব আছে। এখানকার ট্রামগুলি দ্বিতলবিশিষ্ট (Double decker) গাড়ি। আমাদের কলকাতার মত জোড়াগাড়ি নয়। প্রত্যেকটি ট্রাম এবং বাসের দুটি করে দরজা। একটি প্রবেশদ্বার এবং অপরটি বহির্গমনের দ্বার। ট্রাম এবং বাসের প্রবেশদ্বারের কাছে বসে থাকে কণ্ডাক্টর। তাকে নির্দিষ্ট স্থানের নির্ধারিত ভাড়া দিলে সে একখানা টিকিট দেবে এবং ট্রামে কিম্বা বাসে ওঠার অনুমতি দেবে। ট্রামে অথবা বাসে দাঁড়িয়ে বা ঝুলে যাওয়া নিষিদ্ধ। ট্রামে এবং বাসের প্রতিটি দরজাই স্বয়ংক্রিয়। থামার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি আপনা থেকেই খুলে যায় আবার চলবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

রিক্শা করে রফিকদের বাড়িতে পৌঁছতে আমাদের বেশী সময় লাগল না। সেখানে একটি মনিহারীর দোকান থেকে মিল্ক চকোলেটের দুটো বড় প্যাকেট কিনে নিয়ে লিফ্‌টে করে আমরা উঠে গেলাম রফিকদের ফ্ল্যাটে।

রফিকদের ফ্ল্যাটের কলিংবেল টিপতেই বেরিয়ে এলো ওদের বেয়ারা এবং আমাদের নিয়ে গেল সোজা ওদের চা-পান কক্ষে। সেখানে গিয়ে দেখি রফিক এবং রাবেয়া ওদের দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে চায়ের টেবিলে বসে আছে। আমরা বাচ্চা দুটির গাল টিপে আদর করে ওদের হাতে দিলাম চকোলেটের প্যাকেট দুটি। থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল—বলে ওরা দুজনে কৃতজ্ঞতা জানাল।

চা প্রস্তুত ছিল, তাই কালবিলম্ব না করে রাবেয়া আমাদের সকলের পেয়ালাতেই চা ঢালল এবং সেইসঙ্গে সকলের দিকে এগিয়ে দিল স্যাণ্ডউইচ, বিস্কুট এবং পেষ্ট্রি ভর্তি তিনটি প্লেট। চায়ে চুমুক দিতে রাবেয়া জিজ্ঞাসা করল, দাদা, চা কেমন হয়েছে? আমি রসিকতা করে বললাম, চমৎকার, আহা, যেমনি 'লিভার তেমনি ফিভার।' ওরা কেউ আমার রসিকতা বুঝল না, তাই আমি ওদেরকে আমার রসিকতার অর্থ বুঝিয়ে দিলাম। আসল কথাটি হচ্ছে—যেমনি লিকার তেমনি ফ্লেভার, ঐ কথা দুটিরই ব্যঙ্গ রচনা করে আমি বলেছি—আহা, যেমনি

লিভার তেমনি ফিভার। আমার ব্যাখ্যা শুনে রাবেয়া, রফিক এবং সিং তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠল। চা পানান্তে রাবেয়া, রফিক, সিং ও আমি রফিকের গাড়ি করে চললাম নৈশ খোলা বাজার দেখতে।

ওপন এয়ার মার্কেট অফ নাইট (Open Air Market of Night) :—ম্যাকাউ (Macau) দ্বীপে যাবার ফেরিঘাটের কাছে বিস্তীর্ণ এক খোলা মাঠের ওপর বসেছে এই নৈশ বাজার। রফিক জানালো যে আসলে এটি হচ্ছে একটি পার্কিং প্লেস অর্থাৎ মোটরগাড়ি রাখবার স্থান। বিকেল পাঁচটার সময় অফিস-কাছারি ছুটি হয়ে গেলে যে যার গাড়ি নিয়ে চলে যায় ফলে মাঠটি খালি হয়ে যায়। তখন হকাররা এসে তাদের পণ্যসামগ্রী সাজিয়ে শূন্য মাঠটি পূর্ণ করে। এই সব হকারদের দোকান-ঘর নেই। এরা মাটির ওপরে চাটাই বিছিয়ে তার ওপরে নানা রকম পণ্যসামগ্রী সাজিয়ে বসে যায় খোলা আকাশের নীচে। কোন দোকানেই বিজলীবাতি নেই। কোন দোকানে জ্বলছে হ্যাজাক, কোনটাতে কারবাইড গ্যাসের বাতি, কোনটাতে লণ্ঠন, আবার কোন দোকানে বা মোমবাতি। তা বলে মাঠে বিজলীবাতি যে একেবারে নেই তা নয়, মাঠের মাঝে মাঝে খুঁটি পোতা আছে, সেখানে জ্বলছে রং-বেরঙের নীয়ন (Neon) বাতি।

এমন কোন জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন সামগ্রী সবই আছে। তবে তরল আলতা পাবেন না, কিন্তু চীনা সিঁদুর পাওয়া যায়। লাঠি, ছড়ি, ছাতা, ক্যামেরা, ঘড়ি, পেন, রেডিও, ট্রানজিস্টার, টেপরেকর্ডার, রেডিওগ্রাম সবই পাওয়া যায়। আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে নানা রকম কলের অর্থাৎ দম দেওয়া ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র এবং আসবাবপত্রের দোকান। আরও খানিক এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ফুলের বাজার। ফুলের বাজারের অপর পাশে বাজার বসেছে। সেখানে পাওয়া যাবে শাক-সব্জী, তরি-তরকারি, ফল-মূল, মাছ-মাংস, হাঁস-মুরগী, ডিম ইত্যাদি। যাবতীয় রন্ধন সামগ্রীও পাওয়া যায়। বাজারের একপ্রান্তে স্তূপাকার করা রয়েছে শুকনো মাছ। তার দুর্গন্ধে পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হয়।

এরপর আমরা গেলাম বাজারের অপর প্রান্তের মাঠে। এটি হচ্ছে আমোদ-প্রমোদের স্থান। এখানে মঞ্চের কোন বালাই নেই। খোলা আকাশের নীচে মাঠের ওপরে বসেছে নানা রকম আমোদ-প্রমোদের আসর। নাচ, গান, বাজনা, হাস্যকৌতুক, ম্যাজিক, জিমন্যাস্টিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি। এই স্থানটিকে বলা হয়

'পুওর মেন্‌স নাইট ক্লাব' অর্থাৎ গরীব লোকদের নৈশ ক্লাব। এখানে কোন আসরে প্রবেশ করতে গেলে কোন রকম দর্শনী লাগে না। তবে দর্শকরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে চিত্তবিনোদনকারীদের কিছু কিছু অর্থ প্রদান করে। কোন আসরেই দর্শনী লাগে না বলে প্রতি আসরটিই দেখি ভীড়ে জমজমাট। আসরের মধ্যে চীনা ছেলেমেয়েরা লজেন্স, চকোলেট, চুয়িংগাম, চিনির মিঠাই ইত্যাদি ফিরি করে বেড়াচ্ছে। বার এবং রেস্তোরাঁ? তা তো আছেই, ও সব না থাকলে আসর জমবে কি করে।

গণৎকারের দলও আসন বিছিয়ে বসে আছে এই খোলা ময়দানে। কেউ হস্তরেখা পরীক্ষা করছে, কেউ খড়ি পেতে ভাগ্য গণনা করছে আবার কেউ বা বসে আছে খাঁচার মধ্যে একটি পাখি নিয়ে। কলকাতার রাস্তায়ও এ দৃশ্য চোখে পড়ে।

সমগ্র ময়দানটি যেন একটি জনঅরণ্যে পরিণত হয়েছে। তাদের কোলাহলে সারা ময়দান জমজমাট। বিক্রেতাদের অধিকাংশই চীনা রমণী। এর মধ্যে আমাদের দেশের সিন্ধি, পাঞ্জাবী, শিখ এবং পাকিস্তানী মুসলীমদেরও কিছু কিছু দোকানপাট আছে। কিছু কিছু বিকলাঙ্গ চীনা ভিখারীও নজরে পড়ছে। তারা চীনের তৈরি একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ভিক্ষা করছে।

ময়দান থেকে বেরোতে বেরোতে রফিককে জিজ্ঞাসা করলাম—এই হাট-বাজার, হৈ-হট্টগোল এবং আমোদ-প্রমোদ চলবে কত রাত পর্যন্ত?

উত্তরে রফিক জানালো, তা প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত। তারপর একে একে যে যার তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওনা হবে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে। তখন থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত এখানে বিরাজ করবে বিরাট এক নির্জনতা।

আমার ইচ্ছা আমরা কোন এক ভাসমান নাইট ক্লাবে যাই। কারণ জেনেভাতে অর্থাভাবে আমার এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। তাই আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করলাম রফিকের কাছে। রফিক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালাল অ্যাবার্ডিন অভিমুখে।

ফ্লোটিং রেস্তোরাঁ এ্যাণ্ড নাইট ক্লাব (Floating Restaurant & Night Club) :—আমরা এসেছি অ্যাবার্ডিন নৌ বন্দরে ভাসমান ফ্লোটিং কুইন (Floating Queen) নামে সুসজ্জিত এবং বাতানুকুল দ্বিতল বিশিষ্ট এক স্টীমারে। এর একতলাতে রয়েছে বার এবং রেস্তোরাঁ আর দোতলাটা হচ্ছে নাচের আসর। আমরা নৈশভোজ সমাধা করার জন্য প্রথমে রেস্তোরাঁতে ঢুকে চার আসনযুক্ত একটি টেবিলে গিয়ে বসলাম।

টেবিলটি বেশ পরিপাটি করে সাজানো। টেবিলের ওপরে ধপধপে সাদা একটা চাদর বিছানো। তার মাঝখানে রয়েছে ফুল ভর্তি রঙীন কারুকার্য করা চীনেমাটির একটা ফুলদানি। ফুলদানির কাছে বৃত্তাকারে পাঁচটি চীনেমাটির বাটি সাজানো রয়েছে। ওই পাঁচটি বাটিতে রয়েছে চিলি সস্, সয়াবীন সস্, মাস্টার্ড, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং সাদা নুন। টেবিলের চারপাশের আসন ঘেঁষে বসানো রয়েছে চারটে কাচের গেলাস। চারটি গেলাসের মধ্যে চারটি ন্যাপকিন সাজিয়ে রাখা হয়েছে হাঁসের মত করে।

রেস্তোরাঁর একজন চীনা পরিচারিকা আমাদের হাত ও মুখ মোছার জন্য দিয়ে গেল সুগন্ধি ও-ডি-কলোন মিশ্রিত গরম জলে ভেজানো চারখানা তোয়ালে। হাত মুখ মোছার পালা শেষ হলে রফিক পরিচারিকাকে ব্ল্যাক লেবেল হুয়িস্কির তিনটি বড় পেগ এবং এক পেগ শেরি আনবার ফরমাস করল।

ওয়েট্রেস কেবলমাত্র হুয়িস্কি এবং শেরিই নিয়ে এলো না, সেই সঙ্গে নিয়ে এলো মাঠকলাইয়ের তেলে (Peanut oil) ভাজা এক প্লেট কুচো চিংড়ি, এক প্লেট সার্ডীন মাছ এবং ভিনিগারে ভেজানো এক প্লেট ছোট ছোট আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ ও কলাইশুঁটি। আর সিংয়ের জন্য এলো এক প্লেট সল্টেড কাজু বাদাম।

এরপর রফিক ওদের আজকের নৈশভোজের খাদ্য-তালিকা দেখতে চাইল। তাতে লেখা আছে পাঁচ জাতীয় খাদ্য—ক্যাণ্টনীজ, সাংহাইনীজ, পিকিনীজ, মঙ্গোলিয়ান এবং ইংলিশ। রফিক সর্বজাতীয় খাদ্য নিয়ে আসার জন্য ওয়েট্রেসকে অনুরোধ জানালো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়েট্রেস একটি ট্রলিতে করে একরাশ খাদ্য এনে হাজির করল আমাদের টেবিলের সামনে। ট্রলির ওপরে ট্রে, প্লেট এবং বেতের ছোট ঝুড়িতে সাজানো রয়েছে ঐ পাঁচ জাতীয় খাদ্য-দ্রব্য। এত রকম খাদ্য দেখে সিং এবং আমার চোখ কপালে উঠল, রফিককে বললাম, এত খাবার কি হবে, আর এর জন্যে অনেক মূল্যও তো দিতে হবে।

উত্তরে রফিক জানালো, না না, এত খাবার খেতেও হবে না আর এর জন্যে অধিক মূল্যও দিতে হবে না। এখানে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, এ-লা-কার্টি (A-La-Carte) পদ্ধতিতে, অর্থাৎ যতটুকু খাবে কেবলমাত্র ততটুকুরই মূল্য দিতে হবে। সিং ও আমি আশ্বস্ত হলাম।

এর মধ্যে থেকে রফিক চারটি পদ বেছে নিল আমাদের তিনজনের জন্য, যথা :—শার্ক ফিন্স্ সুপ উইথ চিকেন ব্রথ, চাউ ফ্যান্ (Chow Fan) অর্থাৎ

বিরিয়ানী, স্টীমড্ লবস্টার উইথ গ্রীণ পীজ অ্যাণ্ড অ্যামণ্ডস্ এবং কোল্ড লবস্টার উইথ ফ্রুট স্যালাড।

এ তো গেল আমাদের তিনজনের আমিষ খাদ্যের তালিকা। এবার শুনুন সিংয়ের নিরামিষ খাদ্যের তালিকা—মাশরুম্ অ্যাণ্ড নুডল্‌স্ স্যুপ, বীট, গাজর, কলাইশুঁটি, বাদাম ও আখরোট দেওয়া ফ্রায়েড রাইস্, ব্যাম্বু শুটস্ অ্যাণ্ড কিউকম্বার কারি অর্থাৎ বাঁশের কোঁড় এবং শসা দিয়ে তৈরি তরকারি, ফ্রুট স্যাল্যাড। এই নৈশভোজের সাথে সাথে আমাদের ড্রিঙ্কস্‌ও কিন্তু চলছে।

আমাদের পাশের টেবিলে নারী ও পুরুষে মিলিয়ে দশজনের একটি দল খেতে বসেছেন। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং আচার-ব্যবহারে বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। ওয়েট্রেস্ ওদের টেবিলে স্যুপের সঙ্গে হাড়ের পাত্রে ক্ষীরের মত দেখতে এক রকম জমাট পদার্থ রেখে গেল। ওরা দেখি স্যুপের সঙ্গে চামচ দিয়ে সেই জমাট পদার্থটি বেশ তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছেন।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে রফিককে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ হাড়ের পাত্রের ভেতরকার জমাট পদার্থটি কি ?

উত্তরে রফিক জানালো—ঐ হাড়ের পাত্রগুলি হচ্ছে বাঁদরের মাথার খুলি, আর ওর ভেতরের জমাট বাঁধা পদার্থটি হচ্ছে বাঁদরের মাথার ঘিলু। বাঁদরের মাথার কাঁচা ঘিলু চীনাদের অতি উপাদেয় এবং মূল্যবান খাদ্য। এই খাদ্য পরিবেশন করা হয় সম্ভ্রান্ত অতিথিদের।

আমি ভ্রূ কুঁচকালাম। রাবেয়া বলল, ভ্রূ কুঁচকাবার কিছু নেই। মানুষ আর কাক-চিলের মাংস ছাড়া এমন কোন মাংস নেই যা চীনারা খায় না। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, শুয়ার, কুকুর, বেড়াল, ভাল্লুক, সাপ, ব্যাঙ, বাদুড়, চামচিকা, ইঁদুর, বাঁদর কিছুই এদের কাছে অখাদ্য নয়।

এরপর রাবেয়া আমাদের পাশের টেবিলের প্রতি আর একবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং বলল, ঐ যে স্যুপটা ওরা খাচ্ছেন, ওটার নাম হচ্ছে বার্ডস্ নেস্ট স্যুপ (Bird's Nest Soup)। ঐ স্যুপটি চীনাদের একটি অতি প্রিয় খাদ্য। তবে ওটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলে সাধারণ লোকদের পক্ষে ওর রসাস্বাদন করা সম্ভব নয়।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পান-পাত্র তখনও নিঃশেষ হয়নি এমন সময়ে ভোঁ ভোঁ করে স্টীমারের সাইরেন বেজে উঠল। রফিক বলল, এটা হচ্ছে নাচের আসর শুরু হওয়ার সংকেত ধ্বনি।

আমরা তাড়াতাড়ি পান-পাত্র নিঃশেষ করলাম। ওয়েট্রেস আমাদের হাত ধোবার জন্য কাঁচের বাটিতে করে গরম জল এবং হাত মুখ মোছার জন্য দিয়ে গেল সেই ও-ডি-কলোন মিশ্রিত গরম জলে ভেজানো সুগন্ধি তোয়ালে।

রফিক এবং রাবেয়ার বাধা উপেক্ষা করে সিং এবং আমি উভয়ে মিলে মিটিয়ে দিলাম আজকের নৈশভোজের বিল। আমাদের নৈশভোজের বিল হল ২৮ আমেরিকান ডলার, সেই সঙ্গে আমরা আরও ২ ডলার বকশিশ দিলাম ওয়েট্রেসকে। এরপর রফিক আমাদের দুজনকে কোন রকম খরচ করার সুযোগ না দিয়ে আগে ভাগে গিয়ে আমাদের চারজনের জন্য নাচের আসরের চারখানা টিকিট কিনে আনল।

ফ্লোটিং নাইট ক্লাব (Floating Night Club) : এই ভাসমান নাইট ক্লাবটি হচ্ছে স্টীমারের দোতলার ডেকে। ডেকের একপাশে বৃত্তাকারে সাজানো রয়েছে বেশ মোটা গদি-আঁটা চেয়ার। এগুলি হচ্ছে দর্শকদের বসবার আসন। বৃত্তের মধ্যস্থলটা হচ্ছে নৃত্য মঞ্চ। প্রায় দু-তিনশো দর্শক বসতে পারেন এই আসনগুলিতে। প্রত্যেক চেয়ারের হাতলের একপাশে আঁটা আছে একটা করে ছোট কাঠের ট্রে। ট্রের ওপরে রয়েছে একটা ছাইদানি এবং একটা খালি গেলাস। ডেকের অপর পাশে আছে গ্রীণরুম বা সাজঘর এবং ক্যান্টিন ও বার। সমস্ত ডেকটাকে রঙীন কাগজের ফুল এবং চেন দিয়ে সাজানো হয়েছে। দর্শকদের বসবার স্থানগুলির মাথার ওপরে ঝুলছে রঙীন বেলুনের গুচ্ছ এবং রঙীন কাগজের তৈরি বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন। সেগুলিতে মোমবাতি জ্বলছে।

স্টীমার মন্থর গতিতে চলতে শুরু করেছে। পরিচারক এবং পরিচারিকারা ট্রেতে করে নানা জাতীয় দেশী ও বিদেশী মদ এবং নানা রকম ঠাণ্ডা পানীয় ও ফলের রস বিতরণ করছে। মাত্র এক পেগ করে মদ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, তার অতিরিক্ত প্রয়োজন হলে তার জন্য মূল্য দিতে হয়।

সিং বলল, এখানে এসেছি যখন, তখন এদের দেশীয় মদ পান করব। তথাস্তু। আমাদের তিনজনের জন্য নেওয়া হল চীনাদের তৈরি হুয়িস্কি তিন পেগ আর রাবেয়ার জন্য নেওয়া হল এক পেগ শ্যাম্পেন। কি কড়া মদ রে বাবা! যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরেই অডিটোরিয়ামের সব বিজলীবাতি নিভে গেল, জ্বলতে থাকল কেবলমাত্র মাথার ওপরকার ঝাড়লণ্ঠনগুলি। মঞ্চের আলো সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক স্বপ্নপুরীর আবহাওয়া সৃষ্টি হল। সুঠাম তরুণ তরুণীরা

বিচিত্র রঙের সাজ-পোশাক পরে একে একে এসে হাজির হল মঞ্চের ওপরে। রঙ্গমঞ্চটি হয়ে উঠল মহামিলনের এক তীর্থক্ষেত্র। শুরু হল ব্যালে নৃত্য। তরুণ-তরুণীরা নাচতে লাগল কখনও দলবদ্ধ হয়ে, আবার কখনও বা যুগলে। তাদের বিচিত্র রঙের সাজ-পোশাকের ওপর এসে পড়তে লাগল বিচিত্র রঙের তীব্র আলোর ফোকাস। মঞ্চের ওপরে নাচের তালে তালে চলতে লাগল রামধনু রঙের খেলাও। এই রঙের ছটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল দর্শক মনেও। দর্শকরা ঘন ঘন মদ্যপান করে মনটাকে আরও রাঙিয়ে নিচ্ছেন।

রফিক জিজ্ঞাসা করল, বোস্! আর এক পেগ করে নিয়ে মনটাকে আর একটু রাঙিয়ে নিলে কেমন হয়?

বুঝতে পারছি যে আমার বেশ নেশা হয়েছে। কিন্তু পাছে এদের কাছে হেয় হতে হয় তাই বললাম, তা নিলে মন্দ হয় না।

সিংয়েরও নেশা বেশ জমেছে। সেও আমার কথায় সায় দিল।

এরপর আরম্ভ হল দ্বিতীয় দৃশ্য। শুরু হল ক্যাবারে অর্থাৎ সরাইখানার নাচ। এতে অংশ গ্রহণ করেছে কেবল মাত্র তরুণীরা। তারা বিভিন্ন ধরণের সাজ-পোশাকে সজ্জিত হয়ে দলবদ্ধভাবে নাচতে নাচতে আবির্ভূত হল মঞ্চের ওপরে। ক্রমশ নাচের তাল ক্ষিপ্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অঙ্গ থেকে অঙ্গাবরণ খুলে পড়তে লাগল। অবশেষে এরা প্রত্যেকেই হয়ে উঠল পৌরাণিক যুগের এক একজন অনন্তযৌবনা অপ্সরা। সমগ্র অডিটোরিয়াম অন্ধকার করে দিয়ে বিভিন্ন রঙের আলোর তীব্র ফোকাস ফেলা হল এদের নগ্ন সুঠাম দেহের ওপরে। এতে এদের দেহের পেশীগুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নেশার ঘোরে আমার মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতার কয়েকটি লাইন বেরিয়ে এলো :—"কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা,

তুমি অনিন্দিতা।
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা,
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা ॥"

রফিক হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাবেয়া উর্দু ভাষায় এটির তর্জমা করে রফিককে এর মানে বুঝিয়ে দিল।

এদের বাদামী এবং কালো কেশদাম, আরক্তিম গাল, মৃগনয়ন, পাতলা গোলাপী অধর, বলিষ্ঠ গ্রীবা, সুডৌল বাহু, তন্বী দেহ, উন্নত সুগোল পরিপুষ্ট শুভ্র দুটি স্তন, আকর্ষণীয় নিতম্ব, পরিপুষ্ট উরু এবং পেশল পায়ের ডিম পুরুষ

দর্শকদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। আবার আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল :—

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লাসী
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্য শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষো মাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্ত ধারা ॥"

নাচের ছন্দ তুঙ্গে উঠলে মঞ্চের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ক্যাবারে নৃত্যের সমাপ্তি ঘটানো হল এবং দশ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করা হল।

আমাদের স্টীমার উপসাগরের বক্ষে কম্পন তুলে মন্থর গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের দিকে। বহুদূর থেকে জোনাকির মত মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে দ্বীপ-উপদ্বীপগুলির রং-বেরঙের নিয়ন বাতিগুলি। মনে হচ্ছে যেন এক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতি বসে রয়েছে সমুদ্রবক্ষে। আমাদের স্টীমার যখন কোন দ্বীপ বা উপদ্বীপের কাছাকাছি আসছে তখন সেখান থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে সমবেত বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর সুরধ্বনি। এই সুরধ্বনি বোধ হয় নিকটস্থ দ্বীপ বা উপদ্বীপগুলির নাইট ক্লাব থেকে আসছে। স্টীমারের সাইরেন বেজে উঠল আবার, জানিয়ে দিল বিরতির অবসান ঘটেছে।

আরম্ভ হল তৃতীয় দৃশ্য। এতে দেখানো হল লোক-নৃত্য। এটি রচনা করা হয়েছে একটি কাহিনী অবলম্বনে। এর সূচনা হয়েছে প্রস্তর যুগে আর পরিসাপ্তি ঘটেছে আধুনিক যুগে এসে। কাহিনীটি হল এই রকম :—একটি তুষারাচ্ছাদিত পার্বত্য গুহা। গুহার অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলো লোমশ ভল্লুকের চামড়া পরিহিত জনা দশ-বারো নারী ও পুরুষের একটা দল। তাদের প্রত্যেকের হাতে বাঁশের তীর-ধনুক এবং একটি করে বর্শা। এদের মধ্যে আছে একজন বয়স্ক পুরুষ এবং একজন বয়স্কা নারী। আর অবশিষ্টরা হচ্ছে যুবক-যুবতী এবং তরুণ-তরুণী। এরা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। ঐ বয়স্কা নারী হচ্ছে এদের মা। এদের সঠিক পিতৃ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এদের যৌন-জননের কোন বাছ বিচার বা বাধা নিষেধ কিছুই নেই। তবে এই বয়স্কা ছাড়া ওরা সকলেই সহোদর ভাই এবং বোন।

ওরা দল বেঁধে চলেছে আহার অন্বেষণে অর্থাৎ শিকারে। ঐ বয়স্কা নারী হচ্ছে দলনেত্রী। সে চলেছে সর্বাগ্রে। তার পিছনে পিছনে চলেছে বয়স্ক পুরুষটি। ওদের উভয়ের উন্মুক্ত বাহু দুটির পেশীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তাদের বাহুযুগল এখনও যথেষ্ট শক্তি ধারণ করে। বার্ধক্য ছুঁই ছুঁই করেও এখনও ওদেরকে ছোঁয়নি এবং যৌবনও যাই যাই করেও যায়নি। আর যুবক-যুবতী এবং তরুণ-তরুণীরা? তারা তো যৌবন মদে মত্ত। তারা সারিবদ্ধভাবে চলেছে ওদের দুজনের পিছু পিছু। পাহাড়ী জঙ্গলের এদিক ওদিক অনুসন্ধান করতে করতে ওরা সকলেই এসে দাঁড়াল একটা গুহার সামনে। দলনেত্রী বর্শা হাতে নিঃশব্দে প্রবেশ করল গুহাভ্যন্তরে—শোনা গেল কোন এক জন্তুর করুণ আর্তনাদ। তার কিছুক্ষণ পরে দু'হাতে দুটি ভল্লুক শাবক নিয়ে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দলনেত্রী এবং কয়েকজনকে ইঙ্গিত করল গুহাভ্যন্তরে যাবার জন্য। তারা সেখান থেকে টেনে বার করল বর্শাবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ একটা মৃত ভল্লুককে। নেত্রীর নির্দেশে মৃতদেহ থেকে বর্শা খুলে নিয়ে সেই ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে একে একে সবাই পান করল তার তাজা রক্ত।

পানান্তে কিছুক্ষণের জন্য চলল নৃত্য-গীত। তারপর জঙ্গল থেকে গাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে আনা হল এবং কোমরে জড়ানো চামড়ার তৈরি দড়ি খুলে ঐ দড়ি দিয়ে ভাঙা ডালটার সঙ্গে মৃতদেহটাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে সেটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে এবং শাবক দুটিকে হাতে নিয়ে সবাই চলতে শুরু করল নিজেদের গুহাভিমুখে। এবার কিন্তু নেত্রী রইল সবার পিছনে। কিছু দূর যাবার পর নেত্রীর সন্দেহ হল যে দুটি নেকড়ে তাদের পিছু নিয়েছে। তার নির্দেশে সবাই থমকে দাঁড়াল এবং সকলে মিলে একটা ঝোপ ঘিরে ফেলল। নেকড়ে দুটো বিপদ বুঝতে পেরে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পালানো আর হল না, তার আগেই তীরবিদ্ধ হয়ে ধরাতে লুটিয়ে পড়ল। আবার একে একে সকলেই পান করল সেই তাজা রক্ত এবং খুশিতে ডগমগ হয়ে সেই একই উপায়ে এ দুটিকেও কাঁধে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে চলল নিজেদের গুহাভিমুখে। মনে রাখবেন, এ সব ঘটনা কিন্তু দেখানো হচ্ছে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে।

ওরা যখন নিজেদের গুহায় ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে এক বৃদ্ধা কয়েকজন নাতি-নাতনী সহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন গুহাভ্যন্তর থেকে। তিন-তিনটি শিকার দেখে বৃদ্ধা খুশি হয়ে প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। জ্যোৎস্না রাত, তাই বন-জঙ্গল, পাহাড়-

পর্বত, মাঠ-ঘাট সব চন্দ্রালোকে ভেসে যাচ্ছে। ওরা কাঁধের বোঝাগুলি খোলা মাঠে নামিয়ে রেখে এবং ভল্লুক শাবক দুটি বাচ্চাদের খেলা করার জন্য দিয়ে সকলে চলে গেল গুহাভ্যন্তরে। সেখান থেকে সকলে পুনরায় যখন উন্মুক্ত মাঠে বেরিয়ে এলো তখন তারা দিগম্বর ও দিগম্বরী। নেত্রী একটা শাণিত পাষাণ ফলক দিয়ে মৃত ভল্লুকটির চামড়া ছাড়াতে লাগল, আর অন্যান্যরা বৃত্তাকারে তাকে ঘিরে বসে হাততালি দিয়ে গান শুরু করল। চামড়া ছাড়ানো হয়ে গেলে নেত্রী ভল্লুকটির পেট থেকে বুক পর্যন্ত চিরে অতি সন্তর্পণে তার হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে আনল এবং খণ্ড খণ্ড করে সবাইকে ভাগ করে দিল। সকলে মহা উল্লাসে সেই কাঁচা কলিজা ভক্ষণ করল। তারপর চকমকি পাথর ঘষে কাঠের আগুন জ্বেলে তাতে ঝলসানো হল চামড়া ছাড়ানো সেই ভল্লুকের দেহটা। নেত্রী সকলকে বিতরণ করল সেই ঝলসানো মাংস আর সেই সঙ্গে গৃহনির্মিত চোলাই মদ। পান ও আহার বেশ জমে উঠল, সকলের চক্ষু হল জবাফুলের মত লাল। ছুটল হাসির ফোয়ারা, দেখা দিল পানোন্মত্ত উল্লাস।

ঝির ঝির করে বরফ পড়ছে উন্মুক্ত মাঠে। সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। দিগম্বর এবং দিগম্বরীর দল ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে মেতে উঠল নাচে গানে। সেই বয়স্ক পুরুষটি অগ্নিকুণ্ডের কাছে পাথরের ওপর বসে কাঠি দিয়ে একটা লাঠি বাজাতে আরম্ভ করল সেই সঙ্গে বেজে উঠল বাঁশি, শিঙ্গা, মাদল ও মৃদঙ্গ। নাচের মাঝে মাঝে ওরা হাড়ের খুলিতে করে চোলাই মদ পান করছে এবং মনের উল্লাসে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠছে। সবাই যখন নেশায় এবং আনন্দে মত্ত তখন হঠাৎ ঐ বয়স্ক পুরুষটি তার হাতের লাঠি এবং কাঠি ফেলে দিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল এক অষ্টাদশী যুবতীকে। যুবতী প্রথমে একটু ইতস্তত করল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ঐ বয়স্কের বাহুবেষ্টিত হয়ে চলে গেল পাশের নির্জন ঝোপের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে তারা যখন ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো তখন তারা আনন্দে ডগমগ, তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আনন্দের উচ্ছ্বাস। ওদের গাল হয়েছে রক্তিমাভ। এরপর ঐ বয়স্কা নেত্রী অর্থাৎ মা তার আটাশ বছর বয়সের যুবক ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে জর্জরিত করে তাকে কামাতুর করে তুলল এবং তাকে বাহুবেষ্টিত করে নিয়ে গেল আর একটা ঝোপের মধ্যে। এই রকমে ভাই বোনকে নিয়ে এবং বোন ভাইকে নিয়েও ঢুকল ঝোপের মধ্যে। নাচের মাঝে মাঝে চলতে লাগল এইসব কাণ্ডকারখানা।

এরপর দেখানো হল কি করে নারী তার কর্তৃত্ব হারাল। বহাল হল পুরুষের কর্তৃত্ব। বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেল। ওরা হয়ে পড়ল বিভিন্ন পরিবারভুক্ত। খাদ্য এবং বাসস্থান সংকুলানের জন্য এক পাহাড় এবং এক জঙ্গল হতে ওরা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন পাহাড় এবং বিভিন্ন জঙ্গলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল খাদ্যাভাব, অর্থাৎ শিকারের অভাব। তাই কিছু সংখ্যক পরিবার পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ছেড়ে নেমে এলো তরাই অঞ্চলে। সেখানে নদীর ধারে ধারে ওরা ঝুপড়ি বেঁধে বসতি স্থাপন করল। এই তরাই অঞ্চলে ওদের পরিচয় ঘটল আর্য সভ্যতার সঙ্গে। আর্যদের রীতি অনুযায়ী ওরা পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হল এবং ওদের বংশের পরিচিতিও হল ঐ পিতৃপরিচয়ে। সৃষ্টি হল বিভিন্ন জাতির। আর্যদের কাছ থেকে ওরা শিখল লৌহের ব্যবহার পদ্ধতি। প্রস্তর যুগের অবসান ঘটল, শুরু হল লৌহ যুগের। ওরা শিখল কৃষিকর্ম, গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি, বস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি। অনার্যরা ক্রমশ সভ্য হয়ে উঠল—এখন আর কেবল বন্য পশুই ওদের একমাত্র খাদ্য নয়, তাই ওরা পশু শিকার করা ভুলে গিয়ে মনোযোগী হল কৃষিকর্মে। চলল জিনিসপত্রের আদান-প্রদান। তারপর চলল ব্যবসা-বাণিজ্য। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে থাকল ততই ওরা ছড়িয়ে পড়তে লাগল স্থান থেকে স্থানান্তরে। এইভাবে গড়ে উঠল দেশ-দেশান্তর। সৃষ্টি হল বিভিন্ন জাতির। সৃষ্টি হল বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম ভাষা। ক্রমশ ওরা শিখল যুদ্ধ বিদ্যা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার। খাদ্য কিম্বা বাসস্থানের অভাব ঘটলে যুদ্ধ হয় এক জাতির সঙ্গে অন্য এক জাতির। হঠাৎ মঞ্চের পট পরিবর্তন হল। ফিরে গেল সেই প্রথম দৃশ্যে, অর্থাৎ ব্যালে নৃত্যতে। এরপর হল যবনিকাপাত। ইতিমধ্যে আমাদের স্টীমারও জেটিতে ভিড়ে বার বার তার ভোঁ বাজিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল।

হোটেলে ফেরার পথে গাড়ির মধ্যেই সিং আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বোস্! কেমন লাগল এই নাচ? আমি উত্তর দিলাম, ভালই লাগল। বিদ্রূপের সুরে সিং বলল, তা তো লাগবেই, বুড়ো বয়সে ন্যাংটা মেয়েছেলের নাচ, ভাল লাগার কথাই তো। নেশার ঘোরে আমিও একটু উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম, যদিও এই নাচের মধ্যে ইন্দ্রিয় উত্তেজক একটা পরিবেশ আছে বটে, কিন্তু তবু এটাকে আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক (Art for Art's Sake) হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ এর কলাকৌশলকে শিল্পকলারূপে গ্রহণ করা উচিত। কবি কালিদাসের নারীদেহের বর্ণনা যদি পড়ে থাকেন, তা হলে এ সৌন্দর্য বুঝতে পারবেন।

নারীদেহ গঠনের সৌন্দর্যকে যদি নিষ্কাম মনোভাবে শুধু সৌন্দর্য হিসাবে দেখা যায়, তা হলে এতে অশ্লীলতার কোন বালাই থাকে না। কিন্তু আমরা দেহ আর সৌন্দর্য এ দুটোকে আলাদা করে দেখি বলেই বাধে যত গণ্ডগোল।

রাত একটায় গাড়ি যখন আমাদের হোটেলের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল তখন সিং এবং আমার কারোরই গাড়ি থেকে নামবার ক্ষমতা নেই। দেহ যেন ভীষণ ভারী হয়ে উঠেছে, পা কাঁপছে, মাথা টলছে, কানের মধ্যে স্টীমারের সাইরেনের শব্দ তখনও ভোঁ ভোঁ করে বাজছে। সিং এবং আমি দুজনেই একই কথা বার বার বলছি। আমাদের এই অবস্থা দেখে রফিক আমাদের দুজনকে বগলদাবা করে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সাহাদা এবং মুখার্জীদা অকাতরে ঘুমাচ্ছেন। ওদের ঘুমের কোন রকম বিঘ্ন না ঘটিয়ে কোন রকমে পায়ের জুতো খুলে ঐ কাপড়-জামা পরেই বিছানার ওপরে দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি সূর্যমামা হাসি মুখে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছেন। বেশ বেলা হয়ে গেছে। সাহাদাও আমার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন, কিন্তু মুখার্জীদা তখনও অকাতরে ঘুমাচ্ছেন। সাহাদার মুখে শুনলাম গতকাল রাত্রে ওরা দুজনও গুপ্তর সঙ্গে কোন এক নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন। সেখানে মাত্রাধিক মদ্য পান করাতে আজ সকালে ঘুম ভাঙতে এই দেরি।

সকালের নির্মল আকাশ দেখে মনটা খুশিতে ভরে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তে বিষাদের ছায়া নামল এই কথা ভেবে যে আজই আমাদের এই ভ্রমণের শেষ দিন। সুতরাং যা কিছু দেখা-শুনা বা কেনাকাটা করার আছে তা আজই সেরে নিতে হবে। আগামী কাল আমরা পাড়ি জমাব দেশের পথে। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে। তড়িঘড়ি প্রাতরাশ সেরে সিং ও আমি পাড়ি জমালাম রফিকদের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে।

রফিক এবং রাবেয়া বাড়ির সামনে গাড়িতে বসেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের আসতে একটু দেরি হওয়ার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করলাম। আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে রফিক গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ক্রস্ হারবার টানেল পার হয়ে কাউলুন অতিক্রম করে আমরা এসে পড়লাম নিউ-টেরিটরিতে। রফিক জানালো যে এবার আমরা নিউ-টেরিটরির পূবদিকে অবস্থিত জাঙ্ক উপসাগর (Junk Bay) এর কিনারা দিয়ে চলেছি। সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের লুকোচুরি খেলা চলেছে। তারই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি,

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মত উদ্যত ফণা বিস্তার করে সরোষে বারবার ছোবল মারছে তটভূমির বুকে। কিন্তু নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রোষে গর্জন করতে করতে আবার ফিরে গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রবক্ষে। মোহিত হয়ে সমুদ্রের ঢেউ গুণছি এমন সময়ে আমাদের গাড়ি এসে থামল একটা ষ্টুডিওর সামনে। ফটকের ওপরে একটা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'শ'জ ষ্টুডিও'।

শ'জ ষ্টুডিও (Shaw's Studio) : রফিক বলল, এটি হচ্ছে চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি ষ্টুডিও। একে বলা হয় হলিউড অফ দ্যা ওরিয়েণ্ট (Hollywood of the Orient) অর্থাৎ প্রাচ্যের হলিউড। আমাদের গাড়ি ফটকের ভেতরে প্রবেশ করতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। আমরা তাকে আমাদের ষ্টুডিও দেখার অভিপ্রায়ের কথা বলতে তিনি তার এক সহকর্মীকে আমাদের ষ্টুডিও ঘুরিয়ে দেখানোর আদেশ দিলেন।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই ষ্টুডিওটি। এটি অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামে সজ্জিত। ষ্টুডিওর বাগানের এদিকে ওদিকে সাজানো রয়েছে নানা রকম সব সেট বা দৃশ্য। কোথাও গ্রামের দৃশ্য, কোথাও শহরের দৃশ্য, কোথাও বা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, ঝরণা, নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কোথাও বা সাজানো রয়েছে শয়নকক্ষ, সভাকক্ষ, দরবার কক্ষ এবং বৈঠকখানা ইত্যাদির অভ্যন্তরের দৃশ্য।

এরপর আমরা শুটিং দেখতে এলাম একটি ফ্লোরে। ফ্লোরে দ্বৈত অসি-যুদ্ধের একটি শট্ নেওয়া হচ্ছে। অসিযুদ্ধ চলছে দুটি সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবান যুবকের মধ্যে। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী। ঐ যুবক দুটি এই তরুণীটির দুই প্রণয়ী। ক্যাণ্টনী ভাষায় ওদের যে সব সংলাপ হল তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। তবে সারমর্ম যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই যে ঐ তরুণীটি দুই প্রণয়ীকে নিয়ে পড়েছে মহা এক সমস্যায়। ঐ সমস্যার সমাধান কল্পে এই অসিযুদ্ধের আয়োজন। এই অসিযুদ্ধে যে জয়লাভ করবে তরুণীটি তারই গলায় দেবে তার বরমাল্য।

জাঙ্ক উপসাগরকে ডাইনে রেখে তার উপকূল ধরে আবার আমরা চলতে শুরু করেছি। কিছুদূর চলার পর দেখি যে, আমাদের বিপরীত দিকে সমুদ্রবক্ষ ভেদ করে ওঠা একটা পাহাড়ের পাদদেশে সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত কতকগুলি তাঁবু। রফিক জানালো যে, ঐগুলি হচ্ছে শরণার্থী শিবির। ১৯৪৮-৪৯ সালে চীনের গৃহযুদ্ধের সময় কিছু সংখ্যক চীনা সৈনিক তাদের পরিবারবর্গকে

নিয়ে চীন ছেড়ে পালিয়ে এসে ঐখানে শিবির স্থাপন করে। ওরা আজও ঐসব শিবিরে বসবাস করছে।

ক্লীয়ার ওয়াটার বে (Clear Water Bay) :—আমরা এসেছি ক্লীয়ার ওয়াটার বে-র একটি তটভূমিতে। এই স্থানটি বলয়াকৃতি একটি উপহ্রদ অর্থাৎ ল্যাগুন (Lagoon)। এর তিনটি দিক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত আর খোলা দিকটা গিয়ে মিশেছে উপসাগরে। উপহ্রদ বলে ভাববেন না যেন যে এখানে কোন ঢেউ নেই। সমুদ্রের মত বড় বড় ঢেউ আছে এখানে। রফিক উপসাগরের জলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, এই স্বচ্ছ জলের জন্য এর নাম হয়েছে 'ক্লীয়ার ওয়াটার বে'। আমরা দাঁড়িয়ে আছি বাদামী রঙের বালুবেলার ওপরে, আমাদের তিনপাশে সবুজ পাহাড়। সেখানে রয়েছে কৃষি ক্ষেত। সামনে দিগন্তবিস্তৃত নীল সাগর। সাগরের বুকে ভাসছে রং-বেরঙের প্রমোদ তরী। আর মাথার ওপরে অনন্তবিস্তৃত নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে টুকরো টুকরো মেঘের দল। নীল আকাশ আর নীল সাগরের মাঝামাঝি স্থানে উড়ে বেড়াচ্ছে শ্বেত গাংচিলের (Sea Gulls) দল। এ এক মনোরম দৃশ্য।

স্নানের পোশাকের অভাবে ইটালীর রিমিনি (Rimini) সৈকতে, অ্যাড্রিয়াটিক্ সাগরে (Adriatic Sea) সাঁতার কাটার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তার জন্য মনে একটা ক্ষোভ ছিল। এখানে কিন্তু সাঁতার কাটার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি। তাই চারজনেই সাঁতারের পোশাক পরে জলে নেমে পড়লাম। কাঁচের মত স্বচ্ছ জল, তাই জলের অনেক নীচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সেখানে মনের আনন্দে খেলা করে বেড়াচ্ছে ছোট বড় নানা জাতীয় মাছের দল। অদূরে কতকগুলি জাঙ্ককে বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে। রফিককে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ নৌকাগুলি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছে?

উত্তরে রফিক জানালো, ঐ জাঙ্কগুলি সমুদ্রের বুক থেকে শামুক, ঝিনুক এবং শঙ্খ আহরণ করছে। এখানে ঐসব শামুক, ঝিনুক ও শঙ্খজাতীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এখানকে বলা হয় প্যারাডাইস্ অফ দ্যা স্কিন্ ডাইভারস্ অর্থাৎ ডুবুরীদের স্বর্গপুরী।

আমি বললাম, কোন রকম ভিড়-ভাড়াক্কা নেই, বেশ নিরিবিলি স্থানটি।

উত্তর দিল রাবেয়া, বলল, মোটেই তা নয়। আসবেন কোন ছুটির দিনে, তখন দেখতে পাবেন এখানে তিল ধারণেরও জায়গা নেই। দলে দলে আসবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী এবং শিশুরা। তখন বেলাভূমির

ওপরে পড়বে রঙীন ছাতার সারি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অর্ধনগ্ন হয়ে কেউ চাটাইয়ে শুয়ে কেউ বা আরামকেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে রৌদ্রস্নান করে, আবার কেউ কেউ বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সমুদ্রে সাঁতার কাটবে। তখন এই নির্জন বেলাভূমি লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। একে অন্যের গায়ে ধাক্কা না দিয়ে পথ চলতে পারবে না।

সমুদ্র স্নান সমাপন করে আমরা ঢুকলাম দু'কামরা যুক্ত একটা কুঠরিতে। একটা হচ্ছে বাথ রুম অর্থাৎ স্নান ঘর এবং অপরটা হচ্ছে টয়লেট্ রুম অর্থাৎ বেশ বিন্যাসের ঘর। স্নান ঘরে মিঠে জলে স্নান করার জন্য রয়েছে সুন্দর শাওয়ার এবং বাথটাব, রয়েছে একটা আর্শি। আর্শির ব্র্যাকেটে রয়েছে দাঁত মাজার ব্রাশ ও টুথপেস্ট, গায়ে মাথার সাবান এবং হেয়ার লোশন। একটা আলনাতে ঝুলছে পরিষ্কার তোয়ালে। আর প্রসাধন ঘরে রয়েছে আর্শি, চিরুনি, ব্রাশ, স্নো, পাউডার, কস্‌মেটিক ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কুঠরিতে প্রবেশ করার জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হল, কিন্তু ঐসব প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করার জন্য কোন মূল্য দিতে হল না।

মিঠে জলে স্নান সেরে বেশ পরিবর্তন করে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি যে. বালুতটের একধারে ডুবুরীর-দল আহরিত সামগ্রীগুলির খোলা ছাড়িয়ে খোলা-গুলিকে রাখছে কতকগুলি ঝুড়ির মধ্যে এবং খোলার ভেতরকার শাঁসগুলোকে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। আর গাংচিলের দল খাদ্যের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে ওদের মাথার ওপরে।

সিং ওদের ঝুড়ির ভেতর থেকে বিচিত্র রঙের কয়েকটি খোলা নিয়ে এসে আমাকে বলল, বোস, এই খোলাগুলির বিচিত্র রং দেখে কি মনে হয় না যে ঈশ্বর একজন নিপুণ শিল্পী ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ খোলাগুলি নিয়ে ওরা কি করবে ?

উত্তরে রাবেয়া জানাল যে, ঐ খোলাগুলি ওরা মহাজনদের দেবে। মহাজনরা ঐগুলিকে রাসায়নিক ক্ষার দিয়ে ভাল ভাবে পরিষ্কার করে ওগুলি দিয়ে নানা রকম খেলনা তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করবে।

স্নান করে দেহ ও মন বেশ স্নিগ্ধ হয়েছে। এখন আমরা হোটেলে ফেরার পথে। সূর্যমামার তেমন প্রতাপ নেই, বেশ ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। এক সময় রাবেয়াকে অনুরোধ করলাম, আমাকে কয়েকখানা জাপানী জর্জেট বা সিফন কিম্বা নাইলনের শাড়ি কিনে দেবার জন্য।

মুচ্‌কি হেসে ঠাট্টার সুরে রাবেয়া জিজ্ঞাসা করল—কার জন্য দাদা? বৌদির জন্য না কোন ফিঁয়াসীর জন্য?

আমি খেদোক্তি করে বললাম যে, ও দুটির কোনটাই লাভ করার সৌভাগ্য আজো আমার হয়নি।

রাবেয়া বিকেল চারটের সময় আমাদের দুজনকে ওর ফ্ল্যাটে যেতে অনুরোধ করল এবং জানালো যে সেই সময়ে ও আমাদের দুজনকে নিয়ে বেরুবে আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্য। সেই সঙ্গে আমাদের দুজনকে নৈশভোজের নিমন্ত্রণও করল।

আমি অনুরোধ করলাম সম্পূর্ণ বাঙালী খানা বানানোর জন্য। সিংও আমার কথায় সায় দিল। রাবেয়া ঠাট্টা করে বলল, শুক্তো খাওয়াতে পারব না কিন্তু, ও রান্নাটা আমি ভুলে গিয়েছি।

একটি বন্দরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রফিক জানালো যে, এই বন্দরটার নাম হচ্ছে হেবে হ্যাভেন (Hebe Haven)। বন্দরে নোঙ্গর করা রয়েছে অসংখ্য বড় বড় পালতোলা নৌকা এবং সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত জাঙ্ক। নৌকাগুলিতে মালপত্র তোলা ও নামানোর কাজ হচ্ছে।

এরপর আমাদের গাড়ি প্রবেশ করল ছবির মত সুন্দর একটা গ্রামের মধ্যে। রফিক গ্রামটার নাম বলল সাই কাং (Sai Kung)। আমাদের গাড়ি চলেছে সরু সরু গলির মধ্য দিয়ে। সরু সরু গলি হলে হবে কী, গলিগুলি কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গলির দু'পাশে বেশ পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো রয়েছে নানা রকম জিনিসপত্রের দোকানপাট।

রাবেয়া বলল শহরের তুলনায় এখানে জিনিসপত্র অনেক সস্তা দামে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি চীনা রমণীরা বাঁক কাঁধে করে চলেছে। রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম বাঁকের ঝুড়িগুলির মধ্যে আছে হাঁস, মুরগী এবং গরু ও শুয়ারের মাংস। ঐগুলি ওরা বিক্রি করার জন্য বয়ে নিয়ে চলেছে হাটে-বাজারে এবং বন্দরে।

আমরা হোটেলে ফিরলাম, শরীর আর বইছে না। মধ্যাহ্নভোজ সেরে সবে বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিয়েছি, চোখেও বেশ তন্দ্রা নেমেছে, এমন সময়ে ঘরের ফোনটা ক্রীং ক্রীং করে বেজে উঠল। ফোন ধরতেই কানে ভেসে এলো রাবেয়ার গলা, দাদা, শীঘ্রি তৈরি হয়ে চলে আসুন আমাদের ফ্ল্যাটে। এখানে চা পান সেরে বেলাবেলি আমরা কেনা-কাটা করতে বেরিয়ে পড়ব।

অগত্যা আলস্য ত্যাগ করে সিংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল রাবেয়াদের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। রফিক বাড়িতে নেই, কাজে বেরিয়ে গেছে। তাই আমরা তিনজনেই চা পর্ব সমাধান করে বেরিয়ে পড়লাম কেনাকাটা করার জন্য।

রাবেয়া আমাদের নিয়ে এলো বিরাট একটা কাপড়ের দোকানে। দোকানের সামনে বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা আছে—রফিক অ্যাণ্ড কোং, ক্লথ ম্যানুফ্যাক্চারার, ইম্পোর্টার, এক্সপোর্টার অ্যাণ্ড হোলসেল ডীলার। অর্থাৎ বস্ত্রনির্মাতা, আমদানি ও রপ্তানিকারক এবং পাইকারী বিক্রেতা। এমন কোন দেশী বা বিদেশী কাপড় নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। শুনলাম—রফিক এবং রাবেয়া হচ্ছে এই দোকানের মালিক এবং পরিচালক। দেখলাম রফিক তার নিজস্ব কামরায় বসে দোকানের কাজকর্ম দেখাশোনা করছে।

রাবেয়া একটা টেবিলের ওপরে দেশী-বিদেশী নানা ধরণের কাপড়ের থান এনে স্তূপাকার করে বলল, নিন, এর মধ্যে জর্জেট, ডেক্রন, সিফন, নাইলন-সব রকম শাড়িই আছে। আপনার পছন্দ মত শাড়ির কাপড় বেছে নিন।

আমি বেশ মসৃণ এবং খাপী দেখে একটা জর্জেট কাপড়ের থান বেছে নিয়ে রাবেয়ার মতামত জানতে চাইলাম। রাবেয়া আমার কাপড় পছন্দ ও তার গুণাগুণ বিচারের তারিফ করে ওই কাপড়ের কিয়দংশ মুঠোর মধ্যে পুরে বলল, এই কাপড়ের ১১ কী ১২ হাত একটা শাড়ি অনায়াসে আপনার জামার পকেটের মধ্যে চলে যাবে। কিন্তু দাদা, এটি আপনাদের ভারতে উৎপাদিত থান।

আমি বিদ্রূপ করে জিজ্ঞাসা করলাম, ভারতবর্ষ কী কেবলমাত্র আমাদের দেশ? তোমারও দেশ নয়?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাবেয়া উত্তর দিল, এককালে ছিল, কিন্তু এখন আর নয়। এখন আমি পাকিস্তানকেই আমার দেশ বলে মেনে নিয়েছি।

আমি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কৈ, এ জিনিস তো আমরা আমাদের স্বদেশের বাজারে দেখতে পাই না?

উত্তর দিল সিং, রপ্তানিযোগ্য জিনিসপত্র আমাদের স্বদেশে বিক্রি করা হয় না। বিদেশী বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যই ঐসব জিনিসপত্রকে বিশেষ ভাবে উৎপন্ন করা হয়।

বিদেশী জিনিসপত্রের ওপর আমাদের কেমন একটা মোহ আছে, তা যত নিকৃষ্ট মানেরই হোক না কেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট মানের স্বদেশী জিনিসও আমাদের সমাদর পায় না। সেই যে একটা প্রবাদ আছে না যে, 'গেঁয়ো যোগী গাঁয়ে ভিখ

পায় না।' আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমি মহা সমস্যায় পড়লাম, কারণ আমি যদি এই ভারতীয় জর্জেট কাপড় কিনে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের উপহার দিয়ে বলি যে এই শাড়িগুলি ভারতের তৈরি, তাহলে তখনই তারা নাক সিটকে বলবে—এত দাম দিয়ে এবং কষ্ট করে এগুলি তুমি বিদেশ থেকে বয়ে আনতে গেলে কেন? এ তো আমরা স্বদেশেই কিনে নিতে পারতাম। রাবেয়াকে বললাম আমার সমস্যার কথা।

রাবেয়া আমার কথা শুনে বলল, দাদা, এই ভারতীয় জর্জেট জাপানী বা আমেরিকান জর্জেটের চেয়েও অনেক উৎকৃষ্ট মানের কাপড়। যাই হোক আমি আপনার সমস্যার সমাধান করছি—বলে রাবেয়া একজন পরিচারিকাকে ডেকে তার হাতে কাপড়ের টুকরোগুলি দিয়ে ঐগুলিতে 'মেড ইন্ জাপান' ছাপ মেরে আনার নির্দেশ দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচারিকা প্রতিটি কাপড়ের কিনারায় যন্ত্রের সাহায্যে মেড ইন্ জাপান ছাপ মেরে এনে হাজির করল আমার সামনে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি, যাক, এখন এগুলিকে অনায়াসে জাপানী কাপড় বলে চালানো যাবে। এবার এগুলি যাদেরকে উপহার দেব, তারা এই ছাপ দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে এবং আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ও পাড়া-পড়শীদের দেখিয়ে গর্ব অনুভব করবে! সিংও ওর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জন্য কিনল শাড়ি, ব্লাউজ, ম্যাক্সি, শার্ট, প্যাণ্ট প্রভৃতি। আমাদের কেনাকাটা হয়ে গেলে রফিক কর্মচারীদের দোকান বন্ধ করার হুকুম দিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

রফিকদের ফ্ল্যাটে এসে মুখ-হাত ধুয়ে আমরা গিয়ে বসলাম ওদের বৈঠকখানায়। বৈঠকখানার ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। বৈঠকখানায় মোটা গালিচা পাতা। গালিচার ওপরে মোটা গদি আঁটা চারখানা কৌচ। কৌচ চারখানার মাঝখানে রয়েছে একটা কারুকার্য করা কাশ্মীরী সেণ্টার টেবিল। টেবিলের ওপরে সাজানো রয়েছে একটা ফুল ভর্তি ফুলদানি এবং চারটে খালি কাচের গেলাস। আমরা সোফাতে বসতেই রাবেয়া কলিংবেল টিপল। সঙ্গে সঙ্গে একজন বেয়ারা ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর রাখল চার বোতল সোডা ও একপাত্র বরফের কিউব। তারপর সে সেল্যারেট (Cellaret) অর্থাৎ মদের বোতল রাখবার বাহারে তাকের রঙীন পর্দাটা সরিয়ে দিল। সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে দেশী, বিদেশী নানা রকমের দামী দামী মদের বোতল। রফিক বলল, তোমাদের ইচ্ছামত মদ পছন্দ করে নাও। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল 'রয়্যাল স্যালিউট' আর সিং পছন্দ

করল 'কিং অফ কিংস'। মনে মনে বললাম—বিনা পয়সায় যখন পান করা হচ্ছে তখন বিশ্বের সেরা মদের রসাস্বাদন করাই শ্রেয়।

রাবেয়া চারটে গেলাসে মদ পরিবেশন করল। প্রথমে ঢালল রয়্যাল স্যালিউট। সে নিজেও আজ আমাদের সঙ্গে হুয়িস্কি পান করবে। রাবেয়া পুনরায় কলিংবেল টিপতেই বেয়ারা টেবিলের ওপর রেখে গেল আনুসঙ্গিক খাদ্য, যথা :—সেঁকা পাঁপর, সল্টেড কাজু বাদাম এবং আমাদের তিনজনের জন্য ফিসফ্রাই ও ফ্রায়েড চিকেন-লিভার। আর সিংয়ের জন্য পকাউড়া ও ভেজিটেবল কাটলেট। আমরা গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য কামনা করে যে যার গেলাসে চুমুক দিলাম। দ্বিতীয় দফায় রাবেয়া সিংয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করল। অর্থাৎ এবারে প্রত্যেকের গেলাসে কিং অফ কিংস্ পরিবেশন করা হল। দু' পেগ করে পান করার পর রাবেয়া আমাদের খাবার ঘরে যাবার অনুরোধ করে বলল, এরপর নেশা ধরে গেলে আর খাওয়ায় রুচি থাকবে না। অগত্যা আমরা সুবোধ বালকের মত রাবেয়ার পিছু পিছু ভোজনকক্ষে প্রবেশ করলাম।

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করে দেখি খাবার টেবিলের চারধারে মাত্র চারখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম বাচ্চা দুটি খাবে না আমাদের সঙ্গে? উত্তরে রাবেয়া জানাল—না, ওরা নৈশভোজ শেষ করে শুতে চলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি ওদের শুতে যাওয়ার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

বাবুর্চী পাত্রে করে টেবিলের ওপরে রেখে গেল কলাইশুঁটির পরটা, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, গল্দা চিংড়ির মালাইকারি এবং চিকেন দোপেঁয়াজী। আর সিংয়ের জন্য মাছ ও মাংসের পরিবর্তে রাখল মুলো, বাঁধাকপি ও ফুলকপি দেওয়া শুকনো ডাল এবং কড়াইশুঁটি, বীন ও ছত্রাকের তরকারি। এই খাদ্যগুলি সবই বেশ গরম। তবে শেষ পাতের জন্য যে কাস্টার্ড (Custard) ফ্রুট স্যাল্যাডটি রেখে গেল সেটি কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা। তারপর বেয়ারা আমাদের টেবিলের ওপরে রেখে গেল আমাদের ব্যবহৃত সেই হুয়িস্কির বোতল দুটি এবং সোডার বোতল ও বরফের কিউব। রাবেয়াই সকলের গেলাসে হুয়িস্কি ঢেলে দিল এবং সকলকে খাদ্য পরিবেশন করল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে কেন রাবেয়া বাচ্চা দুটিকে এরই মধ্যে শুতে পাঠিয়েছে। আহারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মদ্যপানও চলল। আর তারই সঙ্গে চলল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা।

সকলেরই বেশ নেশা হয়েছে। এর মধ্যে রাবেয়ার নেশাটা একটু বেশিই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ ওর চোখ দুটো হয়ে উঠেছে ড্যাবড্যাবে এবং

জবাফুলের মত টকটকে লাল। গাল দুটো হয়েছে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর মত থলথলে। এক কথা বারবার বলছে—দাদা, বিশ্বাস করুন, এত হুয়িস্কি আমি জীবনে কখনও পান করিনি। কচিৎ কখনও পান করেছি, তা আধ পেগের বেশি নয়। তবে আজ এত বেশি পান করলাম কেন? এর একটা কারণ আছে। আপনার নামে আমার এক দাদা ছিল। আপনার নাম শুনে আমার সেই হারানো দাদার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমি আপনাকে আমার সেই হারানো দাদার মত শ্রদ্ধা করি। আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী এতদিন কাউকে বিশ্বাস করে বলতে পারিনি। তাই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আজ তোমার কাছে সেই সব কাহিনী উজাড় করে দিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই। এই বলে সে আমার হাত ধরে টেনে এনে আমাকে বসাল ওদের বৈঠকখানা ঘরে। সিং এবং রফিকও এসে বসল ঐ ঘরে।

রাবেয়া জড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করল তার দুঃখের কাহিনী :—আমি ঢাকা জেলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা ছিলেন সেই গ্রামেরই এক স্কুলের প্রধান পণ্ডিত। আর দাদা ছিল ঢাকার এক বিখ্যাত কলেজের অধ্যাপক। আমার আসল নাম রেবা।

১৯৪৬-৪৭ সালে আমাদের পরিবারের 'ওপর নেমে এলো দুর্যোগের কালো মেঘ। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শুরু হল নরমেধ যজ্ঞ। তাতে নিহত হল দাদা। অধিকাংশ হিন্দুরাই দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল। কিন্তু বাবা-মা ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না, তাই তারা আমাদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। সেই আত্মীয় আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার নাম করে পথে আমাকে অচৈতন্য করে বেচে দিল এক পাকিস্তানী মুসলমানের কাছে। সে আবার লাহোরের এক বাঈজীর কাছে আমাকে বিক্রি করল।

একদিন নিশুতি রাতে আমি বাঈজীর বাড়ি ছেড়ে পালালাম। উর্ধ্বশ্বাসে আমি দৌড়চ্ছি রাজপথ ধরে এমন সময়ে একটা মোটর গাড়ি এসে হঠাৎ থামল আমার সামনে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখি রফিক এবং ওর মা আমার শুশ্রূষা করছে। ওদের শুশ্রূষায় আমি ভাল হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেমে গেল এক সময়, কিন্তু ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানে পরিণত হল।

খোঁজাখুঁজি শুরু হল আমার বাবা মায়ের, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন আমি বাধ্য হলাম রফিককে সাদি করে তার গৃহিণী হতে। এখন বলুন দাদা, আমি কি বিধর্মিণী? বলে আমার পায়ের ধুলা নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

আমি ওর মাথায় হাত রেখে 'জন্ম-এয়োতী হও, চিরায়ুষ্মতী হও' বলে ওকে আশীর্বাদ করলাম। তারপর আমি ওর মন ভোলাবার জন্য নজরুল ইসলামের একটি কবিতার দুটি কলি আবৃত্তি করে শোনালাম :—

'একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥'

কথায় কথায় ঘড়ির কাঁটা যে এগিয়েই চলেছে কারোরই সেদিকে নজর ছিল না। হঠাৎ বৈঠকখানার দেওয়াল ঘড়িটা ঢং করে বেজে উঠে আমাদের জানিয়ে দিল রাত একটা বেজেছে। রাবেয়া লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, ছি ছি, আপনাদের অনেক রাত করিয়ে দিলাম। রফিক ড্রাইভারকে ডেকে নির্দেশ দিল—আমাদের দুজনকে গাড়িতে করে হোটেলে পেঁ ৗছে দেবার জন্য।

আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য কামনা করে পানপাত্রে শেষ চুমুক দিলাম এবং থ্রী চিয়ার্স্ বলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিবাদন জানালাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখে অন্ধকার দেখলাম। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। তাই দেখে রফিক ও রাবেয়া হাত ধরে আমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে দিল এবং ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল আমাদের দুজনকে ঘর পর্যন্ত পেঁ ৗছে দেবার জন্য। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ওরা জানাল যে, আগামীকাল সকালে কিম্বা দুপুরে আবার আমাদের দেখা হবে।

হোটেলে ফিরে সিং চলে গেল নিজের ঘরে। আমি আমাদের ঘরে ঢুকে দেখি সাহাদা এবং মুখার্জীদা উভয়েই নাসিকায় তান তুলে সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। ওঁদের ঘুমের কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমিও নিঃশব্দে বেশ পরিবর্তন করে শুয়ে পড়লাম আমার নিজের বিছানায়। তারপর কখন যে নিদ্রাদেবী আমার চৈতন্য হরণ করলেন তার কিছুই টের পেলাম না।

সকালে ঘুম ভাঙল সাহাদার ডাকাডাকিতে। ও বোসদা, উঠে পড়ুন, বেলা হল যে। কী ঘুম রে বাবা, শেষ ঘুম নাকি!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখি সাতটা বেজে গেছে। উঠে বসে হাসতে হাসতে সাহাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, শেষ ঘুম ঘুমোলে কি কেউ এমনি করে উঠে বসতে পারে?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সাহাদা উত্তর দিলেন, না না, আমি সে ঘুমের কথা বলিনি। বলছিলাম আমাদের এই পর্যটনের শেষ ঘুমের কথা। তারপর রসিকতা করে বললেন, আপনার বিছানায় চা অর্থাৎ বেড-টী প্রস্তুত। এখন দয়া করে মুখ ধুয়ে সেটি পান করে আমাকে কৃতার্থ করুন। মুখার্জীদা আটটা সাড়ে আটটার আগে উঠবেন না। সুতরাং তাঁর বেড-টী পান করার বালাই নেই।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মনটা বিষাদে ভরে গেল। কারণ আজ ১৯৭৫ সালেয় ৭ই অক্টোবর। আজ আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন অর্থাৎ গৃহে ফেরার দিন। আর কিছুক্ষণ পরেই যাযাবরের সংসার ভেঙে দিতে হবে। গুটাতে হবে তল্পিতল্পা। আগামীকাল এমন সময়ে আমরা যে যার নিজ নিজ বাড়িতে বসে চা পান করব।

চিন্তায় বিঘ্ন ঘটাল হঠাৎ ঘরের টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠে। সাহাদা ক্ষৌরকর্মে ব্যস্ত আর মুখার্জীদা নিদ্রামগ্ন সুতরাং আমাকেই ধরতে হল টেলিফোনটা। মাউথপীসটা মুখের কাছে রেখে জানালাম—আমি কল্যাণ বোস বলছি।

রিসিভারের ভেতর দিয়ে ভেসে এলো রাবেয়ার কণ্ঠস্বর—দাদা, আমি রাবেয়া বলছি—আজ সকালেই তোমাদের হোটেলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না। কারণ একটা জরুরী কাজে রফিক বেরিয়ে গেছে। তবে কথা দিয়ে গেছে দুপুরের মধ্যে সে নিশ্চই ফিরবে। তাই ঠিক করেছি যে আমরা সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে তোমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাব। এখন বল তোমার ফ্লাইট ক'টায় এবং তার নম্বর কত?

উত্তরে জানালাম—ফ্লাইট হচ্ছে বিকেল ৫—১০ মিনিটে আর তার নম্বর এ, আই ৩০৫ (Air India 305)। তবে বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা এয়ারপোর্টে পেঁছিব, কারণ দুপুর বারোটায় আমাদের হোটেলের ঘর খালি করে দিতে হবে।

যথা সময়ে দেখা হবে বলে রাবেয়া ফোন ছেড়ে দিল।

সকালের নিত্যকর্ম সেরে প্রাতরাশ সারতে আমরা সকলে মিলিত হলাম ভোজনকক্ষে। আজ সেই একঘেয়ে কন্টিনেণ্ট্যাল ব্রেকফাস্ট নয়, আজ বিশেষ প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যথা:—ফলের রস, কয়েক রকমের ফল, কর্ণফ্লেক্‌স্‌ ও দুধ, ব্রেড-রোল ও মাখন কিম্বা চীজ, ক্রাম্বল্‌ড্‌ এগ্‌ (Crumbled Egg), ফিশ ফ্রাই কিম্বা ফ্রায়েড বেকন্‌, জ্যাম, জেলি এবং চা কিম্বা কফি। আজ

আর সুগার কিউব এবং ক্রীমের টিউব পকেটস্থ করলাম না, কারণ আগামীকাল তো আমরা বাড়িতে গিয়েই বেড-টী পান করব।

আজকের প্রাতরাশ খেয়ে সবাই খুশি। এই সুযোগে মুখার্জীদা রসিকতা করে মিসেস লালকাকাকে বললেন, আশা করি আজকের বিদায়কালীন মধ্যাহ্ন ভোজটাও নিশ্চয়ই এই রকম বিশেষ ধরণের হবে।

মুচকি হেসে লালকাকা উত্তর দিল, ফলেন পরিচিয়তে।

প্রাতরাশ সেরে সবাই লেগে গেলাম যে যার তল্পি-তল্পা গুছাতে। তল্পি-তল্পার মধ্যে তো একটা সুটকেস এবং একটা হাত ব্যাগ। বিছানাপত্রের কোন বালাই নেই। তবু একটা সুটকেস এবং একটা হাত ব্যাগ গুছোতেই হিমশিম খেয়ে গেলাম। সাহাদা এবং মুখার্জীদার কিন্তু দুটি করে সুটকেস এবং হাত ব্যাগ হয়েছে। কারণ ওঁরা দুজনে প্রচুর জিনিসপত্র কিনেছেন, উপরন্তু কিনেছেন একটি করে সুন্দর পালকের তৈরি লেপ।

বেলা বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুটকেস ঘরের দোরগোড়ায় বার করে দিয়ে নেমে গেলাম একতলায়। সেখানে রিসেপশন্ রুমে যে যার ঘরের চাবি জমা দিয়ে আমরা সবাই গিয়ে মিলিত হলাম লাউঞ্জে। তারপর মিসেস লালকাকার নেতৃত্বে আমরা সকলে একসঙ্গে গিয়ে ঢুকলাম খাবার ঘরে। আজ খাবার ঘরে ঢুকতেই পরিচারক এবং পরিচারিকারা আমাদের আপ্যায়ণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মনে মনে হাসলাম, বুঝলাম হঠাৎ আজ এই আপ্যায়ণ করার কারণ বিদায় বেলার টিপস্ অর্থাৎ বকশিশের লোভ।

আজ মিসেস লালকাকা তার চিরাচরিত লাল রঙের পোশাক পরিবর্তন করে পরেছে সবুজ রঙের পোশাক। সবুজ রঙের শাড়ি ব্লাউজ তো পরেছেই তাছাড়া গলার পুঁতির মালা, হাতের কাঁচের চুড়ি, ঘড়ির ব্যাণ্ড এবং পায়ের জুতা সবই সবুজ রঙের। এমন কি ফুটানিকা ডিব্বা অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগের রঙও সবুজ।

মুখার্জীদা রসিকতা করে বলে উঠলেন, এটা কী আমাদের গৃহে ফেরার গ্রীন্ সিগন্যাল।

আমিও ঠাট্টা করে বললাম, আজ আর আমি তোমাকে লালকাকা বলে ডাকব না, ডাকব গ্রীন কাকা অর্থাৎ সবুজ কাকা বলে। সাহাদা আবার একটা লেজুড় জুড়ে দিলেন এভার অর্থাৎ এভারগ্রীন কাকা।

না, সত্যিই আজ বিদায় লগ্নে লালকাকা ভুরিভোজের আয়োজন করেছে। মধ্যাহ্ন ভোজে প্রথমেই পরিবেশন করা হল প্রত্যেককে এক বোতল করে বীয়ার

সেই সঙ্গে এক প্লেট করে ফ্রায়েড আমণ্ড (Fried Almond)। যাঁরা বীয়ার পান করবেন না তাঁদেরকে পরিবেশন করা হল ঠাণ্ডা ফলের রস। তারপর পরিবেশন করা হল চিকেন এগকর্ণ স্যুপ্ উইথ নুড্ল্স এণ্ড পী লেগিউম্স্ (Chicken Eggcorn Soup with Noodles and Pea Legumes), ব্রেড এণ্ড বাটার, পোলাউ, ক্রীমড্ ক্যাবেজ (Creamed Cabbage), পিকিং প্রন্স্ ইন্ চিলি সস্ (Peking Prawns in Chilli Sauce), চিকেন রোল-এর চীনা নাম হচ্ছে চেউঙ্গ ফ্যান (Cheung Fan)। এর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এর পরটার মোড়ক এত পাতলা এবং স্বচ্ছ যে, মোড়কের ভেতরকার সম্পূর্ণ পুরটাই দেখা যায়। তারপর শেষ পদটি হল টফি অ্যাপেল (Toffee Apple)। ভারি সুস্বাদু এই পদটি। এরপর কফি পান করতে করতে সকলে সমস্বরে থ্রী চিয়ার্স্ ফর এভারগ্রীন কাকা বলে লালকাকাকে অভিনন্দন জানালাম।

এখন দুপুর একটা। আমাদের বাস আসবে সেই বিকেল তিনটেয়। এখন আমরা ঘরচ্যুত উদ্বাস্তু। সুতরাং বাকী সময়টুকু লবিতে বসে গুলজার করে কিম্বা ঝিমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই। লবিতে আমাদের গল্পের আসর বসেছে। সেখানে কে কত টাকার বিদেশী জিনিস কিনেছে তাই নিয়ে বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে। এখন দেখছি সমর, বাসুদেব, মিস্টার রাও এবং আমি এই চারজনেই হচ্ছি ভীতু এবং বোকা। আমরা চারজন ছাড়া বাকী সকলেই গোপনে বেশ মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা এনেছেন, বিদেশী জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্য।

বিকেল সাড়ে তিনটেয় আমরা পেঁাছলাম হংকং-এর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাই ট্যাক (Kai Tak)-এ।

একালের বিমানবন্দরগুলি সব একই ধাঁচে গড়া। কংক্রীট আর কাঁচ, কাঁচ আর কংক্রীটের দিগন্ত জোড়া দেওয়াল আর অতিকায় দরজা। প্লাইউডের ফ্রেমে আঁটা নকল চামড়ার সোফা, যোজনব্যাপী স্টীলের আবেষ্টনী। মনে হয় কোন নিপুণ কারিগর তাঁর পেটেন্ট ছাঁচ থেকে একের পর এক আধুনিক বিমান-বন্দর বার করে চলেছেন। কাইট্যাক বিমানবন্দরও এর ব্যতিক্রম নয়। বিংশ শতাব্দীটা হচ্ছে গতির যুগ। এ যুগের মানুষরা যে কি তাড়াহুড়ো করে দিন কাটাচ্ছে তা এই বিমানবন্দরে না এলে মালুম হবে না। বিমানবন্দরের ভেতরে মিনিটে মিনিটে বোয়িং বিমানের বাজখাই গর্জন। লাউঞ্জে বত্রিশ

ভাষার কল্লোল আর ঘোষিকার সুরেলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। আর বিমানবন্দরের বাইরে পার্কিং-এর জায়গা নিয়ে গায়ে গায়ে লাগা গাড়িগুলির তীব্র হর্ণবাজী, জনতার ভিড়ে বেসামাল ট্র্যাফিক পুলিসের ঘন ঘন বংশীধ্বনি।

কল্লোলিনী কাই ট্যাক বিমানবন্দর দিনে কোলাহলময়ী মুখরা এক নারী, আর রাতে স্বল্পভাষিণী তিলোত্তমা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এটি হচ্ছে একটি অত্যন্ত কর্মমুখর বিমানবন্দর।

এয়ারপোর্টের টারমিন্যাল ভবনে ঢুকে দেখি রফিক দম্পতি তাদের দুই ছেলে-মেয়ের হাত ধরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রতীক্ষায়। ওদের ক্ষণেক অপেক্ষা করতে বলে আমরা সোজা চলে গেলাম টারমিন্যাল ট্যাক্স পেমেন্টের কাউন্টারে। সেখানে ১৫ হংকং ডলার করে টারমিন্যাল ট্যাক্স দিয়ে আমরা আমাদের পাসপোর্টের ওপরে মাইগ্রেশন স্ট্যাম্প অর্থাৎ হংকং পরিত্যাগ করার ছাপ মারিয়ে নিলাম। মিস্টার এবং মিসেস রাও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কারণ ওদের ট্যাক্স জমা দেবার অর্থ নেই। ওরা কপর্দকহীন। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে তো আর ওদের ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। অগত্যা লালকাকাকেই জমা দিতে হল ওঁদের ট্যাক্সের টাকা। এরপরে আমরা এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টারে গিয়ে ট্যাক্স পেমেণ্ট রিসীট, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট এবং আমাদের গৃহে ফেরার টিকিট দেখিয়ে ওদের কাছে জমা দিলাম আমাদের মালপত্র। ওরা আমাদের সুটকেসগুলি ওজন করিয়ে তাতে আলাদা করে ট্যাগ্ অর্থাৎ সনাক্তকরণ টিকিট লাগাল। তারপর ওরা আমাদের প্রত্যেককে দুখানা করে কার্ড দিল। একখানা হচ্ছে এম্বারকেঁশন্ কার্ড এবং অপরখানা হচ্ছে লগেজ কার্ড অর্থাৎ একখানা প্লেনে ওঠার কার্ড এবং অপরখানা গন্তব্যস্থলে গিয়ে মাল খালাসের কার্ড। যাক, সব ঝামেলা মিটল।

আমাদের প্লেন আসার এখনও দেরি আছে। ওটি আসবে জাপান থেকে। তাই আমাদের দলের সকলেই ছড়িয়ে পড়ল এয়ারপোর্টের এ দোকানে সে দোকানে। কেবলমাত্র সিং এবং আমি এর ব্যতিক্রম। আমরা দুজনে টারম্যাকে এসে মিলিত হলাম রফিক পরিবারের সঙ্গে। আমরা রফিকের ছেলে মেয়েকে উপহার দিলাম দু'প্যাকেট নেস্ল্স্ চকোলেট এবং কিছু টফি। আর রাবেয়া আমাদের দুজনকে দু'প্যাকেট মেওয়া দিয়ে বলল, দাদা, প্লেনে বসে এগুলি খাবেন আর আমাদের স্মরণ করবেন। এরপর রফিক আমাদের শোনাল এই কাই ট্যাক বিমানবন্দরের ইতিকথা।

কাই ট্যাক এয়ারপোর্ট (Kai Tak Airport): এখানে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন কালে যেমন ছিল যাতায়াতের অসুবিধা, তেমনি ছিল সময় সাপেক্ষ। তখন এখানে যাতায়াত করা এবং সংযোগ রক্ষা করার একমাত্র সহায় ছিল জলযান। হঠাৎ একদিন ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ল। তারা উপলব্ধি করল যে এখানকার রাজ্য সুদৃঢ় করতে হলে এখানে যাতায়াতের সুবিধা করতে হবে এবং যাতায়াতের সময়কেও সংক্ষিপ্ত করতে হবে। তাই ১৯২৭ সালে এই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে একটি ছোট বিমানবন্দর নির্মাণ করালেন ব্রিটিশ সরকার। বিমান বন্দরের রানওয়েটি হল যেমনি ছোট তেমনি অপরিচ্ছন্ন। তারপর এই দ্বীপের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই এয়ারোড্রোম এবং রানওয়েরও শ্রী ও কলেবর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানীরা এই দ্বীপটি দখল করে নিয়ে এর আয়তন বৃদ্ধি করল কাউলুন উপদ্বীপের প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্যন্ত। সেখানে তারা নির্মাণ করল একটা ক্রস্‌ড রানওয়ে (Crossed Runway)। তারপর ইংরেজরা দ্বীপটি পুনরধিকার করে এর পরিধি বিস্তার করল পোতাশ্রয় পর্যন্ত এবং ১৯৫৮ সালে এখানে নির্মাণ করল ৮৩৫০ ফিট দীর্ঘ একটা আধুনিক রানওয়ে। ১৯৭৩ সালে এর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে এটিকে করা হল ১১,১৩০ ফিট।

এমন সময় একটা বোয়িং-এর বাজখাই আওয়াজ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আকাশের দিকে তাকাতে দেখতে পেলাম বাজপাখির মত একখানা বোয়িং বিমান গর্জন করতে করতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে ঝুঁকে পড়েছে মাটিতে নামার জন্য।

রফিক বলল, ঐ আপনাদের রথ এসে গেল।

প্লেন অবতরণ করার কিছুক্ষণ পরে সুরেলা কণ্ঠে মাইকে ঘোষণা করা হল, এ, আই—৩০৫ ফ্লাইটের যাত্রীরা যেন সিকিউরিটি রুমে চলে যান এবং সেখানে পরীক্ষায় পাশ করে প্লেনে গিয়ে উঠে বসেন।

রাবেয়া কাঁদো কাঁদো চোখে আমার পায়ের ধুলো নিল, তার চোখের দু'ফোঁটা তপ্ত জল ঝরে পড়ল আমার পায়ের ওপরে। তারপর ভাঙা গলায় বলল, দাদা, এই অভাগী বোনটার কথা মনে থাকবে তো?

আমি ওর মাথায় হাত রেখে ওকে আশীর্বাদ করলাম এবং সস্নেহে বললাম, তুমি অভাগী নও, তুমি পরম ভাগ্যবতী।

বাচ্চা দুটিও সিং এবং আমার পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বলল, আংকলস্ কাম্ এগেন অর্থাৎ মামা বা কাকা তোমরা আবার এসো।

রফিকের সঙ্গে করমর্দন করে সিং ও আমি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম সিকিউরিটি রুমের দিকে। রাবেয়া এবং রফিক সজল নয়নে চেয়ে রইল আমাদের গতিপথের দিকে।

সিকিউরিটি রুমের দোরগোড়ায় আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সাহাদা এবং মুখার্জীদা। সাহাদার হাতে এক বোতল এবং মুখার্জীদার হাতে চার বোতল দামী বিদেশী মদ রয়েছে। যার এক একটি বোতলের কলকাতার বাজারে দাম হবে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকার মত, কিন্তু ওঁরা ঐগুলি এই বিমান-বন্দর থেকে কিনেছেন মাত্র ৪।৫ মার্কিন ডলারে, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র ৩৬ টাকা থেকে ৪৫ টাকার মধ্যে। সাহাদা কিনেছেন এক বোতল জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল আর মুখার্জীদা কিনেছেন এক বোতল কিং অফ কিংস, এক বোতল রয়্যাল স্যালিউট এবং ছু' বোতল হাঙ্গেরিয়ান তোকাই। এই তোকাইয়ের একটির রং সাদা এবং অপরটির রং লাল। মুখার্জীদা বললেন, হাঙ্গেরিয়ানরা এই মদ তৈরি করে খাঁটি দ্রাক্ষারস দিয়ে।

যাক, এখন ওঁদের এই প্রতীক্ষার আসল উদ্দেশ্যটা বলি। কাস্টমস্-এর নিয়ম কোন বিমান যাত্রীই এক বোতলের বেশি মদ বহন করতে পারবেন না। একটা বোতল মুখার্জীদা নিজেই বহন করবেন, অন্যটা আমাকে গছালেন। ফ্যাসাদ ঘটল বাকী ছুটো বোতল নিয়ে। এমন সময়ে সমর এবং বাসুদেব এসে উপস্থিত হল। সাহাদা এবং মুখার্জীদা সমর ও বাসুদেবকে অতি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। তাই মুখার্জীদা সরাসরি ওদের কাছে কোন রকম প্রস্তাব না করে আমার মাধ্যমে ওদেরকে অনুরোধ জানাল বাকী ছুটি বোতল বহন করার জন্য। ওরা ছুজনে আমাকে যথেষ্ট মান্য করে, তাই বিনা প্রতিবাদে ওরা সে অনুরোধ রক্ষা করল।

সিকিউরিটি রুমে কিন্তু আমাদের কোন রকম দেহ তল্লাশি করা হল না। একজন সিকিউরিটি অফিসার বললেন, আপনাদের কারো কাছে যদি কোন রকম ধাতব পদার্থ থাকে তাহলে সেগুলি ঐ টেবিলের ওপরে রাখা পলিথিন প্যাকেটের একটার মধ্যে পুরে সেই প্যাকেটটা ঐ কাউণ্টারে গিয়ে জমা দিন। তারপর একে একে ঐ স্টীলের ফ্রেমের দরজার ভেতর দিয়ে ওপারে গিয়ে যে যার প্যাকেট সংগ্রহ করে প্লেনে গিয়ে উঠে বসুন। আমার কাছে কিছু মুদ্রা ছিল, সেগুলি এবং আমার ঘড়ি, সোনার বোতাম ও সোনার আংটি একটা পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে পুরে জমা দিলাম নির্দিষ্ট কাউণ্টারে।

ওরা আমাকে একটা টিকিট দিল। এরপর গেলাম সেই স্টীল-ফ্রেমের দরজার কাছে।

দরজার কাছে গিয়ে দেখি সেখানে কিউ (Queue) পড়ে গেছে। আমরা সকলেও পর পর কিউয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একে একে সবাই বেরিয়ে গেল ঐ দরজার ভেতর দিয়ে। অঘটন ঘটল কেবলমাত্র দুটি চীনা তরুণীর বেলায়। যেই ঐ তরুণী দুটি দরজার কাছে গেছে, অমনি স্টীল ফ্রেমের ডিটেক্‌টর্‌ (Detector) যন্ত্রটা কট্‌ কট্‌ শব্দ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন বন্দুকধারী পুলিস ছুটে এসে তরুণী দুটিকে পাকড়াও করে অন্যত্র নিয়ে গেল। ওদের ভাগ্যে যে কি ঘটল তা দেখার অবকাশ আমাদের নেই। তাই আমরা করিডর দিয়ে নেমে গিয়ে সোজা প্লেনে উঠে পড়লাম। প্লেনে প্রবেশের দরজার দু'পাশে দণ্ডায়মান দুজন সুশ্রী, সুবেশা বিমান-সেবিকা করজোড়ে 'নমস্তে' বলে আমাদের অভিবাদন জানাল। আমরা আমাদের বোর্ডিং কার্ডগুলি দেখাতে ওরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল যে যার নির্দিষ্ট সীটে।

বাজপাখিটা আমাদের উদরস্থ করে বাজখাঁই আওয়াজে শরীরটাকে তাতিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল এবং এক ফাঁকে লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল। রফিক পরিবার টারমিন্যাল ভবনের ছাদ থেকে রুমাল নেড়ে আমাদের বিদায় জানাল। বাজপাখিটা নিমেষের মধ্যে ৩০।৪০ হাজার ফিট ওপরে উঠে এলো। হংকং দ্বীপটা একটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন এখানকার সময় হচ্ছে বিকেল সাড়ে পাঁচটা। আমরা আমাদের ঘড়ির কাঁটা সাড়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়ে করে নিলাম ভারতীয় সময় দুপুর দুটো।

আমার সামনের সীটে বসেছেন সাহাদা এবং মুখার্জীদা, সিং ও আমি আছি মাঝখানের সীটে, আর সমর ও বাসুদেব বসেছে আমার পিছনের সীটে। আমাদের প্লেনের নীচ দিয়ে ভেসে চলেছে টুকরো টুকরো মেঘের দল। মনে হচ্ছে যেন কোন দুষ্টু ছেলে তুলোর বস্তা খুলে একরাশ পেঁজা তুলা আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্যমামা তাঁর বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন ঐ মেঘের দলকে। আমার মনে রং ধরেছে, তাই মনে মনে আবৃত্তি করছি :—

"ও আকাশ বল আমারে,
মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে।
তারা কেউ বা রঙীন ওড়না গায়ে,
কেউ সাদা কেউ নীল বেশে।"

ভাবে মগ্ন হয়ে আছি, এমন সময়ে মুখার্জীদার করুণ কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো, এই শেষের দিনটি কি এমনিই শুষ্ক যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে সাহাদার গলা শোনা গেল, শুষ্ক যাবে কেন? আপনার কাছে যে চারটি বোতল আছে তার একটির সদ্ব্যবহার করলেই তো শুষ্কতা কেটে যাবে।

অগত্যা মুখার্জীদা রাজী হলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বোসদা, তাহলে কোন্ বোতলটা খুলব?

খানিক ভেবে চিন্তে আমি উত্তর দিলাম, দ্রাক্ষারসটা অর্থাৎ তোকাইটা আস্বাদন করাই শ্রেয়। সাহাদা এবং সিং উভয়েই আমাকে সমর্থন জানাল।

মুখার্জীদা একজন বিমান-সেবিকাকে ডেকে সাত বোতল ঠাণ্ডা সোডা এবং সাতটা গেলাস আনালেন। তারপর 'গণতন্ত্রের জয় হোক' বলে মুখার্জীদা একটি তোকাইয়ের বোতল খুললেন এবং এক পেগ করে সাতটি গেলাসে ঢেলে তাতে পরিমাপ মত সোডার জল মিশ্রিত করে, দুটি গেলাস আমার হাতে দিয়ে বললেন, বোসদা, এই গেলাস দুটো আপনার পিছনের সীটে এগিয়ে দিন।

আমি মুখার্জীদার এই উদারতা দেখে বিস্মিত হলাম। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম—সমর এবং বাসুদেবের হঠাৎ এই জাতে ওঠার কারণটা কি? কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বিস্ময় কেটে গেল। বুঝলাম মুখার্জীদা দুটো বোতল সমর এবং বাসুদেবের কাঁধে চাপিয়ে দম্‌দম্ এয়ারপোর্ট-রূপী বৈতরণী পার হবার ব্যবস্থা করছেন।

মুখার্জীদা নিজে উঠে গিয়ে একটা গেলাস দিয়ে এলেন মিসেস লালকাকাকে। তাই দেখে মিস্টার রাও, গুপ্ত প্রভৃতি আরও অনেকে ছুটে এলো মুখার্জীদার কাছে। অগত্যা বিমান থেকে আর এক বোতল জনি ওয়াকার কিনতে হল মুখার্জীদাকে। আমরা সকলেই 'থ্রী চীয়ারস্ ফর মিস্টার মুখার্জী' বলে মুখার্জীদার স্বাস্থ্য পান করতে লাগলাম।

হাসি তামাশার মধ্য দিয়ে আমাদের নভশ্চরের মজলিস বেশ জমে উঠেছে। সকলেরই কিঞ্চিৎ নেশা হয়েছে। আবেগে সাহাদা গুণগুণিয়ে গেয়ে উঠলেন—'সুরা পান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।'

আমার মনের মধ্যে ভাসছে রফিক এবং রাবেয়ার আতিথেয়তার কথা। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন :—

'কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥'

ভাবের ঘোর কাটল বিমান-সেবিকার ডাকে। সে বলল, আপনার সামনের সীটের ডালাটা খুলে নিন, বৈকালীন চা এনেছি। খালি চা-ই দিল না, তার সঙ্গে টা-ও দিল। যথা :—চীজ্, টমাটো এবং শশা দিয়ে তৈরি ডবল্ ডেকার স্যাণ্ড-উয়িচ, চিকেন্ প্যাটিস্ এবং দু'রকমের প্যাস্ট্রি।

সমগ্র আকাশে রঙের জাল বিস্তার করে সূর্যমামা পাটে নেমেছেন। ওদিকে পুব-দিগন্তে একফালি কুমড়োর মত চাঁদামামা উঁকি মারছেন। নীচের সমুদ্র, নদ, নদী, ভূমি ও গাছপালা সব আবছা হয়ে গেছে। এমন সময়ে মাইকে ঘোষণা করা হল—প্লীজ্ ফাস্ন্ ইয়োর সীট বেল্ট, উয়ী আর নাউ ল্যাণ্ডিং অ্যাট ডংমুয়াং এয়ারপোর্ট। অর্থাৎ আপনারা অনুগ্রহ করে যে যার নিজ নিজ আসনের কোমরবন্ধ বেঁধে নিন, এখন আমরা ডংমুয়াং বিমানবন্দরে অবতরণ করছি।

এখন ব্যাংকক্ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা, আর ভারতীয় সময় বিকেল চারটে। ভুলে গেলাম রাবেয়াদের কথা। মনটা আনন্দে নেচে উঠল এই ভেবে যে, আবার চাই-লাই এর সঙ্গে দেখা হবে।

আমাদের প্লেন এই ডংমুয়াং বিমানবন্দরে এক ঘণ্টা থাকবে। তাই আমরা অধিকাংশ যাত্রীই প্লেন থেকে নেমে গেলাম টার্মিন্যাল ভবনের লাউঞ্জে। লাউঞ্জে ঢুকে দেখি যে, তার কাঁচের দেওয়ালের অপর পারে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে চাই লাই। মনটা পুলকে ভরে গেল। ইশারায় ওকে ভিজিটর্স্ রুমে আসতে বলে আমিও গেলাম সেখানে। সেখানে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে চাই আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে জর্জরিত করল আমার মুখখানা। আমার সর্ব শরীরে শিহরণ জাগল। আমিও কিছু কম্‌তি গেলাম না। চুম্বনের পালা শেষ হলে চাই আমাকে একগুচ্ছ গোলাপ ফুল দিল, আমিও ওকে উপহার দিলাম এক সাজি ভর্তি আপেল। এই আপেল আমি কিনেছিলাম হংকং এয়ারপোর্ট থেকে।

এরপরে চাই জানতে চাইল যে জাপান এবং হংকং-এ আমি কতগুলি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি এবং কতগুলি ফিঁয়াসী রেখে এসেছি সেখানে। উত্তরে জানালাম, একজনও নয়। চাই আমার গালে একটা ঠোনা মেরে বলল, তুমি

একটি মিথ্যুক! তারপর আমি ওকে শোনালাম আমার জাপান এবং হংকং ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা।

সুখের দিন বড় তাড়াতাড়ি কেটে যায়, কিন্তু দুঃখের দিন আর শেষ হতে চায় না। মাইকে সুরেলা কণ্ঠে আমাদের অনুরোধ করা হল প্লেনে গিয়ে উঠে বসার জন্য। চাই আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে পুনরায় যখন আমি ব্যাংককে আসব তখন চাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত হব। পকেটে কিছু খুচরো বিদেশী মুদ্রা পড়ে ছিল তাই দিয়ে চাইয়ের সাহায্যে বিমানবন্দরের দোকান থেকে কিনলাম এক বোতল রয়্যাল স্যালিউট হুয়িস্কি এবং এক প্যাকেট 'বেন্‌সন্' আর এক প্যাকেট 'ডানহিল' সিগারেট। এরপরে উভয়ে উভয়কে চুম্বন করে উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

প্লেনে উঠে সীটে বসতেই সিং বলল, বোস! তোমার মুখটা ভাল করে মুছে নাও। সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জীদা বলে উঠলেন, ক্ষণেক তিষ্ঠ বৎস। এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি সীট থেকে উঠে গিয়ে মিসেস লালকাকার মেক্ আপ বক্স থেকে আর্শি এনে আমার মুখের সামনে ধরলেন। দেখতে পেলুম আমার কপালে, ঠোঁটে এবং গালে লেগে রয়েছে লিপস্টিকের দাগ। রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ মুছতে যাচ্ছি এমন সময়ে সাহাদা টিপ্পনী কাটলেন, মুছবেন না, মুছবেন না, ও অনুরাগের রং মুছে ফেলবেন না।

কিছু যাত্রী উদ্গিরণ করে এবং কিছু নতুন যাত্রী উদরস্থ করে আমাদের বাজপাখি আবার বিকট শব্দে শরীর তাতিয়ে নিয়ে দৌড় শুরু করল এবং এক ফাঁকে লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল।

সূর্যদেব অস্ত গেছেন। চাঁদামামা নভঃস্থলে বসিয়েছেন তাঁর সভা। সভা অলঙ্কৃত করে বসেছে তারকার দল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সব অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। চাঁদামামা এবং তারকারাজির ক্ষীণ আলো এই অন্ধকারকে ভেদ করতে পারছে না। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অন্ধকার গ্রাস করেছে।

এদিকে মুখার্জীদা কিন্তু চুপিসারে নিজের কাজ সারতে লাগলেন অর্থাৎ সুরাপাত্র ভরতে লাগলেন। তারপর সাহাদা, সিং এবং আমাকে তিনটি পাত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন্, এবার এই সুরাসুন্দরীতে শেষ চুমুক দিয়ে আমাদের বিদায় লগ্নটিকে সার্থক করে তুলুন।

যে সব যাত্রীদের গন্তব্যস্থল কলকাতা, বিমান সেবিকারা তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে গেল দুখানা করে ফর্ম। একটি ডিস্এম্বারকেশন্ ফর্ম (Disembarkation

Form) এবং অপরটি গুডস্ পারচেস্ড্ ডিক্লারেশন ফর্ম (Goods purchased declaration Form)। ডিস্এম্বারকেশন্ ফর্মে পূরণ করতে হবে নিজের নাম, পিতার নাম, সর্বশেষে কোথা থেকে আসছি, আমার গন্তব্যস্থল কোথায় এবং সেখানকার ঠিকানা। আর ডিক্লারেশন ফর্মে লিখতে হবে কি কি বিদেশী জিনিস কিনেছি এবং তার মূল্য কত। এরপর এই ফর্ম দুটি আমাদের জমা দিতে হবে দমদম বিমানবন্দরে।

সুরার পাত্রে চুমুক দিতে দিতে জড়িত কণ্ঠে সিং জিজ্ঞাসা করল, বোস্! কেমন লাগল এই ভ্রমণ? আমি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আওড়ে এর উত্তর দিলাম :—

"যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদলপদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।"

আমাদের বাজপাখি বিকট শব্দ করতে করতে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে অন্ধকারের ব্যূহ ভেদ করে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ-ছ'শো মাইল বেগে উড়ে চলেছে তার গন্তব্যস্থলের দিকে। হঠাৎ মাইক বেজে উঠল এবং ঘোষণা করল যে আমরা সুন্দরবনের কাছ বরাবর এসে গেছি, আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা দমদম এয়ারপোর্টে অবতরণ করব। সুতরাং আপনারা যে যার সীট-বেল্ট কোমরে বেঁধে নিন।

শীর্ণ চন্দ্রালোকে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক মানচিত্রটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। সুন্দরবনের নদী-নালাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন একটা সবুজ কাগজের ওপরে একটি বাচ্চা ছেলে তার অপটু হাতে সাদা কালি দিয়ে হিজিবিজি কেটেছে।

চোখের ওপরে ভেসে উঠল বহুদূরের একটা ক্ষীণ আলোর বিন্দু। বিন্দুটা যেন দ্রুতগতিতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে এবং ক্রমে ক্রমে তা আকারে বড় হচ্ছে। এক সময়ে ক্ষীণ আলোর বিন্দুটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। যেন বহুকালের একটা স্মৃতিকে বিস্মৃতির আড়ালে সরিয়ে রেখে নিজের অস্তিত্বকে উন্মোচন করল। একটা আবছা ছবি তার রং ও রেখাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলে একটা ক্লাসিক পেন্টিং হয়ে উঠল। আমাদের বাজপাখিটা দমদম বিমানবন্দরের ওপরে একটা চক্কর মেরে রাত আটটা পনেরো মিনিটে স্পর্শ করল বিমানবন্দরের

মাটি। স্বর্গলোক থেকে আমাদের পতন ঘটল মর্ত্তলোকে। আমাদের ভ্রমণেরও হল যবনিকাপাত।

মিসেস্ লালকাকা, সিং প্রভৃতি অন্যান্য সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কলকাতার সাতজন যাত্রী এয়ার ইণ্ডিয়ার বাসে করে এলাম টারমিন্যাল ভবনে। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মুখার্জীদা সমর এবং বাসুদেবকে একটি করে বোতল গছিয়েছেন গেট পার করে দেবার জন্য। টারমিন্যাল ভবনের মাল খালাস করার ঘরে গিয়ে সেখানকার ঘুরন্ত চাকি থেকে যে যার স্যুটকেস সংগ্রহ করে ঢুকলাম সিকিউরিটি রুমে। সেখানে যে যার পাসপোর্ট, ডিস্এম্বারকেশন্ ফর্ম এবং ডিক্লারেশন ফর্ম জমা দিয়ে গিয়ে বসলাম একটা কৌচের ওপরে। দেখি ঘরের কাচের দেওয়ালের ওপার থেকে অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু চোখ এসে পড়েছে আমাদের ওপরে। মনে হচ্ছে ওরা যেন কাচের ঘরে আবদ্ধ চিড়িয়াখানার জীবদের দেখছে। আসলে কিন্তু তা নয়, ওরা ওদের আত্মীয়-পরিজনদের অনুসন্ধান করছেন। তার মধ্যে তিনজোড়া চোখের দৃষ্টি এসে পড়েছে আমার ওপরে। একজোড়া চোখ আমার বন্ধু গোপালের আর দু'জোড়া হচ্ছে আমার ভাইপো আশীষ এবং তার বন্ধু পবিত্রর। ওরা আকারে ইঙ্গিতে ওদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

আমাদের ব্যাচের মধ্যে আমারই ডাক পড়ল প্রথমে। আমি স্যুটকেস হাতে করে গিয়ে দাঁড়ালাম একজন কাস্টম্স অফিসারের ডেস্কের সামনে। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মিস্টার বোস? আমি বিনীত স্বরে সম্মতি জানালাম। এরপর ভদ্রলোক ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, তাহলে আপনিই হচ্ছেন সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রীকল্যাণ বসু?

প্রথমে আমি হকচকিয়ে গেলাম। কারণ সালের মাঝামাঝি ঐ কল্যাণ বোসকে নিয়ে সারা দিল্লী এবং কলকাতায় একটা হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। ঐ সময়ে তিনি নাকি মেট্রো সিনেমা, শ'ওয়ালেস্ কোম্পানি এবং আরও কয়েকটি বড় বড় বেসরকারী বিদেশী কোম্পানি কেনার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাই নিয়ে দিল্লী এবং কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলি মুখর হয়ে উঠেছিল— কে এই ধনকুবের? কেউ লিখেছিল একজন উদীয়মান শিল্পপতি, কেউ লিখেছিল টাটা-বিড়লার দালাল আবার কেউ বা লিখেছিল একজন আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী বা অন্য কিছু। নিজেকে সংযত করে আমিও অনুরূপ ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিলাম, আপনার যা খুশি তাই ভেবে নিতে পারেন।

ভদ্রলোক আবার গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কৈ, আপনার স্যুটকেশ কোথায় ? আমি তার সামনে আমার স্যুটকেস হাজির করাতে তিনি তার ওপরে সবুজ খড়ি দিয়ে একটা দাগ কেটে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, এবার আপনি যেতে পারেন।

আমি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে, তারপর অতি নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কৈ, আপনি তো আমার স্যুটকেস খুলে পরীক্ষা করলেন না ?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, তার প্রয়োজন নেই। এতক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে রসিকতা করছিলাম। কিন্তু আপনি সেটা বুঝতে পারেননি, তার জন্য আমি দুঃখিত। তারপর আরও বললেন, এই কাজ করতে করতে আমরা শকুনির দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছি। লোকের মুখ দেখে আমরা এক নজরেই বলে দিতে পারি যে, কে সাচ্চা আর কে ঝুটা। আশা করি আপনার সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল ?

আমি ওর সঙ্গে করমর্দন করে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে আসতে হাসি মুখে ভাইপো মন্তব্য করল, জ্যাঠাবাবু! খেল্ খতম্, পয়সা হজম্।

জাপান এবং হংকং-এ যাঁরা প্রথম যাবেন তাঁদের সুবিধার্থে জাপানী এবং ক্যাণ্টনী ভাষায় প্রচলিত কয়েকটি সাধারণ কথা ও তার ইংরাজী অনুবাদ নীচে দিলাম :—

English	Japanese	Cantonese
Good morning	Ohayo gozaimasu	Tsow Sun
Good day	Konnichi Wa	How yet
Good night	Oyasuminasai	How yeh man
Good-bye	Sayonara	Tsoi Kin
Thank you	Arigato	Dor tsich
Please	Dozo	Mm Koi
Yes	Hai	Hai
No	Lie	Mm hai
To day	Kyo	Kam yat
To morrow	Asu	Teng yat
I am sorry	Gomen nasai	Tui mm Chiu
Excuse me	Sumi masen	
Do you speak English ?	Eigo ga hanase masuka ?	Nei wui mm wui Kong yieng man ?
I don't understand	Wakari masen	Ngo mm Chi
How much ?	Ikura desuka ?	Nee tikei ?
Where is the toilet ?	Otearai wa doko desuka ?	Chih soh hai bin dow